NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

STUDY MATERIAL

EPS

PAPER IV

MODULES 13 – 16

ELECTIVE POL. SCIENCE
HONOURS

প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমত কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে — যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রমগুলি অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোন শিক্ষার্থীও এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটাই মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর, প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক — অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায় ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপিকা (ড.) মণিমালা দাস
উপাচার্য

তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ : মার্চ, ২০১০

ভারত সরকারের দূর শিক্ষা পর্ষদের বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the Distance Education Council, Government of India.

পরিচিতি

বিষয় : ঐচ্ছিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান

সাম্মানিক স্তর

পাঠক্রম ঃ পর্যায় : EPS : 04 : 13

রচনা		সম্পাদনা
একক - 49-52	সূর্য কুমার ব্যানার্জী	ডঃ রাধারমণ চক্রবর্তী

পাঠক্রম ঃ পর্যায় : EPS : 04 : 14

একক - 53-56	অধ্যাপিকা দীপিকা মজুমদার	অধ্যাপক অমল কুমার মুখোপাধ্যায়

পাঠ্যক্রম ঃ পর্যায় : EPS : 04 : 15

একক - 57-60	অধ্যাপিকা দীপিকা মজুমদার	অধ্যাপক শোভনলাল দত্তগুপ্ত

পাঠ্যক্রম ঃ পর্যায় : EPS : 04 : 16

একক - 61-64	অধ্যাপিকা দীপিকা মজুমদার	অধ্যাপক অশোক মুখোপাধ্যায়

ঘোষণা

এই পাঠ সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

শ্রী সিতাংশু ভট্টাচার্য্য
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

E.P.S. – 4

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ঐচ্ছিক পাঠক্রম

পর্যায়
13

একক	49	❑ প্লেটো ও অ্যারিস্টট্‌ল	1-13
একক	50	❑ রোমান যুগের চিন্তাধারা	14-18
একক	51	❑ মধ্যযুগের ইউরোপের রাষ্ট্রচিন্তা	19-25
একক	52	❑ মার্সিলিও অব পাড়ুয়া ও সমন্বয়বাদী আন্দোলন	26-31

পর্যায়
14

একক	53	❑ নবজাগরণ ও ম্যাকিয়াভেলি	32-54
একক	54	❑ ধর্মসংস্কার ঃ লুথার ও ক্যালভিন	55-77
একক	55	❑ ষোড়শ শতকের রাজতন্ত্র বিরোধী তত্ত্ব	78-95
একক	56	❑ বোডিন	96-122

পর্যায়
15

একক 57 ❑ টমাস হব্‌স (১৫৮৮-১৬৭৯) 123-136

একক 58 ❑ জন লক্ (১৬৩২-১৭০৪) 137-154

একক 59 ❑ শার্ল লুই মঁন্তেস্কু (১৬৮৯-১৭৭৫) 155-168

একক 60 ❑ জাঁ জাঁক রুশো (১৭১২-১৭৭৮) 169-186

পর্যায়
16

একক 61 ❑ জর্জ উইলহেলম ফ্রেডরিক হেগেল 187-201

একক 62 ❑ কার্ল মার্কস 202-221

একক 63 ❑ জন স্টুয়ার্ট মিল 222-234

একক 64 ❑ টমাস পেন 235-242

গঠন

৪৯.০ উদ্দেশ্য

৪৯.১ প্রস্তাবনা

৪৯.২ প্লেটোর পূর্বসূরী

৪৯.২.১ প্লেটো ও সক্রেটিস

৪৯.৩ প্লেটোর চিন্তায় ন্যায়নীতি

৪৯.৪ অভিভাবক তত্ত্ব

৪৯.৫ সাম্যবাদ ও শিক্ষা ব্যবস্থা

৪৯.৬ মূল্যায়ন

৪৯.৭ অনুশীলনী

৪৯.৮ অ্যারিস্টটল ও সমসাময়িক গ্রীক সমাজ

৪৯.৯ অ্যারিস্টটলের রাষ্ট্রতত্ত্ব

৪৯.৯.১ ব্যক্তি ও রাষ্ট্র

৪৯.৯.২ সরকারের শ্রেণি বিভাজন

৪৯.৯.৩ মূল্যায়ন

৪৯.১০ অনুশীলনী

৪৯.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৪৯.০ উদ্দেশ্য

সভ্যতার বিবর্তনে রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তি এই তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার ঐতিহ্য দীর্ঘকালের। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে এর সূত্রপাত গ্রীসদেশে। সেসময় আয়তনে রাষ্ট্রের আকার ক্ষুদ্র হলেও রাষ্ট্র গঠন ও পরিকল্পনার অনেক জটিল প্রশ্নের মোকাবিলা করতে হয়েছে। এই প্রসঙ্গে যে সব দার্শনিক প্রত্যয় গড়ে ওঠে তার দুই বিশিষ্ট প্রতিভূ প্লেটো ও অ্যারিস্টট্‌ল। বলতে গেলে এঁদের লেখার মধ্যেই পশ্চিমী রাষ্ট্রচিন্তার প্রথম উদ্ভাসন, যার প্রভাব আজও অনস্বীকার্য।

এই এককে এই দুজন চিন্তাবিদের অবদান নিয়ে আলোচনা করা হবে।

৪৯.১ প্রস্তাবনা

গ্রীক দেশে রাজনৈতিক দর্শন ও রাষ্ট্রচিন্তার প্রাথমিক রূপ খ্রিস্টজন্মের প্রায় চার পাঁচ শতক আগে আমরা প্রত্যক্ষ করি। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকেই আমরাদেখি যে সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত নানা ধারণা বিকশিত হচ্ছে। বলা বাহুল্য, গ্রীস সভ্যতার প্রাথমিক কাঠামো গড়ে উঠেছিল শ্রেণিসমাজের ভিত্তির উপরই। কেননা শ্রমবিভাগ থেকেই শ্রেণিসমাজের অভ্যুদয় এবং সে সূত্রে গ্রীক সমাজের উপাদানগুলির অন্যতম হলো দাসপ্রথা। সেই সময়ে গ্রীস দেশে অসংখ্য নগর রাষ্ট্র ছিল। বলা বাহুল্য, নগর রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সংঘর্ষ ও বিবাদ লেগেই থাকত। স্পার্টা (Sparta), কেরিন্থ (Carinth), এথেন্সের মতো নগররাষ্ট্রগুলিতে যে ধরনের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কাঠামো ছিল সেখানে আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তাসমূহের মূলসূত্রগুলি অংশত রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য এবং অংশত সমাজে বিভিন্ন শ্রেণিগুলির রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য এবং অংশত সমাজে বিভিন্ন শ্রেণিগুলির মধ্যে ভারসাম্য রাখার জন্য অনেকাংশেই কার্যকরী করা হতো, অর্থাৎ গ্রীক রাষ্ট্রের পরিচয়লিপি পেতে হলে আমাদের নির্ভর করতে হবে ক্ষুদ্র নগররাষ্ট্রগুলির আয়তন, শ্রেণিকাঠামো ও জীবনযাপনের তথ্য সংগ্রহের ওপর।

প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে, আয়তন ও জনসংখ্যার বিচারে গ্রীক নগররাষ্ট্রগুলি ছিল ক্ষুদ্র আয়তনের ও জনসংখ্যাও ছিল আজকের বিচারে নগণ্য। ফলে, প্রবল জনস্ফীতিজনিত যে ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক আবর্তের জন্ম হয় তার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু জনসংখ্যার বিস্ফোরণ না হলেও সামাজিক স্তরবিন্যাসের মধ্যে এক অসম সমাজের চালচিত্র অনায়াসেই লক্ষ্য করা যায়। নগর রাষ্ট্রগুলিতে ক্রীতদাসপ্রথা বা slave-system প্রচলিত ছিল। শুধু তাই নয়, এই ক্রীতদাসপ্রথার ওপর নির্ভরশীল ছিল গ্রীক রাষ্ট্রচিন্তা ও তদানীন্তন নগরসভ্যতা। অবশ্য এই নগরসভ্যতার কাঠামোর মধ্যে আধুনিক যুগের জনজীবনের গতিশীলতা বা পেশাভিত্তিক শ্রমবিভাজন ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল না। আর ছিল না বলেই নগররাষ্ট্রগুলির মধ্যে ব্যাপক নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা ছিল। বস্তুত সমাজে ও নগরজীবনে বিশৃঙ্খলার প্রাদুর্ভাব হলেই বিকল্প পথের অনুসন্ধান করার প্রাথমিক প্রয়াস শুরু হয়ে এথেনীয় নগররাষ্ট্রেও তাই হয়েছিল।

কিন্তু অন্যান্য নগররাষ্ট্রগুলির থেকে এথেনীয় নগররাষ্ট্রের কাঠামো অধিকতর গণতন্ত্রসম্মত ছিল। সমাজে দাসপ্রথা তাকলেও অভিজাতশ্রেণির মানুষেরা অধিকাংশই নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন ছিল। Helot বা ভূমিদাসদের বস্তুত কোনও রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। মধ্যবর্তী স্তরে Perioiki নামে একদল মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী ছিল যাদের সামাজিক অধিকার থাকলেও রাজনৈতিক অধিকার ছিল না বললেই চলে। পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই গ্রীক রাষ্ট্রচিন্তার মধ্যে আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার প্রাথমিক উপাদানগুলি পেলেও সেখানে সার্বিক গণতন্ত্রের আভাস দেখতে পাননি। কেননা এথেনীয় গণতন্ত্রের মধ্যে সর্বস্তরের ও সর্বশ্রেণির মানুষদের মৌলিক অধিকার ছিল না। Metis বা দাসদের তো অধিকার ছিলই না।

এথেনীয় নগররাষ্ট্রে যে গণতন্ত্র কায়েম ছিল সেই গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির মূল বাহক ছিল অভিজাতবর্গের মানুষেরা। এথেন্স-এর নাগরিকেরা একটি Assembly বা গণসভা গড়ে তুলেছিল। এই গণসভার অধীন যে

প্রশাসনিক, বিচারবিভাগীয় ও আইনগত ব্যবস্থা ছিল তার মধ্যে অন্যতম হলো ৫০০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি পরিষদ। এই পরিষদের মূল উদ্দেশ্য যদিও গণতান্ত্রিক ছিল, তবুও সেই গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে দাসেদের কোনও প্রবেশাধিকার ছিল না।

সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গেলে, এথেনীয় গণতন্ত্র যে ধরণের বিচার ব্যবস্থা ও আইনসভা গড়ে তুলেছিল, সেখানে একটি তথ্য পরিষ্কার হয়ে ওঠে। সেটি হলো এই যে, অভিজাতশ্রেণীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও সেখানে আইনভিত্তিক একটি সরকার ক্রিয়াশীল ছিল। বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে প্রতিনিধিত্বের সুষম বন্টনের জন্য প্রত্যেকটি উপজাতির মধ্য থেকে একজন করে মোট দশজন সদস্য নিয়ে বিচারক পর্ষদ বা Board of Magistrates গঠিত হতো। উদ্দেশ্য ছিল যতোটা সম্ভব প্রশাসনকে দায়বদ্ধ করে তোলা। অধ্যাপক স্যাবাইন (Sabine) এথেনীয় বিচার ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক কাঠামোর অন্যতম স্মারকচিহ্ন বলে মনে করেছেন।

আসলে এথেন্সে উপরোক্ত বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল জুরি ব্যবস্থা। অনেক সময় প্রায় ৫০০ জন জুরি নিয়ে পৃথক বিচারক মন্ডলী গঠন করা হতো। আইনসভা, বিচারব্যবস্থা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার গঠন ও কাঠামো নিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এথেনীয় রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা মূলত এক উচ্চবিত্তনিয়ন্ত্রিত শাসনব্যবস্থা ছিল। অধিকাংশ নাগরিকই কৃষিকর্ম, বাণিজ্য, কারিগরীবিদ্যা, হস্তশিল্প সহ বহুবিধ পেশায় নিযুক্ত থাকতো। পরবর্তীকালে মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী Veblen সমাজতত্ত্বের ভাষায় যাদের অবসরভোগী শ্রেণী (The Leisure class) বলে চিহ্নিত করেছেন, সেই অবসরভোগী শ্রেণী এথেন্সে নিশ্চয় ছিল। কিন্তু তারা ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠ। এককথায় আধুনিক নগরজীবনের মতো গ্রীক নগরজীবন ও তার রাষ্ট্রিক চেতনাও ছিল অসম্পূর্ণ ও অপরিণত। শ্রমবিভাগ থেকে শ্রেণীসভ্যতার যে বিকাশ শুরু হয়েছিল তারই এক বিশ্বস্ত দলিল পাওয়া যাবে এথেনীয় নগররাষ্ট্রের মধ্যে। বস্তুত সক্রেটিসের জীবনদর্শনের মধ্যে দর্শন ও জীবনের মধ্যে যে অবিচ্ছিন্ন সংযোগ আছে তারই এক অখন্ড রূপ ধরা পড়ে। গ্রীক রাষ্ট্রচিন্তার প্রথম আভাস আমরা পাই সোফিস্ট (Sophist) দের ও সক্রেটিসের জীবনবোধে।

৪৯.২ প্লেটোর পূর্বসূরী (৪২৭ খ্রী. পূ — ৩৪৭ খ্রী. পূ)

গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর জন্ম ৪২৭ খ্রীস্টাব্দে। যে সময় প্লেটো জন্মগ্রহণ করেছেন সেই সময় গ্রীসের ইতিহাসে রাষ্ট্রচিন্তা ও দর্শনের ক্ষেত্রে এক অতি উচ্চমানের উৎকর্ষতা লক্ষ্য করা যায়। কেননা প্লেটোর আগে যাঁরা গ্রীক দর্শনকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করে গেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন থ্রেসিমেকাস (Thrasymachus), এ্যান্টিফোন্ (Antiphon) এবং প্রোটাগোরাসের (Protagoras) মতো দার্শনিকেরা। এঁদের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল মানুষের সঙ্গে সমাজের এবং মানুষের সঙ্গে আন্তর্মানবিক সম্পর্কের মৌল রূপটিকে বিশ্লেষণ। দার্শনিক থ্রেসিমেকাস বলেছিলেন যে, সমস্ত আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হলো মানুষ Man is the measure of all things. অর্থাৎ দার্শনিক মানুষের জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য প্রোটাগোরাস, থ্রেসিমেকাস সহ সোফিষ্ট (Sophist) দার্শনিকেরা এক নতুন পথনির্দেশ করেছিলেন। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে, দার্শনিকদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন উচ্চবিত্তের মানুষ। তাঁদের ছিল অখন্ড অবসর।

এবং সেই সুবাদে তাঁরা সমাজের এক সুশৃঙ্খল কাঠামো নির্মাণ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এঁরাই সক্রেটিস, প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের দর্শনচিন্তার সুস্পষ্ট রূপ দেবার পথ পরিষ্কার করেছিলেন।

৪৯.২.১ প্লেটো ও সক্রেটিস

প্লেটোর দার্শনিক গুরু ছিলেন সক্রেটিস। তিনি সক্রেটিসের নির্দেশেই পড়াশুনো শুরু করেন। কিন্তু সক্রেটিসের মৃত্যুর পর তিনি এথেন্স্ নগররাষ্ট্র পরিত্যাগ করে বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করতে শুরু করেন। উদ্দেশ্য ছিল অন্যান্য নগররাষ্ট্রগুলির সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নিজেকে সমৃদ্ধ করা। ক্রিট (Crete), কোরিন্থ, স্পার্টা প্রমুখ রাষ্ট্রগুলি পরিভ্রমণ করে প্লেটো পুনরায় এথেন্সে ফিরে আসেন। সালটা হলো ৩৮৮ খ্রীষ্টাব্দ। এবং সেই সময়েই তিনি তাঁর বিখ্যাত একাডেমীর (Academy) প্রতিষ্ঠা করেন। একাডেমী হলো এমনই এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও সংলাপ বা Dialogue-এর মাধ্যমে শিক্ষা ও দর্শন সম্পর্কিত ধারণা গড়ে ওঠে। Dialogue শব্দটিও এসেছে Dialigo বা বিতর্ক থেকে। পরবর্তীকালে এই Dialogue থেকেই Dialectics বা 'দ্বন্দ্ব' শব্দটির জন্ম হয়েছিল। অবশ্য বিতর্কের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে আসার পদ্ধতিটি প্লেটো সৃষ্টি করেননি। তিনি এই পদ্ধতিটি গ্রহণ করেছিলেন তাঁর গুরু সক্রেটিসের থেকে। প্লেটোর সুবিখ্যাত গ্রন্থ Republic তাই বস্তুত বিপুল পরিমাণ সংলাপ ও বিতর্কের সারসঙ্কলনমাত্র। বিতর্কের মাধ্যমে কোনও একটি সিদ্ধান্তে আসার পদ্ধতিটি অবশ্য অভিনব নয়। এই ধরণের পদ্ধতি ভারতীয় সমাজের অতীতেও প্রচলিত ছিল। বিশেষত দর্শনচিন্তার ক্ষেত্রে সাংখ্যদর্শন, জৈমিনীর ভাষ্যে এবং এমনকি শঙ্করাচার্যের ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যেও বিতর্ক-পদ্ধতির ছাপ স্পষ্ট পাওয়া যায়। সক্রেটিস তাই যে বিতর্ক পদ্ধতির আবিষ্কার করেছিলেন সেই পদ্ধতিটিকেই প্লেটো একটি সম্পূর্ণ রূপ প্রদান করেন। অবশ্য এই বিচার বা সিদ্ধান্তের মধ্যে যে চিন্তা আমরা ক্রিয়াশীল দেখি সেই চিন্তাগুচ্ছের মধ্যে ধারণা বা Idea -র সার্বভৌমত্বকে প্রশ্নাতীতভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ঘটনার বাস্তবরূপকেই একমাত্র সত্য বলে মেনে নেওয়া নয়, ঘটনার পশ্চাতে ক্রিয়াশীল মুহূর্তগুলিকেও জীবনের অবিভাজ্য অংশ বলে মেনে নেওয়াই হলো ধারণা বা Idea -র মৌল সত্তা-বিশেষ। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বাস্তবই একমাত্র সত্য নয়, ইন্দ্রিয় নিরপেক্ষ বা ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞানও সত্য বলে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। নচেৎ জ্ঞানের পরিপূর্ণ বিকাশ হতে পারে না। এবং মানুষের, বিশেষ করে ব্যক্তিরও, সার্বিক স্বাধীনতা অলব্ধ থেকে যেতে বাধ্য। মূলত ধারণার সর্বময়তাকে মেনে নিয়েই সক্রেটিসের জীবনদর্শন গড়ে উঠেছিল। তারই প্রতিফলন ঘটেছিল তাঁর রাষ্ট্রচিন্তায় ও সমাজবীক্ষায়। সোফিষ্টরা সমাজ ও ব্যক্তির প্রশ্নে ব্যক্তির সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সক্রেটিস সেই সিদ্ধান্তকেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উপযোগী বলে মনে করেছিলেন। প্লেটোও সক্রেটিসের পথনির্দেশকে মেনে নিয়ে ভাববাদকে তাঁর চিন্তায় প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে তাই দার্শনিকের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। প্লেটোর কল্পিত Republic বা গণরাজ্যে দার্শনিক-অভিভাবকদের রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। তিনি যে গণরাজ্য বা Republic -এর কথা বলেছেন সেখানে সম্ভাব্য বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের প্রভাব থেকে সমাজকে মুক্ত করার জন্য এক প্রকারের স্তরীভূত সামাজিক কাঠামো এবং রাষ্ট্রচিন্তার কথা ভেবেছেন, যেখানে সমাজের সর্বস্তরের মানুষদের প্রশাসনিক স্তরে প্রবেশের সুযোগ থাকবে না। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট

কর্মসূচী গ্রহণ করে এক সুশৃঙ্খল ও ন্যায়ের (Justice) ওপর প্রতিষ্ঠিত প্রশাসনিক কাঠামো পত্তন করা সম্ভবপর হবে। প্লেটো যে একাদেমীর মাধ্যমে পূর্বোক্ত বক্তব্যগুলি পেশ করেছেন, সেগুলির অন্যতম উপাদান ছিল কথোপকথন বা সংলাপ। বিভিন্ন দার্শনিকের কথোপকথন ও আলাপচারিতার মাধ্যমে Republic বা প্রজাতন্ত্রের সুনির্দিষ্ট নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। প্লেটোর মূল আদর্শ হলো এক বলিষ্ঠ ন্যায়নীতির সাহায্যের উপর রাষ্ট্রীয় কাঠামো নির্মাণ করা বলা যায় যে, প্লেটোর সমগ্র রাষ্ট্রীয় তত্ত্বটি ন্যায়নীতির ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

৪৯.৩ প্লেটোর চিন্তায় ন্যায়নীতি

Justice বা ন্যায়নীতির তত্ত্ব হলো এক সুশৃঙ্খল রাষ্ট্রব্যবস্থার তত্ত্ব। অনেকটা জীবদেহের মতোই রাষ্ট্রের গঠন। যে কথাটা উনিশ শতকে ইংরেজ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হর্বার্ট স্পেন্সার বলেছিলেন। তিনিও রাষ্ট্রকে জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। প্লেটো অবশ্য দীর্ঘদিন আগেই ন্যায়নীতির প্রশ্নটিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে ন্যায়শাস্ত্র অনেকটা নীতিনির্ভর লোকজ সমাজের প্রতিবিম্বমাত্র। তাঁর Republic গ্রন্থের সারসঙ্কলন করলে বোঝা যাবে যে, ন্যায়তত্ত্ব আকস্মিকভাবে প্লেটোর চিন্তায় আসেনি। অবশ্য কারুরই আসে না। আসলে ন্যায়নীতি প্রশ্নটি জরুরী হয়ে উঠেছিল অন্যবিধ কারণে। প্লেটোর যুগে এথেনীয় নগররাষ্ট্রে চূড়ান্ত নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা ছিল। প্লেটোর কাছে ন্যায়নীতি হলো ব্যক্তির চূড়ান্ত বিকাশের পথটিকে সুসংবদ্ধ করে তোলা। ন্যায়নীতি বা Justice-এর মূল উদ্দেশ্যই হলো একটি সমাজকে এক সুসংহত কাঠামোয় রূপান্তরিত করা। অবশ্য গোষ্ঠী বা শ্রেণীর সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ককে বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন প্লেটো। স্পার্টা সহ অন্যান্য নগররাষ্ট্রগুলির কথা মাথায় রেখে প্লেটো ন্যায়নীতির প্রশ্নটিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। প্লেটোর আগে থ্রেসিমেকাস (Thrasymachus) সহ সোফিষ্ট্‌রা বিশ্বাস করতেন যে, ন্যায়নীতি একটি ভ্রান্ত ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। কেননা সমাজে বিভ্রান্তি ও অরাজকতা থাকলে অবশ্যম্ভাবীরূপেই ব্যক্তি মানুষের সার্বভৌমত্ব অনায়াসে প্রতিষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা অনিবার্যভাবেই এমন এক ব্যক্তিমানুষের আত্মপ্রকাশ নিশ্চিত করে তুলবে যিনি অনায়াসেই সমাজে ও গোষ্ঠীজীবনের মধ্যে একধরণের নিরাপত্তার বলয় সুদৃঢ় করতে সক্ষম হবেন। অনেকটা গীতার ভাষ্যের মতো। গীতার ভাষ্যে অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, যুগসঙ্কটের সময় মহাপুরুষ বা মহামানুষের আর্বিভাব আকস্মিকভাবে ঘটে না, যুগধর্মের নিয়মেই সাধারণ মানুষকে রক্ষা করার জন্য ঈশ্বর বা মহামানবের আবির্ভাব ঘটে থাকে। ভাগবদ্‌গীতায় অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন : "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" অর্থাৎ, সর্বধর্ম ত্যাগ করে আমাকে শরণ করে চলো। শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তির মধ্যে মহামানব চিন্তার এক মূর্ত প্রকাশ দেখি। কিন্তু গীতার মধ্যে ভাব ও তত্ত্বের যে সমন্বয় ঘটেছে এবং যা কিনা কুরু-পান্ডব যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আত্মপ্রকাশ করেছে তার অবিকল প্রতিরূপ আমরা থ্রেসিমেকাসের দর্শনে পাই না, গ্রীকসভ্যতার যে লগ্নে থ্রেসিমেকাসের আবির্ভাব সেই সময় এথেনীয় নগররাষ্ট্র গড়ে ওঠেনি। ফলে বলপ্রয়োগ বা ব্যক্তিগত শক্তি-সামর্থ্যকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হলো।

কিন্তু প্লেটো এই দর্শনকে গ্রহণ করেননি। প্লেটো তাঁর Republic গ্রন্থের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য

রেখেছেন। তাঁর কাছে ন্যায়নীতি (Justice) এবং আদর্শরাষ্ট্র গঠন পরস্পরের পরিপূরক। অধ্যাপক লিন্ডসে (A. R. Lindsay) বলছেন যে, প্লেটোর ন্যায়নীতির মধ্যে মানবচরিত্র গঠনের উপাদানগুলিকে সুদৃঢ় ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলা হয়েছে। এই ন্যায়নীতির চারটি উপাদান থাকা বিধেয় বলে প্লেটো মনে করেছেন। সেই চারটি উপাদান হলো : (১) Wisdom বা প্রজ্ঞা; (২) Courage বা সাহস; (৩) Temperance বা সংযম (৪) Justice বা ন্যায়নীতি। এই বিভাজন থেকে বোঝাই যাচ্ছে যে, প্লেটো ব্যক্তিমানসের উত্তরণকেও সমাজের সার্বিক স্থিতিশীলতা ও অগ্রগতির অবিচ্ছিন্ন অংশ বলে মনে করেছেন। দেখা যাচ্ছে যে, প্লেটোর চিন্তার মধ্যে ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে সেতুবন্ধনের প্রয়াস রয়েছে। এবং সেই সেতুবন্ধন হবে এক সুসংহত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠার মধ্যে। নীতিহীন ও অবাধ্য স্বৈরাচারকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন প্লেটো। তাই অনিয়ন্ত্রিত স্বৈরাচারের প্রতিপক্ষ হিসাবে এক শক্তিশালী আদর্শ রাষ্ট্র পত্তনের কথাই প্লেটো তাঁর গ্রন্থে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। মূলত প্লেটোর কাছে ন্যায়নীতির উদ্দেশ্যে হলো ব্যক্তির স্বাধীনতা ও আদর্শ রাষ্ট্রের মধ্যে এক সমতা রক্ষা করা। অধ্যাপক ডানিং (Dunning) বলেছেন যে, প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র ও ন্যায়নীতি কোনও সুখস্বপ্ন বা রোমান্সের দ্বারা পরিকল্পিত হয়নি। আসলে পেলোপনেসিয়ার যুদ্ধের ফলে যে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার জন্ম হয়েছিল সেই চূড়ান্ত বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্যই প্লেটো আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পরূপ নির্মাণ করেছিলেন। কেননা ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার মৌল উদ্দেশ্যই হলো এক সুশৃঙ্খল রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা।

৪৯.৪ অভিভাবক তত্ত্ব

এই সুশৃঙ্খল রাষ্ট্র প্রবর্তন করার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ করে শাসক-অভিভাবক শ্রেণীর ওপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করেছেন। কেননা তিনি মনে করতেন যে, অভিভাবক শ্রেণীর মানুষেরা হচ্ছেন সর্বোচ্চ গুণের অধিকারী। অতএব অভিভাবকদের দার্শনিক-অভিভাবক হিসাবে চিহ্নিত করাও হয়েছে। আসলে তখন গ্রীক সমাজে অসংখ্য ক্ষুদ্র নগর রাষ্ট্র পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হতো। থুসিদিদিস্ যে পেলোপনেসিয়ার যুদ্ধের বিবরণ লিখে গেছেন সেই যুদ্ধ মূলত ক্ষুদ্র নগর রাষ্ট্রগুলির নিরন্তর সংঘাতের পরিণতিমাত্র। অভিভাবক-শাসক শ্রেণীর মূল সামাজিক ভিত্তি হলো তাদের জ্ঞান ও মেধার উৎকর্ষতা। এবং এই জ্ঞান ও মেধার উৎকর্ষতা হচ্ছে কঠোর অনুশীলনের ফসল। সেই কঠোর অনুশীলনের যোগ্যতা সর্বশ্রেণীর মানুষ অর্জন করতে পারে না। তার কারণও ছিল। প্লেটো নিজে অভিজাতশ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শুধু তাই নয় তাঁর শ্রেণী থেকে প্রায় তিরিশজন স্বৈরাচারী আত্মপ্রকাশ করেছিল। তাঁর আত্মীয় ক্রিটিয়াস (Critias) সেই স্বৈরাচারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

এবং ক্রিটিয়াস প্লেটোর মতো নিজেও কবি ছিলেন। ফলে প্লেটোর ধারণা হয়েছিল যে, রাজ্য পাট পরিচালনা করবার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের থাকতে পারে না। তার জন্য বিশেষ ক্ষমতাবলীর অধিকারী হতে হয়। এবং সেই ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র অভিভাবক-দার্শনিকেরা। আসলে রাষ্ট্র-পরিচালনা ও প্রশাসনকে প্লেটো বিশেষীকরণের জায়গায় তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাই তিনি এক নির্দিষ্ট শিক্ষাব্যবস্থা ও সমাজনীতির কথা বলেছেন যার মধ্যে সুসংহত ও শৃঙ্খলায়িত সমাজ গড়ে উঠতে পারে।

৪৯.৫ সাম্যবাদ ও শিক্ষাব্যবস্থা

কিন্তু অভিভাবক-দার্শনিক-রাজনীতিক শ্রেণী প্লেটো যে সমস্ত কর্মসূচী নির্ধারণ করেছিলেন সেই কর্মসূচীগুলির মধ্যে আপাত-বৈপরীত্য ছিল। যেমন উনি বলেছেন সাম্যবাদের কথা এবং শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে গুরুত্ব পেয়েছে সঙ্গীত ও দেহচর্চার নান্দনিক শিক্ষণ-পদ্ধতি। সৌন্দর্যবোধ ও সৌন্দর্যচেতনার ব্যাপ্তির মধ্যে প্রকাশ পাবে অভিভাবক-দার্শনিকদের মেধা ও চিন্তার উৎকর্ষতা। সেই কারণে শিক্ষাব্যবস্থার শরীরচর্চা ও সঙ্গীত অনুশীলনের মাধ্যমে এক নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি করার তাগিদ অনুভূত হয়েছিল। অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্লেটো সর্বসাধারণের জন্য শিক্ষার দুয়ার খোলা রাখেননি। সাম্যবাদী চেতনার মধ্যেও একই প্রেরণা ক্রিয়াশীল ছিল। অর্থাৎ নারী ও সম্পত্তির ওপর রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ অধিকার থাকার যৌক্তিকতাকে প্লেটো আদর্শ সমাজ গঠনের অন্যতম শর্ত হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। তাই ব্যক্তিগত মালিকানা ও এককেন্দ্রিক বা আণবিক পরিবার গঠনকে প্লেটো আদর্শ রাষ্ট্র নির্মাণ কার্যের পরিপন্থী বলে মনে করেছিলেন। স্যাবাইন অবশ্য পরিষ্কার ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, প্লেটোর আদর্শ সমাজ গঠনের রূপকল্পে ক্রীতদাস বা slave -দের কোনও ভূমিকা ছিল না (he does not have anything to say about slaves)। সমকালীন যুগের নৈরাজ্যলাঞ্ছিত সমাজে প্লেটোর চিন্তা বস্তুত এমন এক কল্পরাজ্যের সন্ধান দেয় যেখানে ব্যাপক গণতান্ত্রিক কাঠামোর উপাদানগুলি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল। প্লেটো যখন স্ত্রী ও সম্পত্তির ওপর ব্যক্তিগত অধিকারকে নস্যাৎ করতে চাইছেন, তখন মানবপ্রজাতি বন্ধনহীন সামাজিক ঐতিহ্যকে অতিক্রম করে এক সুস্থ পারিবারিক কাঠামোকে জীবন ও জীবিকার পাথেয় বলে মনে করছে। কিন্তু প্লেটো সভ্য সমাজের এই অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত পরিবারের কথা বলেছেন। নিজের স্ত্রী, নিজের কন্যা বলে কিছু থাকবে না। শাসকগোষ্ঠীর কাছে হৃদয়সম্পর্কিত কোনও অভিব্যক্তিই গ্রাহ্য হবে না। প্লেটো এমনই এক অভিভাবক-দার্শনিকদের প্রশাসনকে গচ্ছিত রাখার চেষ্টা করেছেন যার কর্তৃত্ব হবে অনিয়ন্ত্রিত ও যার ভরকেন্দ্র হবে অভিজাত শ্রেণী।

৪৯.৬ মূল্যায়ন

সামগ্রিকভাবে প্লেটোর রাষ্ট্রচিন্তা পুনর্মূল্যায়নের অপেক্ষা রাখে। আধুনিক রাষ্ট্রবিদদের অনেকেই প্লেটোর রাষ্ট্রচিন্তার মধ্যে স্বৈরাচারের উপকরণ খুঁজে পেয়েছেন। পরবর্তীকালে জার্মান্ দার্শনিক হেগেল, নিটসে্ এবং এমনকি ইতিহাসবিদ রাঙ্ক (Ranke) প্লেটোকে এক আদর্শ রাষ্ট্রচিন্তাবিদ হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বার্কার কিন্তু প্লেটোর মধ্যে শেলীর নৈরাজ্যবাদ খুঁজে পেয়েছেন। অর্থাৎ নগররাষ্ট্রের গঠনপ্রকৃতির মধ্যে যে গ্রীক চিন্তা ও সৌন্দর্যতত্ত্বের নজির প্লেটো রেখেছেন, সেখানে বস্তুত এথেনিয় নগররাষ্ট্র নির্মাণের এক সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। মার্কস ও এঙ্গেলস্ এই যুগটিকে দাসযুগ বা দাস সমাজের যুগ বলে আখ্যা দিয়েছেন। বলা বাহুল্য যে প্লেটো দর্শনে দাস সমাজের কোনও সামাজিক স্বীকৃতি নেই। কিন্তু ব্যক্তির স্বার্থপর সত্তাকে অস্বীকার করে তিনি যে সামাজিক সংগঠনের সার্বভৌমত্বকে মানুষের কাছে পেশ করেছিলেন, তারই পরিমার্জিত ও পরিশোধিত রূপ আমরা পরবর্তীকালে প্রত্যক্ষ করলাম হেগেলের ভাববাদী দর্শনে।

৪৯.৭ অনুশীলনী

১। প্রাচীন গ্রীসের রাষ্ট্র ও সমাজ-সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

২। প্লেটো কেন অভিভাবক-দার্শনিকদের শাসক করতে চেয়েছিলেন ? এই সম্পর্কে প্লেটোর বক্তব্য সংক্ষেপে পেশ করুন।

৩। প্লেটোর সাম্যবাদ কী ধরণের ? তিনি যে সাম্যবাদের কথা বলেছিলেন সেখানে রাষ্ট্রের ভূমিকা কী কী?

৪। প্লেটোর ন্যায়নীতি সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ বিবরণ দিন।

৫। ন্যায়নীতির চারটি উপাদান কী কী ?

৬। প্লেটোর রাষ্ট্রচিন্তার মধ্যে স্বৈরাচারের নমুনার একটি উদাহরণ দিন।

৭। প্লেটোর আত্মীয় ক্রিটিয়াস কী ছিলেন ? প্লেটো কীভাবে তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন ?

৮। এথেনীয় নগররাষ্ট্র কী অন্যান্য নগররাষ্ট্রগুলির চেয়ে অধিকতর গণতান্ত্রিক ছিল ? থাকলে সেটা কী ধরণের ছিল ?

৪৯.৮ অ্যারিস্টটল ও সমসমায়িক গ্রীক সমাজ

গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের জন্ম থ্রেস্ নামক স্থানে ৩৮৪ খ্রীষ্টপূর্ব অব্দে। মাত্র সতেরো বছর বয়সে তিনি এথেন্সে যাত্রা করেন। এবং তাঁর শিক্ষাগুরু প্লেটোর একাদেমীতে ভর্তি হন। প্লেটোর একাদেমী বা শিক্ষালয় অনেকটা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ছিল। সেখানে কথোপকথনের মাধ্যমে শিক্ষাদান পর্ব শুরু হতো। প্লেটোর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর ছিল। অবশ্য প্লেটোর মৃত্যুর পর অ্যারিস্টটল একাডেমী বা পাঠশালার প্রধান হতে পারেননি। ৩৪৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ থেকে ৩৩৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেন এবং পরিশেষে আতারনিউস বা Atarneus-এর স্বৈরাচারী রাজা হার্মিয়ুসের (Hermius) ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ করেন এবং পরিশেষে ম্যাসিডনের সম্রাট আলেকজান্দারের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন।

৩৩৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দেই অ্যারিস্টটল প্লেটোর একাদেমীর আদলে লাইসিয়াম (Lyceum) প্রতিষ্ঠা করেন। এটাও অনেকটা পাঠশালার মতো। ইতিমধ্যে সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টায় আলেকজান্দার ম্যাসিডনের সীমানা অতিক্রম করে মধ্যপ্রাচ্যের পার্বত্য ও মরু অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর অসংখ্য দল-উপদলকে পরাস্ত করে সিন্ধু প্রদেশের সীমানায় উপস্থিত হন। আনুমানিক ৩২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আলেকজান্দারের মৃত্যু হয় এবং তার ফলে অ্যারিস্টটলকেও ম্যাসিডন ছাড়তে হয়। তিনি ৩২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। আলেকজান্দারের গৃহশিক্ষক অ্যারিস্টটল গ্রীকচিন্তার যে বিকাশ ঘটিয়েছেন তার পশ্চাদপট হিসাবে কাজ করেছে বিকাশোন্মুখ

এথেনীয় নগররাষ্ট্র এবং ভাবগত প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে সক্রেটিস ও প্লেটোর দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা। বস্তুত ঐ সময়েই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দর্শনেও এক বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল যার অন্যতম প্রেরণাদাতা ছিলেন কৌটিল্য। আসলে তখন ভারতবর্ষের বুকে অসংখ্য গণরাজ্য ছিল এবং যে গণরাজ্যগুলি খন্ডিত হতে হতে বিভিন্ন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাচ্ছিল। গুপ্ত ও মৌর্য সাম্রাজ্যের গঠনরীতির প্রাথমিক ব্যাকরণ কৌটিল্যই রচনা করেছিলেন। অনুরূপভাবে বলা যায় যে, অ্যারিস্টটলেরও মূল লক্ষ্য ছিল একটি শক্তিশালী নগর-রাষ্ট্র বা city-state গড়ে তোলা।

৪৯.৯ অ্যারিস্টটলের রাষ্ট্রতত্ত্ব

অ্যারিস্টটল রাষ্ট্রকে যেভাবে কল্পনা করেছিলেন তার মধ্যে প্লেটোর সুগভীর প্রভাব আছে। প্লেটো বলেছিলেন যে, রাষ্ট্র কতকগুলি শ্রেণীর সমষ্টিগত প্রকাশমাত্র। অ্যারিস্টটল বললেন যে, কতকগুলি গ্রাম নিয়ে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। এই সমন্বয় হলো জৈবিক। জৈবিক সমন্বয়ের ফলে কোনও একটি অংশকে অন্য একটি অংশ থেকে পৃথক করা যায় না। মানুষের দৈহিক কাঠামোর মতো রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে সামাজিক কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভবপর নয়। অ্যারিস্টটল তাই তাঁর Politics গ্রন্থে আলোচনাই শুরু করেছেন রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি নির্ণয়ের মধ্য দিয়ে। এবং সেই ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বললেন যে প্রকৃতিগতভাবে মানুষ হচ্ছে সমাজবদ্ধ জীব (Man is, by nature, social)। বলা বাহুল্য, প্লেটোর কালের মতো অ্যারিস্টটলও তাঁর সমসময়ে দেখেছিলেন এক অরাজক অবস্থা। অসংখ্য নগররাষ্ট্র পরস্পরের সঙ্গে নিরন্তর দ্বন্দ্বে রত। এই অবস্থায় যে কোনও ব্যক্তি ও চিন্তাবিদের কাছে শৃঙ্খলা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি আবস্যিক হিসাবে দেখা দেয়। তখন সবেমাত্র এথেনীয় নগর-রাষ্ট্র এক পূর্ণাঙ্গ রূপ পাচ্ছে এবং অন্য দিকে ভূমধ্য সাগরের সামুদ্রিক সীমা পেরিয়ে মাঝেমধ্যেই হানা দিচ্ছে এশিয় ভূখন্ড থেকে আগত হানাদাররা। সেই আক্রমণ ও প্রতিরোধের মধ্যে গড়ে উঠেছিল এথেনীয় নগর-রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক কাঠামো। যখন এথেন্সে ও অন্যান্য নগর-রাষ্ট্রগুলিতে ক্রীতদাসভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে উঠছে এবং এক অভিনব জীবনপ্রবাহের চিহ্নগুলি পরিষ্কার হয়ে উঠছে তখনই প্লেটো, অ্যারিস্টটল তাঁদের রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তার দলিলগুলি পেশ করছেন। সেই রাষ্ট্রচিন্তার প্রাথমিক সূত্রগুলি লিপিবদ্ধ হয়েছে তাঁর Politics গ্রন্থে।

অ্যারিস্টটল অবশ্যই তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্বে প্লেটোর বহু যুক্তি ও প্রতিপাদ্য বিষয়গুলিকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। যেমন প্লেটোর স্ত্রী ও সম্পত্তির সামাজিককরণকে তিনি রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অনিবার্য পরিণতি বলে মনে করেন নি। তাঁর কাছে প্লেটোর শাসকশ্রেণীর স্তরবিন্যাস বহুলাংশে গ্রহণযোগ্য মনে হলেও তিনি সর্বশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন মানুষের সমষ্ঠিগত চেতনা ও প্রয়োজনীয়তার ওপর। বোঝাই যে অ্যারিস্টটল গ্রীক-পূর্ব ইয়োনিয় (Ionio) ও ডোরিয়ান (Dorean) সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। অর্থাৎ মিশরীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব তদানীন্তন গ্রীক চিন্তাবিদদের উপর ছিল এবং অ্যারিস্টটলও সেই প্রভাবমুক্ত ছিলেন না। ফলে তাঁর চিন্তা ও চেতনার মধ্যে গ্রামভিত্তিক সমাজচিন্তার উপকরণগুলি থেকে গিয়েছিল। তাঁর চিন্তার বিষয় ছিল সমকালীন সমাজের সঙ্কট ও সেই সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের উপায়। সেই উপায় অন্বেষণের মধ্যেই

নিহিত ছিল রাষ্ট্রতত্ত্ব নির্মানের প্রচেষ্টা। অতএব যে সূত্রগুলি থেকে তিনি নগর-রাষ্ট্র নির্মাণের কথাগুলি ভেবেছেন সেগুলি মূলত গ্রামভিত্তিক সমাজ ও তার ফলিত রূপ সাহিত্য ও মহাকাব্যগুলি থেকে নেওয়া। হোমারের মহাকাব্য অডিসি ও ইলিয়াডের মধ্যে যে সভ্যতার রূপকল্প পাই তার প্রধানতম উপাদানগুলি উঠে এসেছে গ্রামীণ সভ্যতা থেকে। তখন গ্রামই বিশ্ব, বিশ্ব গ্রাম হয়ে ওঠেনি। অর্থাৎ আজকের দিনে যেটাকে global village বা বিশ্বায়িত গ্রাম বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে তার কোনও ভৌগলিক ও রাজনৈতিক অস্তিত্ব ছিল না।

৪৯.৯.১ ব্যক্তি ও রাষ্ট্র

অ্যারিস্টটল তাই কল্পনা করেছেন যে, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ব্যক্তির আগেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। কেননা মানুষ যেহেতু সামাজিক জীব, অতএব সে কিছু নীতি ও অনুশাসন মেনে চলবেই। বেঁচে থাকতে হলে তাকে খাদ্য অন্বেষণ ও বাসস্থানের সন্ধান করতে হয়। অতএব স্বাভাবিকভাবেই সঙ্ঘবদ্ধভাবে শ্রমের তাগিদে এবং অস্তিত্ব রক্ষার জন্য স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পরিবার গড়ে ওঠে। পরিবারের নিয়মিত চাহিদা মেটানোর জন্য যে অর্থনীতির প্রয়োজন হয় তাকে অ্যারিস্টটল গার্হস্থ্য অর্থনীতি বা Domestic Economy নামে অভিহিত করেছেন। আবার মানুষের চাহিদা শুধু পারিবারিক জীবনের সীমাবদ্ধতার মধ্যে সম্পূর্ণতা লাভ করে না। তাই পরিবার-বহির্ভূত গোষ্ঠী বা জনসমূহের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দাবী মেটানোর জন্য গড়ে ওঠে গ্রামব্যবস্থা। কালক্রমে গ্রামগুলির সীমানা প্রসারিত হতে থাকে এবং অনেকগুলি গ্রামের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে নগর-রাষ্ট্র বা city-state। অ্যারিস্টটলের রাষ্ট্রতত্ত্ব তাই সুস্থ সামাজিক জীবনের এক নির্ভরযোগ্য দলিল হয়ে ওঠে। এবং এই রাষ্ট্রগঠনের পটভূমি হিসাবে কাজ করে থাকে নীতিবোধ। কেননা, শৃঙ্খলা আনতে পারে একমাত্র নীতিবোধ। নগর-রাষ্ট্রে মানুষ তাই তার নীতিগত, বস্তুগত ও আত্মিক পূর্ণতার পথ অনুসন্ধান করে এবং সেই প্রয়াস সার্থকতা লাভ করে নগর-রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার মধ্যে। এককথায় রাষ্ট্র ব্যক্তি ও সমষ্টির সমষ্টিগত চেতনার আধার হয়ে ওঠে। সামগ্রিক বিচারে অ্যারিস্টটলের নগর-রাষ্ট্র সম্পর্কে ধারণা তাঁর কালসীমাকে অতিক্রম করতে পারেনি। রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বকে তাই তিনি জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করেছেন। অর্থাৎ মানবদেহে হাত, পা, চোখ ইত্যাদি হলো অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং হাড়, মাংস, রক্ত ইত্যাদি সাহায্যকারী অংশ। অনুরূপভাবে, অ্যারিস্টটল নগর সমাজকে ছয়ভাগে ভাগ করেছেন ঃ (১) শাসক, (২) পুরোহিত, (৩) সৈন্যদল, (৪) কৃষক, (৫) কারিগর এবং (৬) বণিকা। উল্লেখ্য যে, কৃষকসহ অন্যান্য শ্রমজীবী শ্রেণী সমূহকে তিনি নাগরিক বলেই গণ্য করেননি। এককথায় যারা উৎপাদক এবং ক্রীতদাস তাদের নাগরিক হবার কোনও অধিকার নেই। এমন কি তারা অবসর থেকেও বঞ্চিত। অ্যারিস্টটল যে আদর্শ রাষ্ট্রের কথা ভেবেছেন সেখানে ক্রীতদাস ও কৃষকদের কোনও স্থান নেই। এইক্ষেত্রে তিনি সক্রেটিস্ ও প্লেটোর দর্শন থেকে বিন্দুমাত্র সরে আসেননি। কেননা তিনি মনে করেছেন, শাসক বা প্রভুর নিরাপত্তা ও কুশলতার জন্য দাসের শ্রম একান্ত জরুরী। অর্থাৎ ক্রীতদাসের নিজস্ব কোনও সামাজিক ও আত্মিক সার্বভৌমত্ব থাকবে না। অবশ্য তুলনামূলকভাবে অ্যারিস্টটল প্লেটোর থেকে এক ধাপ

এগিয়েছেন। উনি বলেন যে, যদি কোনও দাসের মধ্যে মুক্তচিন্তার উপাদানগুলিকে দেখা যায় তাহলে তাকে স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য এই জাতীয় ঘটনাকে ব্যতিক্রম বলে গণ্য করতে হবে কেননা ক্রীতদাস জন্মসূত্রেই স্বাধীন চিন্তার অধিকারী নয়। এক অর্থে তিনি ধরেই নিয়েছেন যে, চিন্তার জগতে ক্রীতদাস জন্ম থেকেই বিকলাঙ্গ হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। বস্তুত অ্যারিস্টটল তুলনামূলকভাবে প্লেটোর থেকে গণতান্ত্রিক হলেও এথেনীয় সমাজে শ্রেণীবিভাজনের সারবত্তাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তবে দাসব্যবস্থার সংস্কার সাধনের কথা বলে তিনি কিছুটা উদারনৈতিক মনের পরিচয় দিয়েছেন।

রাষ্ট্রকে অ্যারিস্টটল ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ রূপ হিসাবে গণ্য করেছেন। তিনি মনে করেছেন যে, রাষ্ট্রের মাধ্যমেই ব্যক্তির আত্মিক ও মানসিক মুক্তি ঘটে। ভারতবর্ষে শঙ্করাচার্য যেমন ব্রহ্মের মধ্যে মানবাত্মার স্বরূপ প্রকাশিত হয় বলে মনে করতেন, অ্যারিস্টটলও অনুরূপভাবে রাষ্ট্রের মধ্যেই ব্যক্তিসত্তার মুক্তি হতে পারে বলে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তিনি বলছেন যে, মানুষ যখন নিজেকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করে, তখন তার মূল প্রকৃতিটি ধরা পড়ে। এবং যেহেতু রাষ্ট্রের মধ্যেই মানুষের পরিপূর্ণতা প্রকাশ পায়, অতএব রাষ্ট্রই হলো মানুষের মূল প্রকৃতি।

৪৯.৯.২ সরকারের শ্রেণীবিভাগ

মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক স্থাপন করতে গিয়ে অ্যারিস্টটল রাষ্ট্রের সংবিধানের কথাও উল্লেখ করেছেন। রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গেলে সংবিধানের প্রয়োজন। শাসকের সংখ্যা অনুযায়ী তিনি সরকারের স্তরবিভাজন করেছেন। সরকারের বিভিন্ন স্তরকে তিনি যথাক্রমে অভিজাততন্ত্র (Aristocracy), রাজতন্ত্র (Monarchy) ও মধ্যবিত্ততন্ত্র (Plutocracy) হিসাবে চিহ্নিতকরণ করেছেন। তবে যদি এগুলি বিকৃতরূপে পরিণত হয় তাহলে স্বৈরতন্ত্র (Tyranny), গোষ্ঠীতন্ত্র (Oligarchy) ও গণতন্ত্র (Democracy) ধীরে ধীরে সরকারের স্থিতিশীলতাকে বিপন্ন করতে পারে। অ্যারিস্টটল অবশ্য বঞ্চিত সরকার হিসাবে অভিজাততন্ত্রকেই সমর্থন করেছেন। কেননা গোষ্ঠীতন্ত্র কিংবা গণতন্ত্র প্রকারান্তরে বিপ্লবী পরিবর্তনকে অনিবার্য করে তুলতে পারে। আগেই বলা হয়েছে যে, অ্যারিস্টটল সমকালীন বিভিন্ন খন্ড খন্ড রাজ্যগুলির সংবিধান পাঠ করেছিলেন এবং সেই সংবিধানগুলির প্রয়োগকৌশলগুলিকে গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন। কার্থেজ (Carthage), ক্রিট্ (Crete), স্পার্টা (Sparta) প্রভৃতি রাজ্যগুলির সাংবিধানিক কাঠামোগুলিকে সমীক্ষা করে অ্যারিস্টটল কোনওটিকেই সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেননি। একমাত্র কার্থেজের সংবিধানকে অ্যারিস্টটলের গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছিল। কেননা কার্থেজ ও স্পার্টার সংবিধানের মধ্যে সাধারণভাবে অসন্তোষ ও অশান্তির উপাদানগুলি ছিল না। সেখানে বিপ্লব বা বিদ্রোহের ইঙ্গিত দেখা যায়নি। অ্যারিস্টটলের কাছে কার্থেজের সংবিধান অধিকতর গ্রহণযোগ্য হয়েছিল এই কারণে যে, সেখানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতো ব্যক্তির গুণাবলীর (merit) নিরিখে, সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে নয়। অর্থাৎ অবাধ গণতন্ত্রের মধ্যে যে নৈরাজ্যের সম্ভাবনা থাকে, সেই সম্ভাবনাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার জন্য তাঁর কাছে অভিজাততান্ত্রিক সংবিধানই শ্রেয়তম বলে মনে হয়েছিল। শাসনক্ষমতা অর্পণের ক্ষেত্রে তিনি কোনও আপস করতে রাজী ছিলেন না। কাঠামোগতভাবে সংবিধান গণতান্ত্রিক হলেও মেজাজে ও আদর্শে তা হবে

অভিজাততান্ত্রিক । এথেনীয় নগররাষ্ট্রের সর্বশ্রেণীর মানুষের রাজ্যপাট পরিচালনার ক্ষেত্রে অবাধ প্রবেশাধিকার থাকবে না, এটাই হলো শেষ কথা। নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনাকে চিরকালের মতো নিশ্চিহ্ন করার জন্য অ্যারিস্টটল এক সুসম ও সুস্থিত শিক্ষাব্যবস্থার কথা ভেবেছেন। অনেকটা প্লেটোর মতোই তিনিও দেহমনের মধ্যে সমন্বয়ী এক শিক্ষাব্যবস্থার কথা চিন্তা করেছেন। এবং যে শিক্ষাকে অ্যারিস্টটল গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন সেই শিক্ষা শুধু জ্ঞানসঞ্চয়ের জন্য সংরক্ষিত হবে না; শিক্ষার মৌল উদ্দেশ্যই হবে এক পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের জন্ম দেওয়া। একজন ব্যক্তি নন্দনতত্ত্ব বা সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে যদি নীতিবোধের সংমিশ্রণ ঘটাতে পারে তাহলে সেই ব্যক্তি প্রকারান্তরে সমাজ, সরকার ও রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীন উন্নতির সহায়ক হয়ে ওঠে। অ্যারিস্টটল যে শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা ভেবেছেন সেখানে ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে মেলবন্ধন করার প্রয়াসও পরিলক্ষিত হয়। এক হিসাবে অ্যারিস্টটলের রাষ্ট্রতত্ত্ব হেলেনীয় দাসব্যবস্থাজাত সমাজকেই উপজীব্য করে নতুন রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের অঙ্গীকার করেছে।

৪৯.৯.৩ মূল্যায়ন

অ্যারিস্টটল তাঁর Politics গ্রন্থের মধ্যে রাষ্ট্র সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনও বক্তব্য পেশ করেছেন কি না তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। স্যাবাইন বলছেন যে, অ্যারিস্টটল যত না রাষ্ট্র নিয়ে ভেবেছেন তার থেকে বেশী ভেবেছেন আদর্শ রাষ্ট্রের সম্ভাব্য কাঠামো ও তার উপযোগিতা নিয়ে। মনে রাখতে হবে, অ্যারিস্টটল যে শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করেছেন সেই শ্রেণীর কাছে দাসপ্রথা সমাজবিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে গণ্য করা হতো। সক্রেটিস, প্লেটো ও অ্যারিস্টটল কেউই তাই দাসদের রাজ্য ও প্রশাসন পরিচালনার অংশীদার বলে ভাবেননি। তার মধ্যে যদি কেউ হেগেলের ও সে সূত্রে উনিশ শতকের কোনও দার্শনিকের চিন্তাসমূহের সূত্র অন্বেষণ করার চেষ্টা করেন, তা হলে সেই প্রয়াস ভ্রমাত্মক হতে বাধ্য। আমাদের মনে রাখতে হলে যে, অ্যারিস্টটল অত্যন্ত বাস্তবমুখী একটি রাষ্ট্র-ব্যবস্থার কথা ভেবেছেন যেখানে সমাজের মধ্যে শ্রেণীগত ভারসাম্য বজায় থাকবে। বিপ্লব অথবা অস্থিরতা নতুন কোনও নৈরাজ্যের জন্ম দেবে না। অনাবশ্যক শ্রেণীসংঘাতের পথে যাওয়া অ্যারিস্টটলের কাম্য ছিল না। আবার দাসমুক্তির সাহায্যে নতুন সমাজ পত্তনের কথাও তিনি ভাবেননি। সেই সম্ভাব্য পরিণতি আমরা পাই ঈস্কাইলাসের নাটকে, সোফোক্লিসের বিয়োগান্ত কাহিনীগুলিতে। আসলে অ্যারিস্টটলের কাছে অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল এথেনিয় অভিজাতবর্গকে একটি শক্তিশালী অথচ সাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য শাসকশ্রেণীতে রূপান্তরিত করা। আধুনিক পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় চেতনার তিনিই ছিলেন প্রথম কৃতবিদ্য ও সার্থক রূপকার।

৪৯.১০ অনুশীলনী

১। অ্যারিস্টটলের রাষ্ট্রচিন্তা সম্বন্ধে আপনার ধারণা কী ?

২। অ্যারিস্টটল সরকারের যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

৩। অ্যারিস্টটল যে শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলেছেন সেই সম্পর্কে আপনার মতামত জানান।

৪। প্লেটোর সঙ্গে অ্যারিস্টটলের রাষ্ট্রনীতির বৈসাদৃশ্যটি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৫। অ্যারিস্টটলের রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তার মূল্যায়ন করুণ।

৬। অ্যারিস্টটল কার গৃহশিক্ষক ছিলেন ? তিনি প্লেটোর একাদেমির মতো কী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ?

৭। অ্যারিস্টটল সরকারের কয়প্রকার স্তরবিভাজন করেছিলেন ? এর পিছনে কী যুক্তি ছিল?

৪৯.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১। George Sabine : A History of Political Theory

২। A.J. Toynbee : A study of History (Vol - I)

৩। অমৃতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় : রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস

৪। সমরেন্দ্রনাথ সেন : বিজ্ঞানের ইতিহাস (১ম ও ২য় খন্ড একত্রে)

একক ৫০ ☐ রোমান যুগের চিন্তাধারা

গঠন

৫০.০ উদ্দেশ্য
৫০.১ প্রস্তাবনা
৫০.২ আইনসংক্রান্ত দর্শন
৫০.২.১ সিসেরো (খ্রীঃ পূঃ ১০৬ - ৪৩)
৫০.২.২ সেনেকা
৫০.৩ অনুশীলনী
৫০.৪ গ্রন্থপঞ্জী

৫০.০ উদ্দেশ্য

গ্রীক সভ্যতার গৌরবময় অধ্যায় দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। নানা সংঘর্ষ ও বহিরাগত উৎপাতে গ্রীক নগররাষ্ট্রগুলির শেষপর্যন্ত রাজনৈতিক অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। উদীয়মান রোমান সাম্রাজ্যে গ্রীক সভ্যতার মূল্যবান অবদানগুলি, বিশেষত রাষ্ট্রচিন্তার সূত্রগুলির পুনর্মূল্যায়ন হতে থাকে। এই প্রক্রিয়া থেকে রাষ্ট্র সম্বন্ধে নতুন যেসব ধ্যানধারণার উদ্ভব হয় পর্যায়ক্রমে একক পঞ্চাশ-এ সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

৫০.১ প্রস্তাবনা ও পটভূমি

গ্রীক যুদ্ধের পরে প্রাচীন রোম সভ্যতার আবির্ভাব ঘটেছিল। বস্তুতপক্ষে গ্রীক যুগের সময়ে রাষ্ট্রচিন্তার যে বিকাশ হয়েছিল তার তুলনায় রোমান যুগে রাষ্ট্রচিন্তার বিকাশ অভিনব কোনও সূত্র নির্দেশ করেনি। ইতিহাসগতভাবে বলা যায় যে, রোমান চিন্তানায়কেরা মূলত নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা নিয়েই চিন্তিত ছিলেন এবং সেই কারণেই তাঁদের লেখায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ইতিমধ্যে আলেকজান্ডারের অভিযান পর্ব শেষ হয়েছে এবং গ্রীক নগররাষ্ট্রগুলি নিশ্চিহ্ন হতে শুরু করেছে। প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের দর্শন রোমান দার্শনিকদের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার না করলেও স্টোইক দর্শন ও এপিকিউরিয় দর্শনের কিছুটা ছায়া আমরা রোমান চিন্তাবিদদের আলোচনায় দেখি। স্টোইক দর্শনের প্রধান প্রবক্তা জিনো (Zeno) খ্রীঃ ৩১১ পূর্বাব্দে এথেন্সে তাঁর দার্শনিক মতবাদ প্রচারের জন্য এক বিদ্যাপীঠ স্থাপন করেন। তিনি সাইপ্রাসে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। অন্যদিকে এপিকিউরিয় দর্শনের প্রবর্তক এপিকিউরাস তথাকথিত ভোগবাদী দর্শনের প্রবর্তক ছিলেন। জিনো যেখানে উদাসীনতা বা দুঃখ সম্বন্ধে নিস্পৃহতার মধ্যে মুক্তির উপায় খুঁজেছিলেন, এপিকিউরাস (Epicurus) অনুরূপভাবে

মানুষকে ঈশ্বরতত্ত্ব বর্জিত সাধারণ জীবনযাপনের উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর জীবনদর্শনের সঙ্গে ভারতীয় চার্বাক দার্শনিকদের সিদ্ধান্তের বহু সাদৃশ্য দেখা যায়। স্টোইক ও এপিকিউরিয়রা অতীন্দ্রিয়বাদ ও নিয়তিবাদকে অস্বীকার করে প্রকৃতিবাদ ও বস্তুবাদের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এপিকিউরিয় দর্শনে পরমানুবাদের প্রভাব লক্ষিত হয়। অর্থাৎ তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের নিজস্ব কিছু নিয়ম আছে এবং সেই নিয়মগুলি অলৌকিক কোনও নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। এই তত্ত্ব মূলত ডিমোক্রিটাসের (Democritus) চিন্তাগুচ্ছ থেকে আহরিত। বস্তুত রোমান সূত্রে লুক্রেটিয়াস (Lucretius) স্টোইক ও এপিকিউরিয় দর্শনের সঙ্গে রোমান সমাজের পরিচয় ঘটান। লুক্রেটিয়াস শুধু হেরাক্লিটাস, অ্যানাক্সাগোরাস, ডিমোক্রিটাস সহ গ্রীক দার্শনিকদের রচনাবলীর সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন না। তিনি গ্রীক পূর্ব যুগের ইয়োনিয় দার্শনিকদের রচনাবলীর সঙ্গেও তাঁর পরিচিত ছিল। ফলে রোমান যুগে আমরা দেখি রাষ্ট্রতত্ত্ব গ্রীক আদর্শ থেকে সরে এসে অন্যপথে হাঁটতে শুরু করেছে। রোমান চিন্তাবিদরাই সর্বপ্রথম আইন সম্পর্কে তাঁদের সুচিন্তিত এবং অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণাকে এক সুনির্দিষ্ট রূপ দিয়েছিলেন।

৫০.২ আইন সংক্রান্ত দর্শন

গেটেল ও স্যাবাইন উভয়েই মন্তব্য করেছেন যে, রোমানদের আইন-সংক্রান্ত ভাবনাগুচ্ছ ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ৪৫০ বছর আগে দ্বাদশ তালিকা বা Twelve Tables নামে রোমান আইনের যে প্রকাশ ঘটে সেগুলিও মূলত রোমান সমাজের লোকগাথা ও ধর্মীয় উপাদনগুলির মিশ্রিত ফসল। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, রোমান যুগ থেকেই রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে। তার কারণও ছিল। ধর্মই একমাত্র অস্ত্র যার মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে শৃঙ্খলা স্থাপন করা যায়। তাছাড়া রোমান সাম্রাজ্যের সীমানাও ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছিল। ক্ষুদ্র নগররাষ্ট্রগুলি বিলুপ্ত হয়ে রোমান সাম্রাজ্য আত্মপ্রকাশ করছিল। সেখানে যে দর্শন বৈধতা পাচ্ছিল তা হলো ভ্রাতৃত্ববোধের, একতার ও শৃঙ্খলার। এমনকি ইতিহাসে কুখ্যাত বলে চিহ্নিত রোমান সম্রাট ক্যালিগুলার সময়েও নীতিবোধ, ধর্ম ও আইনকে রাজ্যপরিচালনার ক্ষেত্রে অবিচ্ছিন্ন উপাদান বলে মনে করা হতো। সাম্রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যাও বাড়ল এবং তার সঙ্গে সাবেকি অভিজাততন্ত্রের পতন হলো। গ্রীক সভ্যতার যে উন্মেষ আমরা প্লেটো, অ্যারিস্টটলের সময় প্রত্যক্ষ করেছিলাম তার অনেকটাই রোমান সাম্রাজ্যের আবির্ভাবের ফলে ক্রমশ তার কৌলিণ্য হারালো। শাসকবর্গ প্রশাসন চালাবে এক নতুন ভাবধারা নিয়ে। সেই ভাবধারার অন্যতম প্রবক্তা হয়ে উঠলেন সিসেরো (Cicero) এবং সেনেকা (Seneca)। অবশ্য এপিক্টেটাস্ (Epictetus), মার্কাস্ অরেলিয়াস (Marcus Aurelins) এবং লুসিয়ান-এর (Lucian) মতো দার্শনিকেরাও নতুন করে রোমান ভাবধারার অন্যতম প্রতিভূ হয়ে উঠলেন এবং তাদের মূল উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠল সাধারণ মানুষের নীতিহীনতা ও মানসিক জীর্ণতা। ফলে বিজিত মানুষ, অসংগঠিত মানুষ এবং অসংখ্য অর্ধভুক্ত নরনারীর জীবনকে এক সবল রাষ্ট্রনীতির অধীনে রাখার প্রচেষ্টা শুরু হলো।

রোমেই প্রথম প্রচলিত হলো Jus gentium অর্থাৎ সকল জাতি ও ব্যক্তির জন্য সমভাবে প্রযুক্ত আইন। এই আইনই পরবর্তীকালে ইংরেজ সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞ ডাইসি (Dicey) ও জেনিংস্‌কে (Jennings) এক নতুন শ্রেণীনিরপেক্ষ আইন সৃষ্টি করতে প্রেরণা জুগিয়েছিল। Jus gentium প্রাকৃতিক আইনের সমান্তরাল। প্রাকৃতিক আইন হলো Jus Naturale। প্রাকৃতিক আইনের সঙ্গে সমর্থক আইনের মিশ্রণ ঘটিয়ে এক নতুন রোমান রাষ্ট্রচিন্তার ইমারত গড়ে উঠল। এই মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন পলিবিয়স্‌, সিসেরো, সেনেকা ও আরো ও অনেকে।

৫০.২.১ সিসেরো (খ্রীঃ পূঃ ১০৬ - ৪৩)

সিসেরোকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জর্জ স্যাবাইন বলছেন প্রথম স্বঘোষিত রাষ্ট্রনীতির তাত্ত্বিক। সিসেরো 'De Republica' এবং 'De Legibus' নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। সিসেরো মূলত প্লেটোর মতোই এক আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা ভেবেছিলেন। তিনি অনেকাংশেই প্লেটো ও তাঁর পূর্বসূরী পলিবিয়াসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্বের চমকপ্রদ অংশ হলো Natural Law বা প্রাকৃতিক আইনের সূত্রগুলি। তাঁর প্রাকৃতিক আইন-সংক্রান্ত ধারণার মধ্যে এপিকিউরাস্‌ ও জিনোর প্রভাব প্রকট। তিনি বললেন যে, প্রাকৃতিক আইন হচ্ছে সর্বজনীন। পলিবিয়সকে সমর্থন করে তিনি রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের এক বিশাল সংবিধানের কথা বলেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রভূতভাবে প্রভাবিত হয়েছেন জিনো ও অন্যান্য স্টোয়িক দার্শনিকদের দ্বারা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সিসেরো দৈবাবিধানের সঙ্গে প্রাকৃতিক নিয়মকে অভিন্ন করে দেখেছেন। সিসেরোর মতে দৈবের নির্দেশে পৃথিবী যেমন পরিচালিত হচ্ছে, তেমনই ঐ দৈব নির্দেশেই প্রাকৃতিক আইন পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ প্রাকৃতিক আইন বা Natural Law হলো দৈব নির্দেশেরই প্রতিবিম্বমাত্র। সেই আইনই হবে বিশুদ্ধ ও সর্বজনীন যা কিনা প্রাকৃতিক আইনের অনুবর্তী হবে। বলা যায় যে, এই প্রাকৃতিক আইনের কার্যকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে সিসেরো বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন সমতাবোধের ওপর। তিনি অ্যারিস্টটল ও প্লেটোর মতো বিশ্বাস করতেন না যে মানুষ জন্মসূত্রেই ক্রীতদাস হওয়ার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করে।

বরং সিসেরোর ঘোষণায় পরবর্তীকালের মানবতাবাদের প্রাথমিক রূপকে আমরা প্রত্যক্ষ করি। যে কথা রুশো, ভলতেয়ার, কান্ট ও এমনকি হেগেলের দর্শনে পাই তার প্রথম পাঠ সিসেরোই শুরু করেছিলেন। অন্তত আইনের ব্যাখ্যা সেই মানবতাবাদী চিন্তারই ইঙ্গিত দেয়। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলার প্রয়োজন যে, সিসেরো সমাজের সর্বস্তরে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ডাক দেননি। প্রকৃতি ও দৈবকে ক্ষমতার ভরকেন্দ্র করার পশ্চাতে রোমান সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী করারও ইঙ্গিত আছে। প্রাকৃতিক আইন যখন রাষ্ট্রিক আইনে পরিণত হয়, তখন সেই আইনের লক্ষ্য হয় রাষ্ট্রের সামাজিক, নৈতিক ও আদর্শগত কাঠামোকে সর্বজনগ্রাহ্য রাষ্ট্রনীতিতে রূপান্তরিত করা। এবং সেই রাষ্ট্রনীতিকেই মূলধন করে রোমান সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ নীতি ব্যাপকভাবে ভূমধ্যসাগরের সীমানা পেরিয়ে মিশরসহ উত্তর আফ্রিকার বিস্তৃত ভূখণ্ডে তার শাখাপ্রশাখা বিস্তার করেছিল।

৫০.২.২ সেনেকা

সিসেরো রোমান সাম্রাজ্যের প্রথম যুগে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। সেনেকা যখন তাঁর চেতনার স্বাক্ষর রাখলেন তখন নগররাষ্ট্র বিলুপ্ত হয়েছে এবং রোমান সাম্রাজ্য ইউরোপসহ অন্যান্য দেশে তার প্রভুত্ব বিস্তার করতে প্রয়াসী হয়েছে। অর্থাৎ সিসেরোর সঙ্গে সেনেকার চিন্তাজগতের মৌল পার্থক্য আছে। সিসেরো যেমন স্টোয়িক দার্শনিকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, সেনেকা তেমনই সমাজনিরপেক্ষ কোনও নীতিবোধ ও ব্যক্তিসত্তাকে স্বীকার করেননি। সেনেকা দেখেছিলেন কেমন করে সম্রাট নিরোর (Nero) আমলে ব্যক্তিস্বাধীনতার পথ অবরুদ্ধ হচ্ছে। রোমের রাস্তায় রাস্তায় তখন হাজার হাজার বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই বেকারদের জন্য অভিজাতরা লক্ষ লক্ষ মুদ্রা খরচ করতো কেননা পরিশেষে এরাই কালক্রমে হয়ে উঠবে সম্ভাব্য দাসবিদ্রোহের বিরুদ্ধে অনতিক্রম্য দুর্গ। রোমের কলিসিয়মে দেখানো হতো বীভৎস মনোরঞ্জনের খেলা যেখানে শৃঙ্খলিত কয়েদীকে ক্ষুধার্ত সিংহের মুখে ছেড়ে দেওয়া হতো। এবং সেই অমানবিক দৃশ্যের সাক্ষী থাকতো ঐ হাজার হাজার লুম্পেনরা। এই সর্বহারাও ছিল নীতিহীন, বিবেকহীন এবং আদর্শহীন একজন অসংগঠিত মানুষমাত্র। তারা রোমান অভিজাততন্ত্রের অবসান চাইত না। তারা চাইত অভিজাতবর্গের লুণ্ঠনে ভাগ বসাবার সুযোগ। এই সামাজিক সঙ্কট থেকেই জন্ম হলো সিনিক (Cynic) মতবাদের। সিনিকরা সমাজের এই বীভৎস রূপ দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। তারা তাই উপজীব্য করলো ভিক্ষাবৃত্তিকে এবং নির্বাসন দিল শ্রমকে। সেনেকা তাই এই গভীর নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাবার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্ব দিলেন নীতিবোধকে। তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল যে, কৃচ্ছসাধন ও মানবতাবোধ মানুষকে মুক্তির ছাড়পত্র এনে দেবে। এবং সেই ভূমিকাটি পালন করবে রাষ্ট্র। অর্থাৎ রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধমেই মানুষের আত্মিক পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হবে। এক অর্থে সেনেকা সিসেরো ও তাঁর পূর্বসূরী প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের রাষ্ট্রচিন্তা থেকে অনেক সরে এসেছিলেন। তাঁর সামনে নিরো ও কালিগুলার নিষ্ঠুরতার নিদর্শনগুলি নির্মমভাবে দৃশ্যমান ছিল। টাইবেরিয়াসের আমলে একটা দিনও যেত না যখন কারুর না কারুর মুন্ডচ্ছেদ হতো। এই বীভৎস নারকীয় সত্যকে সেনেকা প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নিস্পৃহ উদাসীনতায়। অথচ তাঁর এক সমকালীন দার্শনিক ট্যাসিটাসের (Tacitus) মতো তিনি আস্থা রেখেছিলেন নৈতিক পুনরুজ্জীবনের ওপর। তিনি মনে করতেন যে, মানবসভ্যতার অগ্রগতি মানুষের লোভ বাড়িয়ে দিয়েছে, প্রকৃতির সৌন্দর্যকে নষ্ট করে এবং স্বার্থপরতার দর্শনকে জনপ্রিয় করেছে। সেনেকা তাই মনে করেন যে, রাষ্ট্র শ্রেণী নিরপেক্ষভাবে তার দায়িত্ব পালন করবে এবং সামাজিক সমতা ও নীতিবোধের পুনরুজ্জীবন হবে তার মূল লক্ষ্য।

বস্তুত সেনেকার ভাবধারাকেই পরবর্তীকালে খ্রীস্টীয় ধর্মপ্রচারকরা মূলধন করেছিল। এই প্রথম বলা হলো রাষ্ট্রের কাছে ব্যক্তি বিশেষ ও শ্রেণীবিশেষের বিশেষ গুরুত্ব থাকবে না। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত আইনকে অস্বীকার করে কোনও নতুন সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। সেনেকা বিপ্লবী ছিলেন না; কিন্তু রোমান সমাজের অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায়গুলিকে নির্মমভাবে তুলে ধরেছিলেন।

৫০.৩ অনুশীলনী

১। রোমান যুগের সঙ্গে গ্রীক যুগের চিন্তাধারার পার্থক্য দেখান।

২। রোমান সাম্রাজ্যে আইন-সংক্রান্ত দর্শনের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

৩। সিসেরোর রাষ্ট্রচিন্তা সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

৪। সেনেকার দর্শনের মূল নীতিটি সংক্ষেপে লিখুন।

৫। Jus Gentium কী ?

৬। সিসেরো কোন্ দুটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন? প্রাকৃতিক আইন বলতে তিনি কী বুঝিয়েছেন ?

৭। সেনেকার সময় রোমান সাম্রাজ্যের অবস্থা কী রকম ছিল? একটি টিকা লেখ।

৫০.৪ গ্রন্থপঞ্জী

১। George Sobinc : A History of Political Theory.

২। A.J. Tognbee : A Study of History (Vol - I)

৩। অমৃতাভ বন্দোপাধ্যায় : রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস

৪। সমরেন্দ্রনাথ সেন : বিজ্ঞানের ইতিহাস (১ম ও ২য় খন্ড একত্রে)

একক ৫১ ☐ মধ্যযুগের ইউরোপে রাষ্ট্রচিন্তা

গঠন

৫১.০ উদ্দেশ্য
৫১.১ প্রস্তাবনা ও পটভূমি
৫১.২ ধর্মের প্রাধান্য
৫১.২.১ সামন্তবাদ
৫১.২.২ রাজতন্ত্রের নব অভ্যুদয়
৫১.৩ সেন্ট অগাস্টিন
৫১.৪ সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাস
৫১.৪.১ অ্যারিস্টটলের প্রভাব
৫১.৪.২ আইনের দর্শন
৫১.৫ অনুশীলনী
৫১.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৫১.০ উদ্দেশ্য

প্রাচীন যুগে গ্রীক ও রোমান সভ্যতার আমলে যে যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র ও সমাজ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা ও দর্শন তৈরি হচ্ছিল, তার ঠিক পরবর্তী কালে অনুরূপ ঐতিহ্য বহন করার মত বাস্তব অবস্থার অভাব দেখা দেয়। ইউরোপে এই সময়টি মধ্যযুগ রূপে চিহ্নিত এ সময়ে চিন্তাবিদগণের সামনে মূল প্রশ্ন ছিল কর্তৃত্বের প্রতি মানুষের আনুগত্যকে নিশ্চিত করা এবং তার উপযোগী তত্ত্ব রচনা। এই কর্তৃত্ব আসলে কোথায় সংস্থাপিত তার সদুত্তর খুঁজতে যে সব দৃষ্টিভঙ্গীর সন্ধান মেলে, সে সম্বন্ধে বিশিষ্ট কয়েকজন চিন্তাবিধদের কথা বলা হবে এই এককে।

৫১.১ প্রস্তাবনা ও পটভূমি

মধ্যযুগের ইতিহাস ঠিক কোন সময় থেকে শুরু তা নিয়ে মতভেদ ও বিতর্কের অবকাশ আছে। গ্রীকো-রোমান সভ্যতার পতন থেকে রেনেসাঁস বা পুনর্জাগরণের আবির্ভাবের মধ্যবর্তী পর্যায়কে সাধারণত অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। বিজ্ঞানী সমরেন্দ্রনাথ সেন বলছেন যে, এই যুগের অন্ধকার ইউরোপীয় মনের অন্ধকার। এই সময়েই খ্রীষ্টধর্ম এক আচারসর্বস্ব রূপ ধারণ করে এবং পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগ থেকেই অন্ধকারযুগের সূচনা হয়। অ্যারিস্টটল, প্লেটো, ডিমোক্রিতাস

তথা সিসেরো, সেনেকার দর্শনকে বর্জন করে ধর্মীয় আচরণকে মুখ্য উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করে ইউরোপের চিন্তাবিদের এক অনালোকিত অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন। খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতক থেকেই রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আক্রমণ করতে আরম্ভ করে। চতুর্থ শতকে ভ্যান্ডাল (Vandal) ও হুনদের আক্রমণে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। ইতিপূর্বেই দাসপ্রথার জন্য রোমান সাম্রাজ্য দুর্বলতর হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ বিপুলসংখ্যক শ্রমশক্তির অপচয় অসংখ্য মেধাশক্তির অগ্রগতির অবরুদ্ধ করেছিল। এই দাসপ্রথাকে অ্যারিস্টটল ও প্লেটো তো সমর্থন করেইছেন; এমনকি সিসেরোর মত মানবতাবাদী দার্শনিকও দাসপ্রথার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেননি। বস্তুত দাসদের পণ্য, দ্রব্য বা জিনিস হিসাবে চিহ্নিত করা হতো। গ্রীক সূত্রে যদিও বা ক্রীতদাসদের কিছুটা স্বাধীনতা ছিল, রোমান আমলে ক্রীতদাসের সামাজিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। একটি তথ্যে বলছে যে, খ্রীঃ পূঃ ২৫০ থেকে ১৫০ অব্দের মধ্যে রোমান সাম্রাজ্যে তিন-চতুর্থাংশ অধিবাসীই ছিলেন ক্রীতদাস। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ গিবন দাসপ্রথাকে রোমান সাম্রাজ্য পতনের অন্যতম কারণ বলে চিহ্নিত করেছেন। অসম সমাজে অন্তর্নিহিত দৈন্য ও ব্যাপক অর্থনৈতিক দুরবস্থা ধীরে ধীরে অন্ধকার যুগের সূচনা করেছিলেন।

৫১.২ ধর্মের প্রাধান্য

অন্ধকার যুগ বা মধ্যযুগে তাই ভাববাদ ও ধর্মীয় চেতনার আধিক্য ছিল বেশি। অ্যারিস্টটল, সিসেরো প্রমুখ দার্শনিকেরা কখনো কখনো বিজ্ঞানচিন্তার আশ্রয় নিলেও তাঁদের কাছে মনের ও সে সূত্রে ইচ্ছাশক্তির সর্বময় প্রাধান্যের উপর বেশি জোর দিয়েছেন। পরবর্তীকালে খ্রীস্টীয় ধর্মযাজকেরা তাই যাদুবিদ্যা ও কল্পভিত্তিক অলৌকিক চেতনার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। থর্নডাইক (Thorndike) ও সার্টনের (Sarton) মতে, সেন্ট জেরোম্ ও সেন্ট গ্রেসরী অত্যাশ্চর্য "ঐশ্বরিক ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য হীন যাদুবিদ্যার" আশ্রয় নিতেন (সমরেন্দ্রনাথ সেন)। সম্রাট জাস্টিনিয়ান এক আদেশ বলে ৫২৯ সালে এথেন্সের বিদ্যাপীঠ চিরতরে বন্ধ করে দিলেন।

ফলে বিজ্ঞানচিন্তা ও প্রগতির পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। পোপের প্রাধান্য বৃদ্ধি পেল এবং গ্রীক রাষ্ট্রচিন্তার পরিবর্ত হিসাবে পোপতন্ত্রের অন্যতম সমর্থক সেন্ট অগাস্টিন্ তাঁর উপস্থিতি জানিয়ে দিলেন।

৫১.২.১ সামন্তবাদ

মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তায় রাজতন্ত্র ও ঐশ্বরিক ক্ষমতার স্বীকৃতি অন্যতম উপাদান হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিল। এই সময়েই আইনসংক্রান্ত ধারণার বিশেষ বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। সদর্থক আইন, প্রাকৃতিক আইন ও প্রথাভিত্তিক আইন রাষ্ট্রচিন্তায় বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করে। সেন্ট টমাস্ অ্যাকুইনাস্ এমনকি ঈশ্বরের পরিবর্তে যুক্তিকেই আইনের মূল উৎস বলে মনে করেছিলেন। অন্যদিকে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব নিয়ে অভিনব ও সৃজনশীল কোনও চিন্তার বিকাশ এই যুগে ঘটেওনি। বস্তুত অভিজাতশ্রেণীর লোকেরা চার্চ, কাউন্সিল

ইত্যাদি সংগঠন গড়ে তুলেছিল; কিন্তু তাতে সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার ছিল না। সর্বশেষে বলা যায় যে, মধ্যযুগে চার্চকেই রাষ্ট্রদেহের আত্মা বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। মহাকবি দান্তের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত চার্চ ও রাষ্ট্রকে একই সত্তার দুইরূপ বলে ভাবা হয়েছিল। এককথায় মধ্যযুগ ছিল সামন্তবাদের যুগ। একাদশ শতক পর্যন্ত সামন্তবাদের চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছিল। অর্থনীতিবিদ পল সুইজি (Paul Sweezy) সামন্তবাদকে ভূস্বামীদের উত্থানের যুগ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এই অসংখ্য জমির মালিকদের কাছে Serf বা দাসেদের অস্তিত্ব একান্তভাবেই আবশ্যিক ছিল। কেননা অধিকাংশ দাসই ছিলেন ক্ষেত-মজুর ও সেই সঙ্গে গৃহভৃত্য। সামন্ত ও ভূমিহীন কৃষক বা দাসেদের সম্পর্ক অনেকটাই প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের মতো ছিল। অবশ্য এঙ্গেলস্ মার্কসকে একটি চিঠিতে বলেছিলেন যে, এই সম্পর্কটা শুধু সামন্তবাদের বৈশিষ্ট্য নয়; যে কোনও শ্রেণীসমাজে শোষক-শোষিতের সম্পর্ক প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কেই পরিণত হয়। এঙ্গেলস্ - এর যুক্তিকে মেনে নিয়েই বলা যায় যে, ইউরোপে মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তা মূলত সামন্তশ্রেণীর ভাবধারাকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ ভূস্বামী ও অভিজাতরা তাদের দর্শন ও জীবনবেদকে ধর্মীয় বিশ্বাস ও দৈববাদকে ভরকেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। বলা বাহুল্য সব কৃষকেরাই serf বা ভূমিদাস ছিলেন না। মার্ক ব্লক্ থেকে আরম্ভ করে ক্রিস্টোফার হল গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে, মধ্যযুগীয় ইউরোপের কৃষকদের অনেকেই স্বাধীন ছিলেন। কিন্তু তাঁদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা সামন্তবাদীদের মতো অসীম ছিল না। তাঁরা রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তা ও মধ্যযুগের জীবনধারায় ব্যাপক কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। ইতিহাসবিদ রডনি হিল্টনের মধ্যে ভূস্বামী-কৃষকের দ্বন্দ্বই হলো সামন্তবাদের প্রধান দ্বন্দ্ব। ভারতবর্ষে যেমন বর্ণভেদ এবং জাতিভেদ থাকার ফলে যে ধরণের সামাজিক স্তরবিন্যাসকে বৈধ ও আদর্শগতভাবে গ্রাহ্য বলে সাধারণ্যের মধ্যে প্রচার করা হয়েছিল, মধ্যযুগের ইউরোপেও প্রায় অনুরূপ সামাজিক স্তরবিন্যাস ক্রিয়াশীল ছিল। "ভূমিদাস-ক্রীতদাসের তুলনায় ছোট চাষী, ছোট প্রজা অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন, আবার ছোট প্রজা ও সামন্ত-প্রজার তুলনায় বড় জমিদার, জায়গিরদার থাকতে পারে (অমৃতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়)।" এই অমানবিক সামাজিক বিন্যাসে সাধারণ শ্রমজীবী কৃষক ও ভূমিহীন কৃষকদের অবর্ণনীয় দুর্দশার সম্মুখীন হতে হতো। সামন্তরা তাদের শ্রেণীস্বার্থেই চার্চকে কেন্দ্র করে এক ধর্মভিত্তিক সমাজ পরিচালনাকে সুনির্দিষ্ট রূপ দিয়েছিল।

৫১.২.২ রাজতন্ত্রের নব অভ্যুদয়

সামন্তবাদী সমাজচেতনায় তাই রাষ্ট্রের কল্পরূপ ছিল না। আনুগত্যের চেহারাটা ছিল অনেকটা ব্যক্তিগত। সেখানে ধর্মনিরপেক্ষ ক্ষমতার কেন্দ্র হিসাবে রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়নি। ভূস্বামীদের নির্দেশই ছিল আইন। ফলে রাজায় রাজায় সংঘর্ষ, ভূমিহীন কৃষক ও শ্রমজীবী কৃষকদের অপরিসীম দারিদ্র ও সর্বোপরি শহরে, বন্দরে পণ্যব্যবসায়ীদের উত্তরোত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা সঞ্চয় দীর্ঘদিনের সামন্ত সমাজে আঘাত করতে তৎপর হচ্ছিল। সংগঠিত অরাজকতাকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য এক বৃহত্তর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার কথা ভাবা হলো। সলিসবারির জন সর্বপ্রথম পোপতন্ত্রের প্রতিপক্ষ হিসাবে রাজতন্ত্রকে রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত করলেন। এবং পরবর্তীকালে আমরা দেখলাম যে, ক্রমশ এক নতুন শ্রেণী

ধীরে ধীরে মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার বিরুদ্ধে তাদের বক্তব্য পেশ করছে। মহাকবি দান্তে, ইংল্যান্ডের প্রতিবাদী কবি মিল্টন সোজাসুজি আক্রমণ করলেন পোপতন্ত্র ও দৈবনির্ভর রাজনৈতিক বিশ্বাসের স্তম্ভগুলিকে। তাঁদের কাছে রাজতন্ত্র হয়ে উঠল নবচেতনার ইঙ্গিতবাহী। পাডুয়ার মার্সিলিয়াস গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দর্শনের খসড়া Defensor pacis নামক বইটির মাধ্যমে হাজির করলেন পাঠকের দরবারের। পোপতন্ত্র-বিরোধীদের মধ্যে অন্যতম হলেন মার্সিলিয়াস ও উইলিয়াম অফ্ ওকাম্ ((William of Occam)। বস্তুত চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতক থেকেই আর এক অধ্যায় রচনার প্রস্তুতিপর্ব শুরু করছিল এক নতুন শ্রেণী। বণিকেরা ক্ষমতার স্বাদ পাবার জন্য সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক শৃঙ্খলাকে ছিন্ন করে ধর্মনিরপেক্ষ ক্ষমতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছিল। রাজতন্ত্র হয়ে উঠল সেই স্বপ্নের বাস্তবরূপ।

৫১.৩ সেন্ট অগাস্টিন

সেন্ট অগাস্টিন (St. Augustine) ইউরোপের মধ্যযুগের এক অন্যতম চিন্তানায়ক। অগাস্টিনের আগে দেখা যায় যে ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণায় চার্চকে একমাত্র নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যাকার ও শক্তির স্তম্ভ বলে মনে করা হচ্ছে। রোমান সাম্রাজ্য পতনের সময় যে সর্বাত্মক ক্ষয়ের ঢল নেমেছিল সেই পচনশীল সমাজের মধ্যেই যীশু খ্রীস্টের জন্ম। যীশু পৃথিবীতে শোষণ ও অপশাসন দূর করার জন্য সমাজ সংস্কার করতে ব্রতী হলেন। তাঁর কাছে ঈশ্বর হলেন গোটা পৃথীবির মালিক এবং প্রত্যেক নরনারী স্বর্গরাজ্যের প্রজা। খ্রীষ্টধর্মকে বিশ্বধর্ম রূপে প্রচার করলেন সেন্ট পল, ওরিগেন গ্রীকদর্শন ও পুরাণ থেকে নানা মত ও তথ্যের সমাবেশ করে দেখাবার চেষ্টা, করলেন যে খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাস বহু প্রাচীন জ্ঞানভান্ডার থেকে উদ্ভূত হয়েছে। সুতরাং নতুন কোনও পদ্ধতিতে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করবার দরকার নেই, এই ধারণাই দৃঢ়মূল হচ্ছিল। কেননা তখন Pagan বা পৌত্তলিকতাবাদদের আক্রমণে খ্রীস্টানরা রীতিমত সঙ্কটে পড়েছিল। এই দ্বন্দ্বের শুরু হয়েছিল ৪১০ খ্রীস্টাব্দে রোম সাম্রাজ্যের পতনের সময়।

বস্তুত পেগান্‌দের হাত থেকে আদর্শগত মুক্তি সন্ধানের জন্যই অনেকটা সেন্ট আম্‌ব্রোসের (St. Ambrose) আদলে সেন্ট আগাস্টিন খ্রীস্ট ধর্মের সমর্থনে জোরালো বক্তব্য পেশ করেন। খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতকেই The City of God বা 'ঈশ্বরের নগরী' নামক গ্রন্থে তাঁর প্রধান চিন্তাসূত্রগুলি বিধৃত হয়েছে। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল খ্রীস্টীয় চার্চকে দৈবসংস্থা হিসাবে ঘোষণা করা এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সেই সংস্থার সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। ফলে ন্যায়নীতি বা Justice প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্মীয় নীতিরাই-ফলিত রূপ হতে বাধ্য। অগাস্টিনের মতে রাষ্ট্র হলো দৈব শক্তিরই প্রকাশ। রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও বিকাশ প্রসঙ্গে ঐশ্বরিক অধিকার তত্ত্বের বা Theory of Divine Right তত্ত্বকে সমর্থন করেছেন। অধ্যাপক টরেনবির মতে, অগাস্টিনের ইতিহাসসংক্রান্ত তত্ত্ব প্রায় হাজার বছর ধরে ইউরোপীয় মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। চার্চ ও রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝাবার জন্য অগাস্টিন পার্থিব রাষ্ট্রের (Earthly State) সঙ্গে Eternal State বা শাশ্বত রাষ্ট্রের পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। অর্থাৎ দুই সমাজব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিতকরণ করার জন্যই উপরোক্ত সংজ্ঞার আবিষ্কার করা হয়েছে। তাঁর উপদেশ এই

যে, পার্থিব রাষ্ট্রগুলি যদি চার্চের বিধি-নিষেধ অনুযায়ী চলে তবেই মানুষের স্বর্গরাজ্যে প্রবেশাধিকার থাকবে।

স্যাবাইন অগাস্টিনের গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রচিন্তাবিদ হিসাবে স্বীকার না করলেও ইউরোপে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রস্থাপনার ক্ষেত্রে অগাস্টাইনের বিরাট অবদান আছে।

৫১.৪ সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাস

সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাস (১২২৭ - ১২৭৪) যখন তাঁর চিন্তাধারাকে সুসংহত রূপ দিচ্ছেন তখন পোপতন্ত্রের ক্ষমতা ইউরোপের খ্রীস্টান সমাজে তীব্র আকার ধারণ করেছিল। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, একাদশ ও দ্বাদশ শতক থেকেই ইউরোপে নবচেতনার ধারা ধীরে ধীরে সমাজের অগ্রণী শ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করতে আরম্ভ করে। এই শতকেই ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হয়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় আনুমানিক ১১৬৭ সালে। অবশ্য অক্সফোর্ড স্বীকৃতি লাভ করে ১২১৪ সালে। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১২৭৪ খ্রীস্টাব্দে। অনুরূপভাবে, ইতালীতে বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয়, স্পেনে সালমানসা বিশ্ববিদ্যালয় অথবা নেপলস্ বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য দেশগুলিতে বহু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের মধ্যেও জ্ঞানচর্চার প্রবাহটিকে বহতা করে রেখেছিলেন বহু পন্ডিতেরা। অধ্যাপক সমরেন্দ্রনাথ সেন বলছেন যে, অষ্টম শতাব্দীতে শার্লমাইনের শিক্ষা সংস্কার, স্ক্যান্ডিনেভিয় জাতিগুলির ভৌগোলিক তৎপরতা ও পরিশেষে ইহুদী পন্ডিতদের মাধ্যমে আরব বিজ্ঞানের পরিচয় ইউরোপে সাধারণ মানুষের মনে নবচেতনার বীজ বপন করতে সক্ষম হয়েছিল। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে সামন্তবাদের ছত্রছায়ায় থেকেও অনেকে নতুন করে সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে প্রথাগত ধ্যানধারণাকে বিশ্লেষণ করতে শুরু করেছিলেন। সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাস হলেন তাঁদেরই একজন।

৫১.৪.১ অ্যারিস্টটলের প্রভাব

অ্যাকুইনাসের সময়ে ধর্মযুদ্ধের অভিঘাতে ইউরোপের সমান্ততান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে একদিকে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার এবং অন্যদিকে অ্যারিস্টটলের দর্শনের প্রত্যাবর্তন শুরু হয়। সামন্তসমাজের যে স্থিতাবস্থা ছিল তার স্থিতাশীলতা কিছুটা শিথিল হবার ফলে মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার আংশিক পরিবর্তন ঘটে এবং চার্চ ক্রমশ অ্যারিস্টটলের দর্শনকে খ্রীষ্টধর্মের অবিভাজ্য অংশ বলে মনে করতে শুরু করে। অ্যাকুইনাস খ্রীস্ট ধর্মের দর্শনের সঙ্গে অ্যারিস্টটলের দর্শনকে মিশ্রণ করে এক অভিনব তত্ত্বের উপস্থাপনা করেন। তাঁর মতে, বিশ্বাস ও যুক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই। বরঞ্চ বলা যায় যে একে অপরের পরিপূরক। যুক্তি বিশ্বাসে উপনীত হতে সাহায্য করে। জ্ঞানের জগৎ অনন্ত জগৎ। জ্ঞানের বিশেষ বিশেষ শাখার মধ্যে সমন্বয় স্থাপিত হয় সর্বজনীন যুক্তিসঙ্গত নিয়মগুলির দ্বারা। এটি দর্শনের এলাকা। আবার মানবিক দর্শনে যুক্তির অপূর্ণতা ঐশ্বরিক যুক্তির

দ্বারা পূর্ণ হয়ে ওঠে। অ্যাকুইনাস এই সমন্বয় চিন্তার মাধ্যমে মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রেও মৌলিক পরিবর্তন আনেন। তিনি অগাস্টিনের সূত্রগুলিকে বর্জন করে বললেন যে, রাষ্ট্র ও চার্চ পরস্পরবিরোধী সত্তা নয়। তাঁর কাছে সমগ্র বিশ্ব একটি মহাসত্যে পৌঁছবার সোপানমাত্র। প্রত্যেকটি মানুষ নিজেকে তার প্রকৃতি অনুযায়ী উন্নত করতে চেষ্টা করে এবং তার ফলে ধর্মীয় চেতনার উচ্চস্তর গঠিত নিম্নস্তরগুলির উন্নত হবার প্রয়াসের মধ্য দিয়ে। ফলে দৈববাদকে আংশিক খন্ডন করে অ্যাকুইনাস এক নতুন রাষ্ট্রতত্ত্ব হাজির করলেন মানুষের সামনে। চার্চের কর্তৃত্বকে তিনি সর্বোচ্চ বলে মেনে নিলেও তিনি চার্চের আইনগত ক্ষমতাকে সর্বোচ্চ স্তর বলে স্বীকার করেননি। অন্যদিকে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকেও তিনি দৈবশক্তির প্রতিরূপ বলে মেনে নেননি।

৫১.৪.২ আইনের দর্শন

আইনের সর্বজনীনতা ও অলঙ্ঘনীয়তায় তাঁর বিশ্বাস ছিল। তাঁর মতে সমগ্র বিশ্বচরাচর অলঙ্ঘ্য নিয়মে বাঁধা। এই নিয়ম বা আইনগুলি চার প্রকারের। সেগুলি হলো যথাক্রমে চিরন্তন আইন (Eternal Law), স্বাভাবিক আইন (Natural Law), দৈব আইন (Divine Law), এবং মানবিক আইন (Human Law)। প্রতিটি আইনই বিভিন্ন স্তরে ও ক্ষেত্রে ঐশ্বরিক যুক্তির অভিব্যক্তি। চিরন্তন আইন হলো ঐশ্বরিক প্রজ্ঞার দ্বারা নির্দেশিত। এই নিয়মগুলি চিরায়ত ও শাশ্বত। প্রাকৃতিক আইন জীবজগতের চেতনায়, অনুভূতি এবং প্রবণতায় ঐশ্বরিক যুক্তির (Divine Reason) প্রতিফলন। জীবন সংরক্ষণের প্রবণতা, অহিংসা, প্রেম, মঙ্গলের অনুসরণ, পাপ ও অমঙ্গল থেকে দূরে সরে থাকার চেষ্টা প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক আইনের দ্বারা নির্দেশিত। যে সব ক্ষেত্রে মানবিক চেতনা স্বাভাবিক আইনের সারাৎসারকে উপলব্ধি করতে পারে না তখন ঈশ্বর দূতের মাধ্যমে তাঁর বাণী প্রেরণ করেন। দৈব অভীপ্সার এই অভিব্যক্তিই হলো অনন্তের বা দৈবের প্রকাশ বা Revelation। এবং ঐশ্বরিক বাণীর নির্দেশগুলিই দৈব আইন। বাইবেলে মোজেস্ বা যীশুর বাণী দৈব আইনের নির্দেশ বলেই অ্যাকুইনাসের দ্বারা চিহ্নিত। শাসক বা লৌকিক কর্তৃপক্ষ জনজীবনকে পরিচালনার জন্য যে আইন পরিচালনা করে সেগুলি মানবিক আইন রূপে চিহ্নিত হবে। তবে কোনও অর্থেই মানবিক আইন এবং স্বাভাবিক আইন চিরন্তন আইনের সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করতে পারে না। এইভাবে আইনের সংজ্ঞা ও ক্ষমতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে অ্যাকুইনাস চার্চ ও রাষ্ট্রের ক্ষমতার ক্ষেত্রের সীমানা চিহ্নিত করে দিয়েছেন।

রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও অ্যাকুইনাসের মন্তব্য অগাস্টিন কিংবা অ্যামব্রোসের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে। অ্যাকুইনাস মানবসমাজকে তার আদিম পাপ ও স্বর্গরাজ্য থেকে পতনের ফল বলে বর্ণনা করেননি। অনেকটা অ্যারিস্টটলের যুক্তি অনুসরণ করে তিনি বলছেন যে, নিঃসঙ্গতা ও একাকীত্ব দূরীকরণের জন্য মানবসমাজ গড়ে উঠেছে। ফলে পূর্ণতালাভের জন্য মানুষের যে নিরন্তর প্রয়াস সেই প্রয়াস সার্থকতার পরিণত হয় আইন প্রণয়ন ও শাসনের মাধ্যমে। এই প্রয়োজন থেকেই রাষ্ট্রের উদ্ভব এবং রাষ্ট্র ও শাসন ঐশ্বরিক বিধান। অ্যাকুইনাস অ্যারিস্টটলের যুক্তির কাঠামোতে আত্মস্থ করে ঈশ্বরতত্ত্বকে অনেকটা মানবিক করে তুলেছিলেন।

৫১.৫ অনুশীলনী

১। মধ্যযুগের ইউরোপের রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসের পশ্চাদ্‌পট কী ছিল ? তার একটি বিবরণ দিন।

২। সেন্ট অগাস্টিনের রাষ্ট্রচিন্তা সম্পর্কে যা জানা আছে লিখুন।

৩। মধ্যযুগের ইউরোপকে অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ কেন বলা হয় ? এ সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

৪। সেন্ট অগাস্টিন কী ধরণের রাজা প্রতিষ্ঠার কথা ভেবেছিলেন ? একটি ভাষ্য লিখুন।

৫। সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাসের রাষ্ট্রচিন্তা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৬। সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাসের আইন-সংক্রান্ত দর্শন কী ছিল ? সে সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষ্য লিখুন।

৭। অ্যাকুইনাসের ব্যাখ্যায় আইন কয় প্রকার ? একটি টিকা লিখুন।

৮। দৈব প্রকাশ বা Revelation বলতে অ্যাকুইনাস কাকে বুঝিয়েছেন ?

৫১.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১। George Sabine ঃ A History of Political Theory

২। A.J. Toynbee ঃ A Study of History (Vol - I)

৩। অমৃতাভ বন্দোপাধ্যায় ঃ রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস

৪। সমরেন্দ্রনাথ সেন ঃ বিজ্ঞানের ইতিহাস (১ম ও ২য় খন্ড একত্রে)

একক ৫২ ☐ মার্সিলিও অব পডুয়া ও সমন্বয়বাদী আন্দোলন

গঠন

৫২.০ উদ্দেশ্য

৫২.১ প্রস্তাবনা

৫২.২ মাসিলিওর রাজনৈতিক ভাবনা

৫২.২.১ আইন সম্বন্ধে ধারণা

৫২.৩ ধর্ম সম্বন্ধীয় ধারণা

৫২.৪ সমন্বয়ী আন্দোলন

৫২.৪.১ উইলিয়ম অফ ওকাম

৫২.৪.২ উইক্লিফ ও জন হাস

৫২.৪.৩ সমন্বয়ী আন্দোলনের প্রভাব

৫২.৫ অনুশীলনী

৫২.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৫২.০ উদ্দেশ্য

আগের এককে আমরা দেখেছি, মধ্যযুগে ধর্মবিশ্বাসকে অবলম্বন করে রাষ্ট্রচিন্তকগণ প্রথমে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও পরে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে কর্তৃত্বের আধার কিনা, এটা প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লাগেন। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে এক সমন্বয়ী চিন্তার উদ্ভব হয় যার সাহায্যে ধর্মও বজায় থাকে অথচ রাষ্ট্রের তরফে প্রয়োজনীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় বিঘ্ন না হয়। বর্তমান এককের সেটাই হবে মূল আলোচ্য বিষয়।

৫২.১ প্রস্তাবনা

পাডুয়ার মার্সিলিও (১২৭১-১৩৪০) মধ্যযুগের শেষার্ধে ধর্মীয় কর্তৃত্বের বিরোধিতায় ধর্মনিরপেক্ষ বা সেকুলার কর্তৃত্বের সমর্থনে সোচ্চার হন। মার্সিলিওর সমকালীন ছিলেন মহাকবি দান্তে (১২৬৫-১৩২১ খ্রীঃ)। ইতালির বিভিন্ন নগরীতে তখন ব্যবসার সম্প্রসারণ হচ্ছিল। রোম, ফ্লোরেন্স, ভেনিস প্রভৃতি শহরে মধ্যপ্রাচ্য থেকে এবং বলতে গেলে সারা পৃথিবী থেকে পণ্য বোঝাই জাহাজ আসতো এবং মুদ্রার বিনিময়ে পণ্যের লেনদেন হতো। ক্রুশেডের যুদ্ধের পর ইতালীর জনজীবনে ব্যাপক সমৃদ্ধি আসে এবং ইউরোপের বাজারে সোনা-রূপোর চল অনেক বেড়ে যায়। বস্তুত ইউরোপের মধ্যে

ইতালীতেই প্রথম বাণিজ্যের সম্প্রসারণ প্রায় আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠে। তাই বাণিজ্য সম্প্রসারণ করার তাগিদে এবং একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডের মধ্যে বিভিন্ন ভূস্বামীদের অনাবশ্যক তদারকী করার ক্ষমতাকে খর্ব করার জন্য ইতালীতে খর্ব করার জন্য ইতালীতে বণিক সম্প্রদায় ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর একাংশের মধ্যে পোপের নিরঙ্কুল আধিপত্য ও মন ও আধ্যাত্মিক জগতে পোপের অনাবশ্যক হস্তক্ষেপকে অবাঞ্ছিত বলে মনে করছিলেন। কেননা তখন ইতালীর নগরে বন্দরে এক নতুন শ্রেণী ভীড় করেছে। তাদের অনেকেই ছিলেন বণিক ও মধ্যবিত্ত। সেই শ্রেণী মধ্যযুগীয় ঈশ্বরতত্ত্বকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করল না। প্রতিমুহূর্তে বিভিন্ন সামন্তদের নির্দেশনামা, জমির উপরে সাবেকী উৎপাদন-সম্পর্ক এবং সর্বোপরি ধর্মের নামে উৎপীড়ন স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে কিছু মানুষ ধর্মনিরপেক্ষ এবং সার্বভৌম শক্তিকেন্দ্র সৃষ্টির কথা ভাবতে শুরু করেছিলেন। মার্সিলিও তাদের অন্যতম ছিলেন।

৫২.২ মার্সিলিওর রাজনৈতিক ভাবনা

১৩২৪ সালে প্রকাশিত তাঁর রচিত Defensor Pacis পুস্তকটি সেই মুক্ত চিন্তার অনবদ্য প্রকাশ। এই পুস্তকে ইউরোপে রাজতন্ত্রের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি ও প্রসারের ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে সব পরিবর্তন আসে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই প্রথম দেখা গেল যে, একজন চিন্তাবিদ চার্চকে রাষ্ট্রের অধীন একটি সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান বলে চিহ্নিত করলেন। তিনি বললেন পোপের সার্বভৌম ক্ষমতা হ্রাস করার কথা এবং এক গণতান্ত্রিক কাঠামো নির্মাণের কথা। অনাবশ্যক ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগের বিরুদ্ধে তিনি বললেন যে, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক শক্তির প্রকাশ এক নতুন চেতনার জন্ম দেবে এবং তার ফলে সমাজে আবশ্যক শৃঙ্খলা ফিরে আসবে।

মার্সিলিওর রাজনৈতিক ধ্যানধারণাকে পরস্পর সংযুক্ত দুটি অংশে ভাগ করা যায়। প্রথম অংশে রয়েছে রাষ্ট্র ও আইন সংক্রান্ত তত্ত্ব এবং দ্বিতীয় অংশে রয়েছে চার্চের সংগঠন ও তার এলাকা প্রসঙ্গে প্রথমোক্ত তত্ত্বের প্রয়োগ। এছাড়া অপর একটি অংশে প্রথম দুটি অংশে প্রযুক্ত তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তগুলির আলোচনা পাওয়া যায়।

মার্সিলিও অ্যারিস্টটলের ন্যায় রাষ্ট্রকে একটি জীবন্ত সংগঠন বলে মনে করেন। তিনি মনে করেছেন যে, মানুষের বহুমাত্রিক আকাঙ্খা তৃপ্তি করার জন্যই রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে। তিনি মনে করেন যে, রাষ্ট্র সমগ্র মানবসমাজের একটি অংশ বিশেষ এবং সর্বসাধারণের মঙ্গল সাধনই রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য। সেই হিসাবে অ্যারিস্টটলেরই পদ্ধতি অনুসারে তিনি সমাজের বিভিন্ন অংশ বা শ্রেণীর মধ্যে সমন্বয়ের কথা বলেছেন। তিনি সমাজকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমভাগে রয়েছেন কৃষক ও কারিগর সম্প্রদায় যাঁরা সমাজে বিভিন্ন উপকরণ এবং সরকারের রাজস্ব সরবরাহ করে থাকেন। দ্বিতীয়ভাগে রয়েছেন সেনাগণ ও সরকারী কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি যারা সরকার নিয়ন্ত্রণ ও দেশরক্ষায় নিযুক্ত থাকেন। এ

ছাড়া মার্সিলিও তৃতীয় ও শেষভাগে রেখেছেন যাজক সম্প্রদায়কে যারা সমাজের আত্মিক উন্নয়নের কাজে নিযুক্ত। কিন্তু ধর্ম যেহেতু একটি সামাজিক বিষয় তাই সমাজ নিয়ন্ত্রণের সঙ্গেও যুক্ত। বস্তুত মার্সিলিওর মতে ধর্ম সমাজ নিয়ন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

৫২.২.১ আইন সম্পর্কীয় ধারণা

আইনকেও মার্সিলিও তাই পার্থিব ও অপার্থিব দুভাগে ভাগ করেছেন। একটিকে বলেছেন ঐশ্বরিক আইন এবং অন্যটিকে বলেছেন মানবিক। ঐশ্বরিক আইন ঈশ্বরের আদেশ। সেই আদেশ ভঙ্গ করলে কিন্তু পার্থিব শাস্তি আরোপ করা যায় না। কিন্তু বিধিসম্মত মানবিক আইন লঙ্ঘন করলে পার্থিব আইনের এক্তিয়ারে এসে যায়। এবং এই আইনের উৎস হলো রাষ্ট্র। কিন্তু এখানেই মার্সিলিও গণতান্ত্রিক মনের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মতে আইন প্রণয়ণের ক্ষেত্রে কোনও একজন শাসক বা ব্যক্তি চরম বা সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী নন। সমগ্র জনসাধারণ বা নাগরিকদের যৌথ সংস্থা (body) এই ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর মতে সরকারের শাসন ও বিচারবিভাগ গঠনের দায়িত্ব জনসাধারণের যৌথ সংস্থার (body) যা আইনসভায় ন্যায় কার্যকর। তিনি রাষ্ট্রকে জনসাধারণের একটি সমষ্টি বা জনসমাজ হিসাবে দেখেছেন। অর্থাৎ ক্ষমতার মূল উৎস হচ্ছে জনসমাজ এবং সেই অর্থে সরকারের ক্ষমতা সীমিত বা সীমাবদ্ধ।

৫২.৩ ধর্ম সম্বন্ধীয় ধারণা

অনুরূপভাবে ধর্ম সম্পর্কেও তাঁর ধারণা অনেকটাই সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারী। এখানেও চার্চকে তিনি জনসমাজ বা Community-র একটি অংশ হিসাবে দেখেছেন। এবং এই জনসমাজ শুধু যাজকদের নিয়ে গঠিত হবে না, অনুগামী ও বিশ্বাসীদেরও এই সংগঠনে রাখতে হবে। সমগ্র খ্রীস্টান জনসমাজের অভিপ্রায় ও কর্তৃত্ব প্রয়োজনের জন্যই পরিচালন-পর্ষদ (Governing Council) গঠন করা হয় জনসমাজের নির্বাচনের মাধ্যমে। মার্সিলিওর মতে, পোপ হলেন চার্চের মুখ্য প্রশাসক এবং তিনি কখনই অসামরিক সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের উর্ধে নন। পোপের কাজ হবে ধর্মীয় উপদেশ, প্রচার ও ধর্মীয় অনুশাসন প্রচার করা। পোপ তাঁর অনুগামী ও বিশ্বাসীদের সহিত কাজ করার জন্য মৃদু ভর্ৎসনা করতে পারেন, এমনকি সতর্কও করতে পারেন। কিন্তু কখনই কৃচ্ছ্রসাধন বা প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য বাধ্য করতে পারেন না। অবশ্য তিনি চার্চকে রাষ্ট্রের একটি শাখা হিসাবে দেখেননি, যদিও তিনি সুস্পষ্টভাবে চার্চকে রাষ্ট্রের অধীন একটি সংস্থা বলে গণ্য করেন। মার্সিলিও রাষ্ট্রকে এক ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামো বলে মনে করেছেন এবং রাজতন্ত্রকে সমর্থন করেছেন। মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণার প্রেক্ষাপটে মার্সিলিওর রাষ্ট্রচিন্তা বহুলাংশেই সুদূর প্রসারী ছিল। বলা যায়, পুনর্জাগরণ বা Renaissauce আন্দোলনের প্রাথমিক পাঠ নির্ণয় করার পশ্চাতে তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির রূপ ও রেখা তাঁর কাছেই অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

৫২.৪ সমন্বয়ী আন্দোলন (Concilior Movement)

মার্সিলিওর ধ্যানধারণার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। মার্সিলিও যে ভাবে তাঁর সেকুলার তত্ত্বকে ইউরোপের মানুষের কাছে পেশ করেছিলেন তাতে সাধারণভাবে বলা যায় যে, পোপতন্ত্রের অপ্রতিহত আধিপত্য বহুলাংশেই অন্তত ভাবগত ও আদর্শগতভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। ত্রয়োদশ শতক থেকে পোপতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিত বিদ্রোহ লেগেই ছিল । যেভাবে ফরাসী রাজা পোপ বোনিফেস (Boniface)-এর আদেশ অমান্য করে চার্চের সম্পত্তির ওপর কর ধার্য করল তাতে বোঝা গেল যে চার্চের ক্ষমতা দুর্বলতর হয়ে পড়ছে। অন্যদিকে, সামন্তবাদী সমাজেরও ক্ষয় শুরু হয়েছিল। ১৩৭৮ সাল থেকে ১৪১৫ সাল পর্যন্ত সামন্তসমাজ ধীরে ধীরে ভাঙনের পথে এসেছিল। এবং এই ভাঙনের মধ্যেই পুনর্জাগরণের ধ্বনি শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল।

১৩৭৮ সালে এই ভাঙনের শব্দটা তীব্রতর হয়ে উঠল। Schism বা ভাঙনের সূত্রপাত হলো ফ্রান্সে এ্যাভিনন্ বা Avignon-এর পোপের সঠিক অবস্থান নির্ধারিত করা এবং তার ভিত্তিতে পোপ বিরোধীদের মধ্যে একজনের নির্বাচন। খ্রীস্টান চার্চের এই কলহ সামন্ততন্ত্রের কলহের থেকেও ভয়ানক আকার ধারণ করল। এবং তারই ফলশ্রুতি হিসাবে রাজতন্ত্রের গ্রহণযোগ্যতা ও রাষ্ট্রতন্ত্রের স্বাতন্ত্র ধীরে ধীরে সমাজের অগ্রণী শ্রেণীর মানুষের চেতনাকে আচ্ছন্ন করতে আরম্ভ করল।

৫২.৪.১ উইলিয়ম অফ ওকাম

এই সময় প্যারিসের জন ও ওকামের উইলিয়ম নতুন কথা বলা শুরু করলেন। উইলিয়ম ইতিমধ্যেই পোপের অখন্ড সার্বভৌমত্ব নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল যে, যদি পোপ ভ্রান্তির স্বীকার হন বা যীশুর সুসমাচারের (gospee) অপব্যাখ্যা করেন তাহলে সেই ভ্রান্তি থেকে মুক্তির উপায় কোথায় ? সেই উপায় অন্বেষণ করতে গিয়ে উইলিয়ম বললেন যে, খ্রীস্ট ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ভার একটি পরিষদ বা Council -এর ওপর ন্যস্ত হওয়া উচিত। কেননা অন্তত পরিমাণগত দিক থেকে বলা যায় যে, একজন ব্যক্তির থেকে যদি বহু ব্যক্তির উপর বিচার ও বিশ্লেষণের ভার অর্পণ করা যায়, তাহলে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটা সর্বজনগ্রাহ্য পদ্ধতি খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেখানেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়। পরিষদ যে সঠিক ব্যাখ্যা দিচ্ছে কি না সেটা জানার কী উপায় হবে ? কেননা মার্সিলিও ইতিমধ্যে যুক্তিবাদকে পরোক্ষভাবে সত্যসন্ধানের একটি মহার্ঘ অস্ত্র হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। বিভিন্ন শ্রেণীর অসন্তোষ, উৎপাদক শ্রেণী অর্থাৎ কৃষক শ্রেণীর জমি থেকে সার্বিক বিচ্ছিন্নতা ও নগরে বন্দরে ব্যাপক পণ্য বিনিময় পোপের অখন্ড সার্বভৌমত্বের ধর্মীয় ও সামাজিক ভিত্তিক দুর্বল করে দিল।

উইলিয়ম প্রশ্ন তুললেন যে, তাহলে শেষ বিচার করবে কে ? মার্সিলিও গণতান্ত্রিক কাঠামোর চালচিত্র তৈরী করে গিয়েছিলেন। উনি একটি পরিষদের কথা বলেছিলেন। পোপের আদেশ যীশুর মুখ নিঃসৃত বাণী নয় বা Old Testament-এর নির্ভরযোগ্য ভাষ্য নয়, এ রকম ইঙ্গিতও তাঁর বক্তব্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। ফলে বিচারের ভার কার উপর পড়বে ? ইতিহাসবিদ টয়েনবি (Toynbee) বলছেন যে, হেলেনীয় সভ্যতায়

যখনই এই জাতীয় বিচারের সঙ্কট দেখা দিয়েছে, তখনই চিন্তাবিদরা নির্ভর করেছেন লোকায়তিক চেতনায়, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সমষ্ঠিগত চেতনায়। উইলিয়ম তাই গুরুত্ব দিলেন ঈশ্বরনিঃসৃত বাণীকে, অর্থাৎ বাইবেলকে। পোপের থেকেও গুরুত্ব পেতে থাকলেন আদি ধর্মগ্রন্থ বাইবেল। এবং যে পরিষদের কথা উইলিয়ম বললেন সেখানে সাধারণ মানুষ Layman -এর সদস্য হবার অধিকার থাকবে। ধর্মতত্ত্ব থেকে উনি মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বা Free will কেও বিশেষ গুরুত্ব দিলেন। উইলিয়ম ফ্রান্সিস্কান ছিলেন। ফলে তাঁর সমন্বয়ী তত্ত্বের মূল কথাই হলো যে, পরিষদীয় সংস্থাগুলি ক্রমশ এক নির্বাচিত সংস্থার পরিণত হবে ও পোপের সার্বভৌমত্বকে আংশিকভাবে হ্রাস করবে। ওকামের এই সাহসী মন্তব্যের জন্য তাঁকে ধর্মীয় সন্ত্রাসের শিকার হতে হয়েছিলো। অ্যাভিননেতে কিছুদিন তাঁকে বন্দী করে রাখা হয়। পরে কোনক্রমে ব্যাভেরিয়ার সম্রাট লুই-এর রাজ্যে পালিয়ে গিয়ে প্রাণরক্ষা করেন।

৫২.৪.২ উইক্লিফ ও জন হাস

পরবর্তী কালে ওকামের অনুসারী উইক্লিফ (১৩২০-১৩৮৪) ও জন হাস (১৩৭৩-১৪১৫) ওকামের চিন্তাধারাকে আরোও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যান। এই দার্শনিকেরা সকলেই কেউ সেন্ট ফ্রান্সিস্ (জন্ম ১১৮১) এবং সেন্ট ডোমিনিকের (জন্ম ১১৭০) শিষ্য ছিলেন। ফ্রান্সিস্ কৃচ্ছ সাধনকে ব্রত করে সেবাধর্মে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। আর ডোমিনিক তুলনামূলকভাবে অধিকতর যুক্তিবাদী ছিলেন। সেন্ট টমাস্ অ্যাকুইনাস ডোমিনকানদের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিলেন। কারণ ডোমিনিকানরা অ্যারিস্টটলের যুক্তির আলোকে খ্রীস্টধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। উইলিয়ম্ ও তাঁর ভাবশিষ্য উইক্লিফ্ ও জন হাস ছিলেন ফ্রান্সিসের অনুগামী। কিন্তু পরিবর্তিত সমাজের প্রেক্ষাপটে তাঁরাও পোপতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাধারণ পরিষদ বা General Council গঠন করে ধর্মীয় আদর্শের সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ সামাজিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে প্রয়াসী হলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে এই সমন্বয়ী আন্দোলনের নেতৃত্ব কিছু পন্ডিতদের হাতে চলে যায়। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কার হাতে থাকবে তা নিয়ে সংশয় ও বিতর্ক অব্যাহত থাকে। ইতিমধ্যে কুসার নিকোলাস্ (Nicholas of Cusa) বাসেলের (Basel) পরিষদে ১৪৩৩ সালে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। সেই প্রস্তাবে শক্তি বা ক্ষমতার পরিবর্তে সহমত ও ঐক্যের ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়। ধর্মসংক্রান্ত এবং পার্থিব জীবনের সঙ্কটের প্রশ্নে আলোচনা ও ঐক্যমতের গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে শেষ বিচারের প্রশ্নটি অমীমাংসিত থেকে যায়।

৫২.৪.৩ সমন্বয়ী আন্দোলনের প্রভাব

সমন্বয়ী আন্দোলন মূলত ধর্মীয় ও সেকুলার চিন্তার মধ্যে পারস্পরিক সংঘাতের ফসল। স্যাবাইন বলছেন যে, আপাত দৃষ্টিতে সমন্বয়ী আন্দোলন ব্যর্থ হলেও বস্তুত সামাজিক জীবন ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োজনীয়তাকে নতুন করে বিশ্লেষণ করা শুরু হয়। মধ্যযুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায় থেকে রেনেসাঁসের উত্তরণের পথেই সমন্বয়ী আন্দোলন ও তত্ত্বের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। এই আন্দোলনের ফলেই পোপতন্ত্রের ঐতিহ্যগত আধিপত্যে ফাটল দেখা দেয় এবং ইউরোপের মানুষ রেনেসাঁসের প্রথম পাঠ নিতে শুরু করে।

৫২.৫ অনুশীলনী

১। মার্সিলিওর রাষ্ট্রচিন্তা কী ? উনি কি চার্চকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেছিলেন ? এ সম্পর্কে আপনার মতামত জানান।

২। মার্সিলিওর আইন ও ধর্মের ওপর যে বক্তব্য পেশ করেছেন তার ওপর ভিত্তি করে একটি সংক্ষিপ্ত রচনা লিখুন।

৩। সমন্বয়ী আন্দোলন কী ? সে সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করুন।

৪। সমন্বয়ী আন্দোলনে উইলিয়ম অফ ওকামের ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।

৫। সমন্বয়ী আন্দোলন কি পুরোপুরি সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ ছিল ? এ সম্পর্কে আপনার মতামত জানান।

৬। ১৩৭৮ সালে কী কারণে ভাঙন বা schism হয় ? একটি টিকা লিখুন।

৭। উইলিয়ম স্বাধীন ইচ্ছা বা Free will -এর কথা বলেছেন। তাঁর সম্পর্কে আপনার কী মতামত ?

৮। General Council বা সাধারণ পরিষদ সম্পর্কে যা জান লেখ।

৫২.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১। George Sabine — A History of Political Theory

২। অমৃতাভ বন্দোপাধ্যায় - রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস।

৩। A.J.Toynbee — A Study of History (Abridgement of vols I to VI by somervell) (Vol-I)

৪। সমরেন্দ্রনাথ সেন — বিজ্ঞানের ইতিহাস। (১ম ও ২য় খন্ড একত্রে)।

একক ৫৩ □ নবজাগরণ ও ম্যাকিয়াভেলি

গঠন

৫৩.০ উদ্দেশ্য

৫৩.১ প্রস্তাবনা

৫৩.২ রেনেসাঁস বা নবজাগরণের ধারণা

৫৩.২.১ নবজাগরণ সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য

৫৩.২.২ নবজাগরণের মূল্যবোধ

৫৩.৩ ম্যাকিয়াভেলির সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং সময়

৫৩.৪ ম্যাকিয়াভেলির রাজনৈতিক ধারণা

৫৩.৪.১ মানবপ্রকৃতি

৫৩.৪.২ ধর্ম ও নৈতিকতা

৫৩.৪.৩ রাষ্ট্র

৫৩.৪.৪ ক্ষমতা

৫৩.৪.৫ সর্বশক্তিমান আইনপ্রণেতা

৫৩.৪.৬ রাষ্ট্রশাসনের বিভিন্ন রূপ

৫৩.৪.৭ রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র

৫৩.৫ মূল্যায়ন

৫৩.৬ সারাংশ

৫৩.৭ অনুশীলনী

৫৩.৮ উত্তরমালা

৫৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৫৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল পঞ্চদশ শতকের ইউরোপ তথা ইটালির নবজাগরণের সঙ্গে আপনার পরিচয়স্থাপন এবং পঞ্চদশ শতকের ইটালির রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ম্যাকিয়াভেলির রাজনৈতিক চিন্তাধারার

উপস্থাপন। এ প্রসঙ্গে আপনাকে জানানো হচ্ছে —

- নবজাগরণের ধারণা, নবজাগরণ সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য এবং নবজাগরণের মূল্যবোধ।
- ম্যাকিয়াভেলির সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সময়।
- মানবপ্রকৃতি, ধর্ম ও নৈতিকতা, রাষ্ট্র, ক্ষমতা, সর্বশিক্তমান আইনপ্রণেতা রাষ্ট্রশাসনের বিভিন্ন রূপ এবং রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র সম্বন্ধে ম্যাকিয়াভেলির কিছু ধারণা।
- সমালোচনা ও অবদানসহ ম্যাকিরাভেলীর মূল্যায়ন।

৫৩.১ প্রস্তাবনা

এই এককে আমরা পঞ্চদশ শতকের ইউরোপ তথা ইটালির নবজাগরণ ও সেই সময়ের ইটালির রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ম্যাকিয়াভেলির সংক্ষিপ্ত জীবনী, রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা ও মূল্যায়ন প্রসঙ্গে আলোচনা করব।

পঞ্চদশ শতকে রোমের পতনের পর তার রাজধানী কনস্টাটিনোপল থেকে একদল গ্রীক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, পণ্ডিত ও শিল্পী ইউরোপ তথা ইটালিতে উপস্থিত হন এবং ল্যাটিন ও গ্রীক-চর্চার মাধ্যমে পুরোনো গ্রীক ঐতিহ্যকে ইউরোপের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করে নবজাগরণের বৌদ্ধিক পরিবেশ সৃষ্টি করেন। তাছাড়াও সামন্ততন্ত্রের অবসানে পঞ্চদশ শতকের ইউরোপে নতুন বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ ঘটে। জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা, ভৌগোলিক আবিষ্কার, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার ও জাতীয় ঐক্যের সম্বন্ধে সচেতনতার সঙ্গে সঙ্গে এই সময় মধ্যযুগীয় কুসংস্কার, নৈতিক মূল্যবোধ, ধর্মপরায়নতা ও ঈশ্বর ভাবনার বদলে দেখা যায় ধর্মনিরপেক্ষ ও নীতি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী, মানুষের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা এবং অভিজ্ঞতাবাদ, জাতীয়তাবোধ এবং মানবিকতা, যা আধুনিকতার সূচক।

ম্যাকিয়াভেলি পঞ্চদশ শতকের ইউরোপের নবজাগরণের শিক্ষা আত্মস্থ করে তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে চার্চের গুরুত্ব হ্রাস করেন, মানুষের মর্যাদার কথা বলেন এবং ঈশ্বরচিন্তা, অপার্থিবতা ও অতীন্দ্রিয়বাদ বর্জন করে অভিজ্ঞতার আলোকে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রশাসন, ক্ষমতা ও মানুষ সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং বাস্তব ও প্রায়োগিক রাজনীতির সূত্রপাত ঘটান। তিনি ইটালির ফ্লোরেন্সের সামরিক, কূটনৈতিক ও প্রশাসনিক পদ অলঙ্কৃত করেন। চাকরী সূত্রে বিভিন্ন দেশ ও রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর বিপুল অভিজ্ঞতা ছিল। জীবনের শেষ ১৫ বছরে চাকরী জীবনের শেষে তিনি বিভিন্ন গ্রন্থে রাষ্ট্রচিন্তা সংক্রান্ত তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেন।

ম্যাকিয়াভেলি পূর্ণ কোন রাষ্ট্রতন্ত্র বা দর্শনভিত্তিক রাজনীতি আলোচনা করেননি। বাস্তব রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মানবপ্রকৃতি, রাষ্ট্র, ক্ষমতা ও আইনপ্রণেতার ভূমিকা, রাষ্ট্রশাসন, রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য সরল ভাষায় আলোচনা করেছেন।

তাঁর লেখার মধ্যে কিছু অসঙ্গতি ও স্ববিরোধিতা থাকলেও রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে তিনি আধুনিকতার জনক বলে পরিচিত। তিনিই সর্বপ্রথম ধর্মনিরপেক্ষ ও নীতিনিরপেক্ষ রাজনীতির সূচনা করেন। তিনি গীর্জার আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন এবং মূল্যমান নিরপেক্ষভাবে রাজনীতি আলোচনা করেন। তিনি ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক। তাঁর সময়ের ইটালির অনৈক্য ও দুর্বলতা তাঁকে চিন্তিত করেছিল। ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী ইটালি গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি তাঁর বিভিন্ন লেখায় নানা সুপারিশ করেছেন।

৫৩.২ রেনেসাঁস বা নবজাগরণের ধারণা

সমগ্র পঞ্চদশ শতকে ইটালিতে নবজাগরণের বা রেনেসাঁস ঘটেছিল। এই নবজাগরণ হল একটি বৌদ্ধিক আন্দোলন যা মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্র ও গীর্জার আধিপত্যবাদের পতন সূচিত করে, অপার্থিবতা, কুসংস্কার ও ধর্মের বেড়াজাল থেকে মানুষকে মুক্ত করে, বৈজ্ঞানিকতা ও যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠা করে, বদ্ধ ও অপরিবর্তনশীল সামাজিক জীবনে পরিবর্তন ও গতির সঞ্চার করে এবং মানুষের স্বতন্ত্র সত্তা ও সৃজনশীলতা সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করে তোলে। নবজাগরণ প্রথমে ইটালিতে প্রত্যক্ষ করা গেলেও তা ইটালির ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে বন্দী থাকেনি। নবজাগরণের ঢেউ উত্তরে ও পশ্চিমে বিস্তার লাভ করে এবং ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশেই ছড়িয়ে যায়। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে নবজাগরণের প্রকাশের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য থাকলেও তাদের মধ্যে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তাই ঐতিহাসিকরা এই নবজাগরণকে ইউরোপীয় নবজাগরণ বলে অভিহিত করেন।

পঞ্চদশ শতকে এই নবজাগরণের ক্ষেত্রে দুটি কারণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল ছিল গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির পঠনপাঠন কেন্দ্র। ১৪৫৩ সালে তুর্কীদের হাতে কনস্টান্টিনোপলের পতনের ফলে একদল গ্রীক শিল্পী, সাহিত্যিক ও পণ্ডিত তাদের প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন পুঁথিপত্রসহ পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের দিকে যাত্রা করেন। ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁদের উপস্থিতি নবজাগরণের বৌদ্ধিক প্রবণতা সৃষ্টি করে। তাঁরে কাছে গ্রীক ও ল্যাটিনচর্চার মাধ্যমে ইউরোপীয়দের মধ্যে পুনরুত্থান ঘটে প্রাচীন গ্রীসের অবাধ, উদার ও মুক্ত জ্ঞানচর্চার। সর্বপ্রথম ইটালির মানুষ মানবতাবাদী ও যুক্তিমুখী চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হন এবং সিদ্ধান্ত নেন যে ঈশ্বর নয়, মানুষই বিশ্বচরাচরের কেন্দ্রবিন্দু।

দ্বিতীয়ত, পঞ্চদশ শতকে সমাজবিন্যাসের ক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখা যায়। অতীতের সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীবিন্যাসের বদলে দেখা দেয় নতুন বুর্জোয়া শ্রেণীবিন্যাস। নতুন বুর্জোয়া শ্রেণী ইউরোপীয় সমাজে তাদের প্রাধান্য বিস্তারে সচেষ্ট থাকে। নতুন বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন ধরনের ইউরোপীয় সমাজ ও অর্থনৈতিক বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়। নবজাগরণ মূলত এই বুর্জোয়া শ্রেণীর আবির্ভাব ও বুর্জোয়া অর্থনৈতিক বিকাশের ফল।

৫৩.২.১ নবজাগরণ সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য

নবজাগরণের যুগের চিন্তাভাবনাকে বিশেষভাবে আলোকিত করেছে বিজ্ঞানের অগ্রগতি। কেপলার, কোপারনিকাস, গ্যালিলিও ইত্যাদির আবিষ্কার সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে নতুন ধারণা দিল। মানুষ জানল যে সূর্যই মহাবিশ্বের কেন্দ্র এবং পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে। এতকাল মানুষ উল্টোটাই বিশ্বাস করত। গ্রহগুলির পারস্পরিক সম্পর্কও অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে নির্ভুলভাবে বিচার করা সম্ভবপর হল। পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষবিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র ইত্যাদি বিজ্ঞানশাস্ত্রগুলি বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিত্তিতে নতুন যুগের ধ্যানধারণাকে বিশ্বাসের বদলে যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করল।

১৪৫০ সালে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার নবজাগরণের নতুন চিন্তাধারাকে গতিশীল করে তোলে। মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে অল্প সময়ে অল্প খরচে হাজার হাজার পুস্তকের মুদ্রণ সম্ভবপর হল। ফলে নবজাগরণের চিন্তাধারা ও অল্প সময়ে সমগ্র ইউরোপে বিস্তৃতিলাভ করে। ভাববিনিময়ের এই নতুন ব্যবস্থা মানুষের বুদ্ধিগত জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল।

একই সময়ে ঘটে কিছু ভৌগোলিক আবিষ্কার। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার বা ভাস্কো-ডা-গামার জলপথে ভারত ভ্রমণ বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে নতুন ধারণা দ্বারা মানুষকে উদ্দীপ্ত করে এবং মধ্যযুগীয় পুরোনো বিশ্বাস ও ধারণা ভেঙ্গে অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে মানুষকে কৌতূহলী করে তোলে।

আগের তুলনায় এই সময় যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত আকার ধারণ করে। ফলে বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান ঘটতে থাকে এবং নতুন নতুন চিন্তাধারার উন্মেষ হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কেরও উন্নতি ঘটায়। বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত একদল মানুষ ও কিছু বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে ওঠে। এরাই নবযুগের উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণী। এরা অর্থনৈতিক প্রয়োজনে নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি করে তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ পূর্ণ করতে চেষ্টা করে। বুর্জোয়া অর্থব্যবস্থা মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটায়, যা নবজাগরণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণী বিভিন্ন দেশেবিদেশে নিরুপদ্রবে ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থে সামন্ততন্ত্র ও পোপের কর্তৃত্বের বদলে শক্তিশালী রাজনৈতিক শাসন কর্তৃপক্ষ হিসাবে রাজাকে সমর্থন করে। ফলে মধ্যযুগীয় পোপতন্ত্র ও সামন্ত্রতন্ত্র উভয়েই দুর্বল হয়ে পড়ে। মধ্যযুগে রাজারা সামরিক সাহায্যের জন্য জমিদারদের ওপর নির্ভর করতেন। কামানবারুদের আবিষ্কার রাজাদের স্বাবলম্বী করে তোলে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে দেখা দেয় শক্তিশালী রাজতন্ত্র।

রাজাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় জাতীয় রাজনীতি। জাতীয় রাজনীতি থেকে জাতীয় ঐক্য সম্বন্ধে সচেতনতা এবং জাতীয় রাষ্ট্র সম্বন্ধে নতুন ধ্যানধারণা গড়ে উঠতে থাকে।

৫৩.২.২ নবজাগরণের মূল্যবোধ

পঞ্চদশ শতকের ইউরোপে পূর্বোক্ত নানা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও নানা

পরিবর্তন সূচিত হয়। বস্তুত, বুর্জোয়াদের অর্থনৈতিক বিকাশ ও সাফল্যের জন্য নতুন ধরনের মূল্যবোধের প্রয়োজন হয়।

মধ্যযুগের সমস্ত চিন্তাভাবনা ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হত। ঈশ্বরকে অসীম, চিরন্তন ও সর্বোত্তম মনে করা হত। পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে রোমের পোপকে মান্য করা হত এবং ক্যাথলিক চার্চকে মনে করা হত স্বর্গীয় মহিমাযুক্ত। ঈশ্বরের তুলনায় মানুষকে ভাবা হত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। এই ক্ষুদ্র মানুষের নশ্বর দেহ ও আত্মাকে আবার ঈশ্বর বা অবিনশ্বর আত্মার আশ্রয়স্থল মনে করা হত। মানুষের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আত্মার মুক্তি। আত্মার মুক্তি সম্ভব ছিল অবিনশ্বর আত্মার সঙ্গে প্রকৃত সম্পর্ক গড়ে তোলার মধ্যে। পার্থিব সব কিছুর মূল্যায়ন হত তা কতটা আত্মার মুক্তির সহায়ক বা বাধা হিসাবে কাজ করছে তার ওপর।

নবজাগরণের আমলে কিন্তু মানুষের গুরুত্ব ঈশ্বরের থেকে বেশি ধরা হয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের গুরুত্ব ঈশ্বর ও মানুষের সম্পর্কের চেয়ে বেশি প্রাধান্য লাভ করে। স্বর্গীয় ও ঐশ্বরিক আদর্শের বদলে মানবিক আদর্শকে বড় করে দেখা হয়। ইহজাগতিক বিষয়গুলি পরজাগতিক বিষয়ের থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। ব্যক্তিত্বের বিকাশ, মেধার পরিচয়, বুদ্ধির উৎকর্ষ ইত্যাদি সমাজে প্রাধান্যলাভ করে। ইহজগতকে ঈশ্বরের লীলার বদলে গতিশীল প্রাকৃতিক শক্তির ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। জাগতিক ও বস্তুগত বিষয় আয়ত্ত করার প্রতিযোগিতাই সমাজের উদ্দেশ্য হিসাবে গৃহীত হয়। মধ্যযুগের ভীরু, দুর্বল ও কাপুরুষ মানুষের চিত্র পরিত্যক্ত হয় এবং জয়গান শুরু হয় সেই মানুষের যে সাহসী, আত্মবিশ্বাসী ও নির্ভীক। যে তার নিজের পথ নিজেই করে নিতে পারে, যে নিজের চেষ্টায় উন্নতির শিখরে পৌঁছতে পারে। বুর্জোয়া অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের মানুষের প্রয়োজনই অনুভূত হয়েছিল।

নবজাগরণের সাফল্যের ধারণা মধ্যযুগীয় সাফল্যের ধারণার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং জগতের মধ্যে যে উদ্দেশ্যগুলি অভিপ্রেত সেগুলি সম্বন্ধে ধারণা ও মধ্যযুগীয় ধারণা থেকে আলাদা। মধ্যযুগীয় মতে সাফল্য হল ভাল কাজ, প্রার্থনা, দয়া, আর রেনেসাঁস-এর মতে সাফল্য হল সাবেকী নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে কঠোর প্রতিযোগিতায় জয়লাভ, খ্যাতি ও সুনাম অর্জন। এই উদ্দেশ্যগুলি আয়ত্ত করার জন্য ক্ষমতার প্রয়োজন। ক্ষমতা শুধু যে খ্যাতি ও গুরুত্ব বাড়ায় তা নয়, ক্ষমতা নিজেই নিজের উদ্দেশ্য হিসেবে গৃহীত হয়। ক্ষমতা বলতে বোঝায় অন্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যা মানুষ অর্জন করে এবং যা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এইভাবে রেনেসাঁস আমলের নীতিবোধ ও রাজনীতি অভিন্ন হয়ে দাঁড়ায়।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে রেনেসাঁস বা নবজাগরণের মূল্যবোধ হিসাবে উল্লেখযোগ্য হল—-মানুষের গুরুত্ব উপলব্ধি ও তার নতুন মর্যাদাবোধের ধারণা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ধারণা যা মানুষের উন্নতি ও বিকাশের কোন সীমাপরিসীমা স্বীকার করে না। যুক্তিবাদ, যা মানুষ ও জগতকে বাস্তব ঘটনাবলীর,

ভিত্তিতে বিচার করে এবং ধর্মীয় গোঁড়ামি দ্বারা বিকৃত নয়। অভিজ্ঞতাবাদ, যা বাস্তব ও প্রকৃত ঘটনার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়, আধিভৌতিক ধারণার ভিত্তিতে নয়। জাতীয়তাবোধ, যার অর্থ হল যে মানুষের ভাগ্য একটি বৃহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উপলব্ধি করা যায়। মানবিকতা, যা উচ্চ আধিভৌতিক ধারণাবিরোধী এবং মানবিক আচরণের মানদণ্ডে স্বীকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা, বিজ্ঞানমুখিতা এবং আধুনিকতা।

অনুশীলনী — ১

১। রেনেসাঁস বা নবজাগরণের সংজ্ঞা লিখুন।
(আপনার উত্তর ১৫ পংক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ করুন)

২। বিজ্ঞান, মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার, ভৌগোলিক আবিষ্কার ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি কিভাবে নবজাগরণকে প্রভাবিত করেছিল?
(আপনার উত্তর ২০ পংক্তির মধ্যে সীমিত হবে।)

৩। নবজাগরণের নতুন মূল্যবোধগুলি কী কী ?
(আপনার উত্তর ২০ পংক্তির মধ্যে লিখুন)।

৫৩.৩ ম্যাকিয়াভেলির সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সময়

নবজাগরণের ঢেউয়ে যখন ইউরোপ আন্দোলিত, ঠিক সেই সময় ইটালির ফ্লোরেন্স নগরে ম্যাকিয়াভেলি জন্মগ্রহণ করেন (১৪৬৯-১৫২৭)। ১৪৯৮ সালে ২৯ বছর বয়সে তিনি ফ্লোরেন্স রিপাবলিকের সেক্রেটারী ও দ্বিতীয় চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন। ১৪৯৮ থেকে ১৫২২ পর্যন্ত তিনি ফ্লোরেন্স প্রশাসনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করেন। তিনি প্রশাসনিক, সামরিক ও কূটনৈতিক কাজে যুক্ত ছিলেন এবং তার ফলে অভ্যন্তরীণ বিষয় ও যুদ্ধ উভয়ই পরিচালনা করেছেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণের এবং সেই সব দেশের মানুষ ও সমাজ সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠভাবে জানার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি ইটালির অন্যান্য রাষ্ট্র এবং ফ্রান্স ও জার্মানীর তৎকালীন শাসক ও রাজনীতিবিদদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। ম্যাকিয়াভেলি শুধু অভিজ্ঞ কূটনীতিবিদ ও প্রশাসকই ছিলেন না, স্বদেশপ্রেমিক, কবি ও নাট্যকারও ছিলেন।

তিনি কিছু কবিতা, ম্যান্ড্রাগোলা (Mandragola) নাটক, বেলফাগর (Belfagor) গল্প, হিসট্রি অফ ফ্লোরেন্স (History of Florence) নামক ইতিহাসগ্রন্থ, দি আর্ট অফ ওয়ার (The Art of War) নামক সামরিক বিষয়সংক্রান্ত গ্রন্থ, ডিসকোর্সেস অন লিভি (Discourses on Livy) বা লিভির রোমের ইতিহাসের ওপর তাঁর মন্তব্যসহ গ্রন্থ, দি প্রিন্স (The Prince) বা তাঁর রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থ ইত্যাদি রচনা করেন। তৎকালীন রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতের ভিত্তিতে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ ইতিহাস নির্ভর ও বাস্তবধর্মী এই গ্রন্থগুলি রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শৈশব ও যৌবনে ম্যাকিয়াভেলি প্রত্যক্ষ করেছেন এক সফল ও সমৃদ্ধ ইটালি। লরেঞ্জো দ্য মেদিচির শাসনে ফ্লোরেন্স মধ্যযুগীয় বর্বরতার বাধা কাটিয়ে ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল। ইটালির অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের কিছুটা একীকরণ করে সমগ্র ইটালিকে ফ্লোরেন্স, ভেনিস, মিলনে, নেপল্‌স ও রোমান ক্যাথলিক এলাকা---এই পাঁচটি নগররাষ্ট্রে বিভক্ত করা হয় এবং লরেঞ্জোর উদ্যোগে এদের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কূটনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে ফ্লোরেন্স ছিল উন্নতির শীর্ষে। ১৪৯২ সালে মেদিচির মৃত্যুর পর ফ্লোরেন্সের রাজনৈতিক ভাগ্য অবনতির দিকে যেতে থাকে। শুরু হয় স্যাভানারোলার শাসন। তিনি ফ্লোরেন্সবাসীদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিলেন না। তাঁর আমলে রাজা অষ্টম চার্লস, দ্বাদশ লুই এবং অ্যারাগণ ফার্ডিনান্ডের সঙ্গে ফ্লোরেন্সের বিবাদ এবং পাঁচটি নগররাষ্টের পারস্পরিক বিবাদে ইটালির ঐক্য ও স্বাধীনতা ক্রমেই বিপন্ন হতে থাকে। সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বাতাবরণ ইটালিকে দুর্বল করে দেয়। ১৪৯৭-এ স্যাভানারোলার শাসন শেষ হয় এবং ফ্লোরেন্সের প্রজাতন্ত্রের অধীনে ১৪৯৮ সালে ম্যাকিয়াভেলি সরকারী চাকরী লাভ করেন।

ম্যাকিয়াভেলি সরকারী কর্মচারী হিসেবে ইটালি তথা ফ্লোরেন্সের লুপ্ত গৌরির উদ্ধারে মন দেন। তিনি ইটালির অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিতে এবং ফ্রান্স, স্পেন ও জার্মান সরকারের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন দ্বারা শান্তিপ্রচেষ্টায় উদ্যোগী হন। বাস্তব দৃষ্টিতে গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তির সাহায্যে সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিচার করে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে তিনি কর্তব্য সম্পাদন করেন। তবে ইটালির অন্যান্য অঞ্চলের থেকে ফ্লোরেন্সের প্রতি তাঁর আনুগত্য বেশি ছিল। তাঁর কাজে অবশ্য তিনি সফলও হতে পারেন নি।

১৫২২ সালে ইটালিতে রাজনৈতিক পরিবর্তন সূচিত হয়। ম্যাকিয়াভেলি সরকারী কাজ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। নতুন সরকার তাঁকে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে কারারুদ্ধ করে। পরে অবশ্য তিনি অভিযোগ থেকে মুক্তি পান। সরকারী দায়িত্ব থেকে সরে আসার পর তিনি রাজনীতিকে আরও গভীরভাবে অনুধাবন করার সুযোগ পান এবং তাঁর বিখ্যাত পুস্তকগুলি রচনা করেন। সরকারী কাজ থেকে তাঁর নির্বাসন রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে আশীর্বাদস্বরূপ হয়েছে।

ম্যাকিয়াভেলি তাঁর বিভিন্ন লেখায় ষোড়শ শতকের প্রথম দিকের ইটালির একজন মানুষ হিসেবে প্রতিভাত হন। সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তাঁর সময়ের রেনেসাঁস বা নবজাগরণের পরিবেশেই তাঁর চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটেছে। তাঁকে তাই নবজাগরণের রাষ্ট্রতাত্ত্বিক বলা হয়।

প্রথমত, সমঝোতা (conciliar) আন্দোলনের সীমাবদ্ধ সরকার বা সীমাবদ্ধ চার্চের তত্ত্বের বদলে ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে ইটালিতে নবজাগরণের প্রভাবে কেন্দ্রীকরণ ও রাজতন্ত্রের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। পোপ যে সময় কাউন্সিলকে অগ্রাহ্য করে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে থাকেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রে চরম রাজতন্ত্র দেখা যায়—ইংলণ্ডে হেনরী VII, ফ্রান্সে লুই XI, চার্লস VIII ও লুই XII এবং স্পেনে

ফার্ডিনাণ্ড। জার্মানীতেও ম্যাক্সমিলান ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় উভয় জগতেই শক্তিশালী মানুষ দ্বারা ক্ষমতা প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দ্বারা ম্যাকিয়াভেলি প্রভাবিত হন।

দ্বিতীয়ত, এই সময়ে রাজনৈতিক সংগঠনে রাজতন্ত্রের সঙ্গে জাতীয় ভাবধারার সংমিশ্রণ ঘটে। ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান, ইতালীয় বা স্পেনীয়—এই পার্থক্য রাজনৈতিক গুরুত্ব লাভ করে। মধ্যযুগীয় খৃষ্টান ইউরোপের ঐক্য ও সাম্রাজ্যের ধারণা গুরুত্বহীন হয়ে দাঁড়ায়। ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের মত ইটালিতে শক্তিশালী রাজার অধীনে ঐক্যবদ্ধ ইটালি গড়ে না ওঠায় ইটালির রাষ্ট্রগুলি দুর্বল ছিল। ম্যাকিয়াভেলি দেশপ্রেমিক হিসাবে ঐক্যবদ্ধ ইটালি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তাঁর লেখনী ধারণ করেন। তিনি বুঝেছিলেন যে কলহপ্রিয় ও বিভক্ত ইটালির জনগণের জন্য রাজতন্ত্রই অভিপ্রেত। জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণা ম্যাকিয়াভেলিই প্রথম প্রচার করেন।

তৃতীয়ত, ম্যাকিয়াভেলি মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা বর্জন করে অতীতের চিন্তার প্রতি মনোযোগী হয়েছিলেন। এই সময় ইটালিতে নবজাগরণের প্রভাবে শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম ও বৌদ্ধিক জগৎ—সর্বত্র মধ্যযুগীয় স্থাবরতা থেকে মুক্ত স্বাধীন চিন্তা ও কর্মের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং এজন্য অতীত গ্রীক ও রোমের ঐতিহ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। ম্যাকিয়াভেলিও গ্রীক ও রোমের প্রাচীন ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট ছিলেন। নতুন সমাজে প্রাচীনত্বকে ফিরিয়ে আনার এই প্রবণতা ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য ও নবজাগরণের প্রভাব।

চতুর্থত, নবজাগরণের নতুন মূল্যবোধ তাঁর লেখায় প্রকাশিত হয়েছে। ব্যক্তিমানুষের নৈতিকতাকে বর্জন করে, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে নৈতিক নিয়ম বাতিল করে, পাপপুণ্যের নৈতিক প্রশ্নকে অগ্রাহ্য করে তিনি চিত্রিত করেন এক নতুন রাজনৈতিক মানসিকতা—সমৃদ্ধি, খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠাই সেখানে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। এজন্য প্রয়োজন শক্তি বা ক্ষমতা। বস্তুত, রাজনীতিকে তিনি ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম বলে অভিহিত করেছেন। তিনি ভাগ্যের বদলে পুরুষকার, নম্রতার বদলে উগ্রতা এবং আত্মসমর্পণের বদলে আত্মবিশ্বাসের জয়গান করেছেন।

পঞ্চমত, নবজাগরণের আলোয় আলোকিত ম্যাকিয়াভেলি পূর্ব নির্ধারিত বলে কিছু গ্রহণ করেননি। দার্শনিক অতীন্দ্রিয়তা বা ধর্মীয় গোঁড়ামিও তাঁর চিন্তাধারায় স্থান পায়নি। ইতিহাসের অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে পর্যবেক্ষণের সাহায্যে বাস্তব তথ্য ও যুক্তিসহ আলোচনা করে তাঁর তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন।

ষষ্ঠত, তিনি ঈশ্বরের বদলে মানুষকে তাঁর চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসেন। দেবতার কথা নয়, মানুষের সমস্যা ও তার কীর্তিই স্থান পেল তাঁর তত্ত্বে। মানুষ যেমন, ঠিক তেমনভাবে তিনি তাকে দেখেন, যেমন হওয়া উচিত সেভাবে নয়।

সপ্তমত, তিনি ধর্মকে রাজনীতি থেকে বর্জন করেন এবং নৈতিকতাকে রাজনীতির অনুবর্তী করেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্রের ধর্ম ও নৈতিকতা হল সাফল্য, শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা, জনগণের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা এবং জাতীয় ঐক্য বজায় রাখা। এজন্য রাষ্ট্রের দ্বারা যে কোন অনৈতিক উপায় অবলম্বনকেও তিনি সমর্থন করেছেন।

অষ্টমত, সক্রেটিস, প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের সময় থেকে ম্যাকিয়াভেলির আগে পর্যন্ত রাষ্ট্রচিন্তা অস্পষ্ট ও ভাববাদ ভিত্তিক ছিল। আধুনিক কালের পাশ্চাত্য দর্শন, যার উদ্দেশ্য হল বাস্তব পরিস্থিতি ও কার্যকারিতার দিকে তাকিয়ে রাষ্ট্রকাঠামো নির্মাণ—তার শুরু হয় ম্যাকিয়াভেলি থেকে। তাই নবজাগরণের সন্তান ম্যাকিয়াভেলি আধুনিকতার অগ্রদূত বা আধুনিক রাষ্ট্রতাত্ত্বিকের মর্যাদায় ভূষিত।

অনুশীলনী— ২

১। ম্যাকিয়াভেলির সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখুন।
(আপনার উত্তর ২০ পংক্তির মধ্যে সীমিত রাখুন।)

২। ম্যাকিয়াভেলি তাঁর সমসাময়িক পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হন'—এ প্রসঙ্গে তিনটি উদাহরণ দিন।
(আপনার উত্তর ১৫ পংক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ হবে)

৩। ম্যাকিয়াভেলি কি নবজাগরণের রাষ্ট্রতাত্ত্বিক? যুক্তিসহ লিখুন।
(আপনার উত্তর ২৫ পংক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ হবে।)

৫৩.৪ ম্যাকিয়াভেলির রাজনৈতিক ধারণা

ম্যাকিয়াভেলি কোন পূর্ণাঙ্গ দার্শনিক তত্ত্বের ভিত্তিতে রাজনীতি আলোচনা করেননি। প্লেটোর মত দর্শনতত্ত্বের পথ ধরে রাজনীতি আলোচনার বদলে অভিজ্ঞতার আলোকে রাজনীতি চর্চাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। তিনি রাজনৈতিক ঘটনাবলী যেমনভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন সেইভাবে সোজা সরল ভাষায় উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর লেখায় তাই সুবিন্যস্ত চিন্তাধারা নয়, বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারা প্রকাশিত হয়েছে। এজন্য অনেকে তাঁকে রাজনৈতিক চিন্তাবিদ (political thinker) আখ্যা না দিয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষক (political analyst) আখ্যা দেন।

তাঁর 'The Prince' এবং 'Discourse on Livy' বইদুটিতে তাঁর রাজনৈতিক ধারণা বিধৃত হয়েছে। 'The Prince'-এ রাজতন্ত্রের ছত্রছায়ায় ইটালির ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ আক্রমণাত্মক ও উত্তেজক ভাষায় লিখিত। আর 'Discourse'-এ রাষ্ট্রীয় সংগঠনের বিভিন্ন দিক ও রোমান প্রজাতন্ত্রের প্রতি তাঁর অনুরাগ শান্ত ও সংযত ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও উভয়ের বক্তব্য এক —রাষ্ট্রের উত্থানপতন এবং রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার সুনিশ্চিতকরণ। 'The Prince'-এ তিনি একজন দেশভক্ত নাগরিক, একজন প্রতিভাবান পণ্ডিত এবং একজন অনুগত প্রশাসনের দৃষ্টিতে ইটালিকে তার বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য রাজার প্রতি একজন উপদেষ্টার মত কিছু উপদেশ সন্নিবিষ্ট করেছেন। কিন্তু 'Discourse'-এ তিনি গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে রাষ্ট্রীয় শাসনের বিভিন্ন দিক ও রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠনের প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। 'The Prince'-এ ইটালির বিশেষ, অবস্থায় বিশৃঙ্খলামুক্তি আর 'Discourse'-এ তাঁর পরিণত রাজনৈতিক চিন্তা দেখা যায়।

উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। অবশ্য অনেকে মনে করেন যে 'The Prince' গ্রন্থটি বিশেষ, রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা দ্বারা পরিচালিত। মেদিচি পরিবারে চাকরী পাওয়ার বাসনায় গ্রন্থটি লিখিত হয়েছে।

ম্যাকিয়াভেলির অনুধাবন পদ্ধতির দুটি দিক দেখা যায়—

(১) নেতিবাচক—তিনি ঐশ্বরিক আইনতত্ত্বকে অস্বীকার করেন। অতিপ্রাকৃত শক্তি দ্বারা মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত এই মত তিনি গ্রহণ করেননি।

(২) ইতিবাচক—আরোহ প্রণালী, অভিজ্ঞতাভিত্তিক (empirical) ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর লেখায় অনুসৃত হয়েছে। পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে সাধারণ জ্ঞানে পৌঁছনো এবং তার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোকপাত হল তাঁর বৈশিষ্ট্য।

ম্যাকিয়াভেলি তাঁর বিভিন্ন লেখার মধ্য দিয়ে মানবপ্রকৃতি, নতুন ধরনের ধর্ম ও নৈতিকতা, ক্ষমতা, সর্বশক্তিমান আইনপ্রণেতা, রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা, ঐতিহাসিক ও আরোহ পদ্ধতি, অভিজ্ঞতা ও তথ্যের ওপর নির্ভর করে তিনি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সূচনা করেন। তাই তিনি আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এবং একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী।

তাঁর বিভিন্ন রাজনৈতিক ধারণার পরিচয় এবার দেওয়া যাক।

৫৩.৪.১ মানবপ্রকৃতি

ম্যাকিয়াভেলির রাষ্ট্রচিন্তার কেন্দ্রে অবস্থান করে মানুষ, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও মনস্তত্ত্ব। মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর চিত্র হতাশাজনক। তিনি মানুষের মধ্যে দেবতার সন্ধান পাননি। বরং তাঁর মতে, মানুষ স্বার্থপর, লোভী, অকৃতজ্ঞ এবং ঈর্ষাপরায়ণ। সে ক্ষমতা, খ্যাতি, বস্তুগত সম্পত্তি ও সাফল্যের পিছনে দৌড়তে ভালবাসে। নিজের উন্নতির জন্য সে ন্যায়-অন্যায় ধর্ম-অধর্ম বিবেচনারহিত। সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা ও ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য সে ভালমন্দ যে কোন উপায়ে সম্পত্তি ও ক্ষমতা বা খ্যাতিলাভের জন্য ব্যাকুল। এগুলি অধিকতর পরিমাণে পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা থেকে দেখা দেয় বিবাদ, সংঘর্ষ, বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা।

তৎকালীন ইটালির রাজনৈতিক অবস্থা ও বাস্তবতার তাগিদেই তিনি মানুষের এই ভয়াবহ, জঘন্য ও পাশবিক চিত্র আঁকেন। তাছাড়াও এই সময়ে বুর্জোয়াদের অর্থনৈতিক বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যযুগীয় ভীরু মানুষের বদলে বাধা অতিক্রমকারী, সাহসী ও আত্মনির্ভরশীল মানুষের প্রয়োজন হয়। এই মানুষ ভাগ্যের কাছে নতিস্বীকার করে না, বরং ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করে জয় ছিনিয়ে নিতে চায়। এই মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য নির্মাণ করে। বৈরাগ্য, বিনয়, নম্রতা ইত্যাদি ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ নয়, সাহস, আত্মবিশ্বাস ও পুরুষকারই মানুষকে জয়ের মুখোমুখি নিয়ে যায়।

ম্যাকিয়াভেলি বিশ্বাস করতেন যে সরকারের প্রকৃতি নির্ভর করে মানুষের প্রকৃতির ওপর। তাই তিনি বলেছেন যে মানুষের স্বার্থপর ও পাশবিক প্রবৃত্তির মোকাবিলা করে সমাজে উৎকৃষ্ট আইন ও শক্তিশালী শাসকের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। তিনি আরও বলেছেন যে মানুষের দুষ্ট চরিত্র নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন যথেষ্ট নয়, আইনের সঙ্গে প্রয়োজন শক্তিশালী শাসকের পাশবিক শক্তি, ভীতি প্রদর্শন ও ছলচাতুরী। তাই শাসক ও রাজা শুধু আইন নির্দিষ্ট পথ নয়, বলপ্রয়োগ, ভীতি সঞ্চার ও কূটনীতির মাধ্যমে শাসন করবেন এবং ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করবেন।

ম্যাকিয়াভেলির মানব প্রকৃতি সংক্রান্ত ধারণা কল্পনাশ্রয়ী বা ভাববাদভিত্তিক নয়। তাঁর অঙ্কিত মানুষ নৈতিক উন্নতি বা উচ্চ আধিভৌতিকতার আদর্শে বিশ্বাসী নয়, ঐশ্বরিক আইন বা প্রাকৃতিক আইনের অনুগামী নয়, ধর্ম বা নৈতিকতা দ্বারা চালিত নয়। কঠোর বাস্তববাদী বুর্জোয়া জীবনদর্শনের আলোয় তাঁর মানুষের প্রকৃতি সংক্রান্ত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এই চিত্র রাজনৈতিক মানুষ (political man)-এর চিত্র। তিনিই প্রথম রাজনৈতিক মানুষের ধারণার সৃষ্টি করেন।

৫৩.৪.২ ধর্ম ও নৈতিকতা

ধর্ম ও নৈতিকতার প্রশ্নে ম্যাকিয়াভেলির দর্শন হল সম্পূর্ণ নতুন দর্শন। তিনিই প্রথম রাষ্ট্রচিন্তাবিদ যিনি ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র থেকে রাজনীতির আনুষ্ঠানিক ও সচেতন পৃথকীকরণ দ্বারা ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির সূচনা করেন। তাঁর আগে অ্যারিস্টটল ও ম্যার্সিলিও অফ পডুয়া ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাভাবনার সূত্রপাত করলেও তাঁরা একাজে পুরোপুরি সফল হননি। ম্যাকিয়াভেলি প্রথম ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে রাজনীতির পাকাপাকি বিচ্ছেদ ঘটিয়ে আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্বের জনক বলে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি প্লেটো, অ্যারিস্টটল ইত্যাদি পূর্বসুরীদের রাষ্ট্রের নৈতিক উদ্দেশ্য সংক্রান্ত বক্তব্যকে নস্যাৎ করে দেন।

ম্যাকিয়াভেলি মনে করতেন যে গীর্জা রাষ্ট্রের ঐক্যের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। গীর্জা প্রচারিত ধর্মীয় মূল্যবোধ—যেমন বিনয়, অপার্থিবতা বা আত্মসমর্পণ—মানুষের সাফল্যের ক্ষেত্রে বিঘ্নকারী। তাই তিনি ধর্মবর্জিত রাজনীতির কথা বলেন। তাছাড়াও ঘোষণা করেন যে ব্যক্তিগত নৈতিকতা, যেমন দয়া, মায়া ইত্যাদি ব্যক্তিজীবনে আচরণীয় হলেও রাষ্ট্রের কাছে এগুলি মূল্যহীন। তাঁর মতে রাষ্ট্রের নৈতিকতা হল সাফল্যের নৈতিকতা। রাজা যদি নীতিশাস্ত্র ও ধর্মের পথ ধরে রাষ্ট্রকে অবনতির দিকে নিয়ে যান, তবে তা দেশের পক্ষে কখনই ভাল হবে না। ঐক্যের স্বার্থে রাজাকে কঠোর হাতে শাসন করতে হবে। জাতীয় ঐক্যের তাগিদ বা উদ্দেশ্যকে তিনি উদ্দেশ্য সাধনের উপায়ের থেকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য তাই শাসককে ন্যায় বা অন্যায় যে কোন উপায় অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছেন। প্রয়োজনে জালিয়াতি, ছলনা, প্রতারণা, কপটতা ও হিংসার মত অনৈতিক পথ গ্রহণকেও তিনি সমর্থন করেছেন। ম্যাকিয়াভেলির মতে, রাজা আইন ও পাশবিক শক্তি দুইয়ের ওপরই নির্ভর করবেন।

আইন সফল না হলে পাশবিক শক্তি, প্রয়োজনে দুয়েরই সাহায্যে, আবার ক্ষেত্র বিশেষে আইনকে বিসর্জন দিয়েও পাশবিক শক্তি অবলম্বন করে উদ্দেশ্যসাধন করবেন। রাজার মধ্যে তিনি সিংহের শক্তি ও শিয়ালের ধূর্ততার সমন্বয়ের কথা বলেছেন।

ম্যাকিয়াভেলির মতে রাজা সাধারণভাবে সৎ হবেন। কিন্তু জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন হলে অসৎ, মিথ্যাচারী ও বিশ্বাসভঙ্গকারী হতে দ্বিধা করবেন না এবং নিষ্ঠুরতম পথ নেবেন। রাজা বাস্তব বিবেচনা দ্বারা চালিত হবেন।

ধর্ম ও নৈতিকতাকে রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে বিসর্জিত করলেও ম্যাকিয়াভেলি ধর্ম ও নৈতিকতা বিরোধী ছিলেন না। তিনি রাজা বা শাসককে অধার্মিক ও নীতিবর্জিত হবার পরামর্শ দিলেও জনগণকে ধর্মীয় মনোভাবাপন্ন হতে বলেছেন। রাজা জাতীয় স্বার্থ ও ঐক্যরক্ষার জন্য নীতিহীন, অধার্মিক বা মিথ্যাচারী হতে পারেন। তিনি উদ্দেশ্য সাধনে সফল হলে প্রশংসিত হবেন। কিন্তু সাধারণ নাগরিকের নীতিহীন ও অধার্মিক হওয়া তিনি সমর্থন করেননি।

রাজা ও জনগণের জন্য নীতির এরূপ দ্বৈতমান কেন ? এর উত্তরে বলা যায় যে তিনি রাষ্ট্রচিন্তায় আধুনিকতার আমদানি করলেও মধ্যযুগীয় ভাবধারা থেকে পুরোপুরি মুক্ত ছিলেন না। রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য জনগণের মনে কিছুটা ধর্ম ও নীতিবোধ থাকা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করতেন। রাষ্ট্রীয় আইনের প্রতি জনগণের আনুগত্য অর্জন করার জন্যও ধর্মের প্রয়োজনীতা তিনি স্বীকার করেছেন। কিন্তু রাজা যদি ধর্ম ও নীতিবোধ নিয়ে চলেন তাহলে জাতীয় ঐক্য বিঘ্নিত হবে। রাজা ও জনগণের লক্ষ্য আলাদা। তাই তাঁর মতে ধর্ম ও নীতির দ্বৈতমানের প্রয়োজন।

তবে নীতি ও ধর্মের কিছু প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেও রাষ্ট্রের ওপর তিনি তাদের স্থাপন করেননি। ধর্ম ও নীতিকে রাষ্ট্রের প্রধান পরিচালক শক্তি হিসাবেও মেনে নেননি। ধর্ম ও নীতি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। রাষ্ট্রীয় শাসনকাজে তাদের কোন গুরুত্ব নেই।

ম্যাকিয়াভেলিকে অনেকে খ্রীষ্টধর্ম বিরোধী ও নীতিহীনতার সমর্থক মনে করেন। কিন্তু তা ঠিক নয়। তাঁর মতবাদ অভিজ্ঞতার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁর সময়ের ইটালিতে রাজনৈতিক ঐক্য বলে কিছু ছিল না। স্পেন, জার্মানি ও ফ্রান্সের দ্বারা প্রায়ই আক্রান্ত হত। তিনি ইটালির দুর্বলতার জন্য গীর্জাকে দায়ী করেন। গীর্জা মানুষকে কর্মবিমুখ করে তুলেছিল। তাই তিনি রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মের কোন গুরুত্ব মানেন নি। ম্যাকিয়াভেলির মতে রাষ্ট্রের কোন নীতিশাস্ত্রও নেই। রাষ্ট্রের ভূমিকা হবে নিরপেক্ষ—রাষ্ট্রের স্বার্থে নীতিযুক্ত বা নীতিহীন, ধর্মীয় বা অধার্মিক—যে পথ উপযুক্ত সেই পথ ধরে চলা। ধর্ম ও নৈতিকতাকে তিনি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের অধীনস্থ করেছেন। তিনি অধার্মিক বা নীতিহীন নন, রাজনীতিতে ধর্ম-বিরোধী ও নীতি বিরোধী।

৫৩.৪.৩ রাষ্ট্র

রাষ্ট্র সম্পর্কে কোন সাধারণ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা না করলেও রাষ্ট্র সম্পর্কে ম্যাকিয়াভেলির উপলব্ধি ছিল। তিনি তাঁর সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃত রাষ্ট্রের চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি মনে করতেন সমাজের রাজনৈতিক সাংগঠনিক প্রয়োজন রাষ্ট্রের মাধ্যমে মূর্ত হয়ে ওঠে। পোপের শাসনে তাঁর সময়ের ইটালির ঐক্য ও সংহতি বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় এবং কেন্দ্রীয় ঐক্যবদ্ধ শক্তির অভাবে বিদেশীদের দ্বারা ইটালি বারবার আক্রান্ত হওয়ায় ইটালির রাজনৈতিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে দেখে তিনি ব্যথিত হন। প্রকৃত দেশপ্রেমিকের মত ইটালির জন্য একটি শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়, তার সুপারিশ করেন। তিনি ইটালির জন্য একটি ক্ষমতাশালী ও সম্প্রসারণশীল রাষ্ট্র রেখেছিলেন। তবে রাষ্ট্র সম্পর্কিত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী বা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নয়, তিনি চিন্তা করেছেন রাষ্ট্রশাসন সম্বন্ধে। তাঁর রাষ্ট্রশাসনের ধারণা শাসকের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আলোচিত হয়েছে। রাষ্ট্রশাসন প্রসঙ্গে এসেছে রাজনৈতিক ক্ষমতার ধারণা।

আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্বের মৌলিক প্রশ্ন, যেমন রাষ্ট্রের উদ্ভব ও প্রকৃতি, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের সীমা, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও ব্যক্তি স্বাধীনতার সমন্বয় ইত্যাদি বিষয় তিনি আলোচনা করেননি। রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জনের উপায়, রাষ্ট্রক্ষমতার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের পদ্ধতি। রাষ্ট্রক্ষমতা প্রয়োগের নীতি এবং রাষ্ট্রশাসনের বিভিন্ন রূপের মধ্যেই তাঁর আলোচনা সীমিত ছিল।

ম্যাকিয়াভেলির রাষ্ট্রসংক্রান্ত ধারণাকে নিম্নোক্ত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়—

(১) মানুষ রাষ্ট্রকে নয়, নিজেকে ভালবাসে। কিন্তু নিরাপত্তার আকাঙ্খার জন্যই রাষ্ট্রকে মেনে নেয় ও আনুগত্য দেখায়।

(২) রাষ্ট্র একটি শ্রেষ্ঠ সংগঠন, যার কাছে প্রজারা পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করে।

(৩) রাষ্ট্র হল ধর্ম ও নীতিনিরপেক্ষ। ধর্মপ্রতিষ্ঠান, চার্চ, ঈশ্বর বা নৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গে রাষ্ট্রের কোন সম্পর্ক নেই।

(৪) রাষ্ট্র একটি সম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র সংস্থা, যার নীতি প্রজাদের নীতি থেকে আলাদা।

(৫) রাষ্ট্র হল একটি ক্ষমতা প্রয়োগের যন্ত্র। ক্ষমতা প্রয়োগ দ্বারা রাষ্ট্র স্বার্থপর, লোভী ও আত্মকেন্দ্রিক মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও ঐক্য রক্ষা করে এবং সমাজের সংরক্ষণ করে।

(৬) শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও সমাজ সংরক্ষণ ছাড়াও রাষ্ট্রের আদর্শ হল সম্প্রসারণ—অন্য রাষ্ট্রের সীমা অতিক্রম করে যে কোন উপায়ে নিজ রাষ্ট্রের সীমানাবৃদ্ধি।

(৭) রাষ্ট্রের ও রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর শক্তি নির্ভর করে জনগণের দেশপ্রেম ও উৎসাহের ওপর।

(৮) রাষ্ট্রের সরকার নৈতিক বা অনৈতিক, যে পথেই চলুক না কেন, তাকে জনপ্রিয়তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়।

(৯) দুর্বল রাষ্ট্রের জনগণকে রাজার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন। কিন্তু শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রের জনগণ প্রশাসনিক কাজে অংশ নিতে পারে।

ম্যাকিয়াভেলির রাষ্ট্র সংক্রান্ত ধারণা অ্যারিস্টটলের তুলনায় সংকীর্ণ ছিল। অ্যারিস্টটলের মতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হল জনকল্যাণ আর ম্যাকিয়াভেলির মতে বস্তুগত সাফল্যই হল রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। অ্যারিস্টটলের রাষ্ট্রের আদর্শ ছিল স্থায়ী শান্তি। কিন্তু ম্যাকিয়াভেলি সম্প্রসারণকে রাষ্ট্রের আদর্শ মনে করেন।

৫৩.৪.৪ ক্ষমতা

ম্যাকিয়াভেলির মতে রাষ্ট্রশাসনের মূল কথা হল ক্ষমতা। ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাই হল রাজনীতির লক্ষ্য। রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র উভয় ধরনের সরকারেই স্থায়িত্ব ও শৃঙ্খলার প্রশ্নটি জরুরী। আর ক্ষমতা-অর্জন হল স্থায়িত্ব ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার প্রথম শর্ত। ক্ষমতা-অর্জন ও ধরে রাখার উপায় নিয়ে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাঁকে তাই ক্ষমতাতত্ত্বের প্রথম প্রবক্তা বলা হয়।

ক্ষমতার দিকে লক্ষ রেখেই তিনি শাসকের কার্যপরিচালনার নীতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যে সব নীতি রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করে তিনি সেগুলি সমর্থন করেছেন। রাষ্ট্রক্ষমতার আলোচনা প্রসঙ্গে তাই শাসনকার্যে রাষ্ট্রের সাফল্য ও ব্যর্থতাই বিবেচ্য, সামাজিক, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় মূল্যবোধ নয়। তাঁর ক্ষমতাতত্ত্বে আইনের তুলনায় বলপ্রয়োগের গুরুত্ব বেশি। বলপ্রয়োগ দ্বারা যদি রাষ্ট্রের স্বার্থ ও ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তা অবশ্যই সমর্থনযোগ্য।

ক্ষমতা সংক্রান্ত তাঁর তত্ত্ব অভিনব। ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ধর্ম বা নৈতিকতার কোন মূল্য নেই। কপটতা, শঠতা ও ছলচাতুরী বা বলপ্রয়োগই প্রধান উপায়। অর্থাৎ ক্ষমতাকে তিনি কূটনীতির খেলা হিসেবে স্বীকার করেন।

৫৩.৪.৫ সর্বশক্তিমান আইনপ্রণেতা

ম্যাকিয়াভেলির মতে, শাসনকার্যের প্রবহমানতা বজায় রাখার জন্য একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ আইনজ্ঞ প্রয়োজন। তাঁর প্রণীত আইনের গুণগত উৎকর্ষের ওপরই রাষ্ট্রের পরিচালনা ও জনগণের চরিত্র নির্ভর করে। তিনি বলেছেন যে একজন মাত্র ব্যক্তি আইনের সাহায্যে রাষ্ট্র ও সমাজের চেহারা পুরোপুরি বদলে দিতে পারে। তাই তিনি সর্বশক্তিমান আইন প্রণেতার ধারণা প্রতিষ্ঠিত করেন। বিজ্ঞ আইনপ্রণেতা আইন দ্বারা নাগরিকদের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করেন এবং নাগরিকদের মধ্যে পৌর ও

নৈতিক গুণাবলী সঞ্চার করেন। ফলে জাতীয় চরিত্র সবল হয়। তিনি বলেছেন যে সমাজে দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে সমাজ আইনজ্ঞের সাহায্য ছাড়া সংশোধিত হতে পারে না। আইনজ্ঞ নতুন সমাজের উপযোগী নতুন আইন সৃষ্টি করে সমাজের রাজনৈতিক কাঠামো এবং সামাজিক ও নৈতিক পরিবেশ নতুনভাবে নির্মাণ করেন। তিনি পুরোনো ব্যবস্থা বদলে নতুন ব্যবস্থা চালু করতে পারেন, সরকারের রূপ বদলাতে পারেন, নাগরিকদের মধ্যে নতুন নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সঞ্চার করতে পারেন। তাই ম্যাকিয়াভেলি মনে করেন যে আইন দ্বারাই নৈতিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়, নীতির দ্বারা আইন নয়।

ম্যাকিয়াভেলি আশা করতেন যে একজন শাসক বিজ্ঞ আইনজ্ঞের দৃষ্টি অবলম্বন করে সংকট থেকে ইটালিকে ত্রাণ করবেন। তৎকালীন ইটালির শাসকগোষ্ঠী যে ইটালির ঐক্যসাধনে সক্ষম নয়, একথাও তিনি বিশ্বাস করতেন। একজন শাসক ও আইনজ্ঞ যে তাঁর রচিত আইন দ্বারা ইটালির জনগণকে জাতীয় চেতনা ও আনুগত্যের বোধে উদ্দীপ্ত করবেন, এই ছিল তাঁর প্রত্যাশা।

৫৩.৪.৬ রাষ্ট্রশাসনের বিভিন্ন রূপ

অ্যারিস্টটলের অনুসরণ ম্যাকিয়াভেলি ভালো তিনটি এবং মন্দ তিনটি—রাষ্ট্রশাসনের মোট ছয়টি রূপ নির্দেশ করেছেন। ভালো রাষ্ট্রে নাগরিকরা বিশ্বস্ত অনুগত ও আইনমান্যকারী, মন্দ রাষ্ট্রে নয়। রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্র হ'ল একজনের শাসন, কয়েকজনের শাসন ও বহুজনের শাসনের ভালো রূপ। আর স্বৈরতন্ত্র, গোষ্ঠীতন্ত্র ও জনতাতন্ত্র হল যথাক্রমে ওই তিনটির বিকৃত রূপ। শাসকের অধঃপতন ও উৎপীড়ন রাজতন্ত্রকে স্বৈরতন্ত্রে রূপান্তরিত করে। অভিজাততন্ত্র যখন কিছু লোকের স্বার্থবাহী শাসনে পরিণত হয় তখন তা হয় গোষ্ঠীতন্ত্র। গণতন্ত্র যখন সাধারণের স্বার্থবিরোধী হয়ে দাঁড়ায় তখন তা জনতাতন্ত্রে পরিণত হয়।

ম্যাকিয়াভেলি বিস্তৃতভাবে দুটি শাসন সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন—রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র। 'দি প্রিন্স' গ্রন্থে রাজতন্ত্র এবং 'ডিসকোর্সেস' গ্রন্থে প্রজাতন্ত্রের আলোচনা আছে। তিনি কোন বিশেষ রূপের শাসনের অন্ধ সমর্থক ছিলেন না। কোন শাসনেকেই তিনি সব পরিস্থিতিতে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন না, তাঁর মতে বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ধরনের সরকারের প্রয়োজন। তিনি কখনও প্রজাতন্ত্র, কখনও রাজতন্ত্রকে কাম্য বলেছেন। অবশ্য দুয়ের মধ্যে প্রজাতন্ত্রকেই শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। প্রজাতন্ত্র হল সুস্থ, মুক্ত ও শক্তিশালী রাষ্ট্র। নাগরিকরা এখানে বিচক্ষণ, পরিণামদর্শী ও অনুগত হয়। উদাহরণ হল রোমের প্রজাতন্ত্র। প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সকল অংশই কোন রকম নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই তাদের কাজ সম্পাদন করে।

ম্যাকিয়াভেলির মতে অসুস্থ ও অমুক্ত রাষ্ট্রে রাজতন্ত্র প্রয়োজন। এখানে নাগরিকরা বিশ্বাসভঙ্গকারী

ও পাপাচারী হয়। এই জাতীয় রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশগুলি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না। তাই রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়।

প্রজাতন্ত্রের সমর্থক হয়েও তিনি নিজের দেশ ইটালিতে রাজতন্ত্র সমর্থন করেন। কারণ তাঁর মতে, ঐক্যহীন দুর্বল ইটালিতে ঐক্য ফিরিয়ে আনার জন্য স্বৈরাচারী ও শক্তিশালী শাসক বা রাজার প্রয়োজন ছিল, যিনি ন্যায়-অন্যায় বোধ দ্বারা পরিচালিত হবেন না এবং জাতির স্বার্থ ও সংহতির জন্য নিষ্ঠুর, কপট ও অধার্মিক পথ অবলম্বন করতেও দ্বিধা করবেন না। ইটালির সুখ-সমৃদ্ধির জন্য তিনি স্বেচ্ছাচার ও রাজতন্ত্রের কথা বলেছেন ঠিকই, কিন্তু এর পিছনে আছে তাঁর দেশপ্রেম ও জাতির প্রতি ভালোবাসা।

৫৩.৪.৭ রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র

ম্যাকিয়াভেলির মতে, রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র উভয় শাসনেই রাষ্ট্রের সংরক্ষণ ও রাষ্ট্রীয় এলাকাকে বিস্তৃত করে শাসন ক্ষমতার পরিধি বাড়ানো প্রয়োজন। রাজতন্ত্র প্রসঙ্গে তিনি ফরাসী ও স্পেনীয় রাজতন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্র প্রসঙ্গে রোমান প্রজাতন্ত্রের উদাহরণ দিয়েছেন।

ম্যাকিয়াভেলি বলেছেন যে রাজা যখন নিজ এলাকা ছেড়ে অন্যত্র আধিপত্য বিস্তারে মন দেন তখন তাঁকে সতর্কতার সঙ্গে চলতে হবে। কারণ অধিকৃত এলাকার অধিবাসীরা তাঁকে সহজে নাও মানতে পারে। ভাষাগত বা সংস্কৃতিগত পার্থক্য থাকলে সমস্যা আরও বেশি হবে। তাই শাসককে অধিকৃত রাজ্যে উপস্থিত থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। নতুবা অধিকৃত রাজ্যে নিজ রাজ্যের একদল অধিবাসীকে পাঠিয়ে স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তা ছাড়াও তিনি সেখানে একদল ক্ষুদ্র শাসকগোষ্ঠী সৃষ্টি করে তাঁদের মাধ্যমে তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

নতুন রাজ্য দখল ও সেখানে অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভাগ্যের সহায় বা যোগ্যতার সঙ্গে সুযোগের সদ্ব্যবহার—দুয়ের উপস্থিতি দেখা যায়। রাজার শারীরিক, মানসিক, নৈতিক শক্তি, বুদ্ধি, সাহস, বীরত্ব ইত্যাদি রাজার যোগ্যতার পরিচায়ক। ম্যাকিয়াভেলির মতে, যিনি ভাগ্যের ওপর নির্ভর না করে যোগ্যতার দ্বারা চালিত হন তিনিই সফল রাজা। উদাহরণ হিসাবে তিনি যোহেস, সাইরাস, রমুলাস ইত্যাদির নাম করেছেন। অন্যদিকে সিজার বর্গিয়ার মত ভাগ্য নির্ভর রাজা যে বেশিদিন ক্ষমতায় থাকতে পারেন নি, সে কথাও বলেছেন।

ম্যাকিয়াভেলি রাজার সাফল্যের জন্য তিনটি পথের কথা বলেছেন ঃ—

(১) বলপ্রয়োগ দ্বারা নিজের বীরত্ব প্রদর্শন করে এবং কঠোর, নিষ্ঠুর ও নির্দয়ভাবে ভীতির সঞ্চার করে;

(২) ছলচাতুরী বা অন্যায় কাজের সাহায্যে;

(৩) নাগরিকদের সাহায্য ও সমর্থক নিয়ে এবং নাগরিকদের ভালবাসা আদায় করে।

রাজ্য সুরক্ষিত রাখা ও সম্প্রসারণের জন্য, ম্যাকিয়াভেলির মতে, রাজাকে শাসনকৌশল, প্রশাসনিক গুণ, যুদ্ধকৌশল ও ব্যক্তিগত আচরণ বিধির মাধ্যমে জনমানসে নিজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল রাখতে হবে। নাগরিকদের মধ্য থেকে সেনা সংগ্রহ করে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে হবে। রাজার যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হওয়া প্রয়োজন। রাজাকে ভৌগলিক পরিস্থিতি এবং ইতিহাসে বিখ্যাত ব্যক্তিদের যুদ্ধকৌশল সম্বন্ধে জানতে হবে। রাজা সৎগুণাবলী দ্বারা পরিচালিত হলে তা অবশ্যই ম্যাকিয়াভেলি সমর্থন করেন। কিন্তু প্রয়োজনে রাজাকে অসৎ গুণাবলী, নিষ্ঠুরতা বা অধার্মিক মনোভাব নিয়েও চলতে বলেছেন। রাষ্ট্রের পক্ষে যে পথ ভাল, রাজা সেই পথে চলবেন। ভালমন্দ, আবেগ বা মূল্যবোধ দ্বারা তিনি কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হবেন না।

ম্যাকিয়াভেলি পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে সৎ ও অনুগত প্রজাদের ক্ষেত্রে রাজা সদাচারী হয়ে চলবেন এবং আইন দ্বারা শাসন করবেন। কিন্তু প্রজারা অকৃতজ্ঞ হলে বলপ্রয়োগ ও কপটতার আশ্রয় নেবেন। তবে প্রজারা তাঁকে ভয় করলেও ঘৃণা যেন না করেন, এ কথাও ম্যাকিয়াভেলি বলেছেন। এজন্য, তাঁর মতে, রাজা কপট নির্দয়, যাই হোক না কেন, তাঁকে ভাল সেজে থাকতে হবে।

প্রজাতন্ত্র যে রাজনৈতিক শাসনের অনুকূল, একথা তিনি মানতেন। প্রজাতন্ত্র, তাঁর মতে, দু-ধরনের —(১) সম্ভ্রান্তের প্রজাতন্ত্র, যেখানে সম্ভ্রান্তদের প্রভাব বেশি এবং (২) জনগণের প্রজাতন্ত্র, যেখানে সাধারণ মানুষের ওপর কর্তৃত্ব অর্পিত হয়েছে। দুয়ের মধ্যে দ্বিতীয়টিই তাঁর মতে স্বাধীনতা রক্ষার অনুকূল। তবে ম্যাকিয়াভেলি মনে করতেন যে রাজাই প্রজাতন্ত্রের সৃষ্টিকর্তা।

জরুরী অবস্থায় বা বিশৃঙ্খলাজনক পরিস্থিতিতে প্রজাতন্ত্রকে স্থগিত রেখে রাজা নিজের হাতে সাময়িকভাবে শাসনক্ষমতা তুলে নিতে পারেন, একথা ম্যাকিযাভেলি বলেছেন। এ প্রসঙ্গে রোমান প্রজাতন্ত্রে সাময়িকভাবে প্রজাতন্ত্র বন্ধ করে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদাহরণও দিয়েছেন।

তাঁর মতে, প্রজাতন্ত্রের পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে শাসকের ভূমিকা হবে রাজতন্ত্রের রাজার মত। তিনি কঠোর হাতে বিরোধীদের দমন করবেন এবং অন্যায় ও অবিচার থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষা করবেন। প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন হলে মন্দ ও অর্থনৈতিক পথও গ্রহণ করতে পারেন।

রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র, উভয় ব্যবস্থাতেই শাসনের পদ্ধতিকে ম্যাকিয়াভেলি সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের স্বার্থের কথা ভেবে বিচার করেছেন।

অনুশীলনী — ৩

১। মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে ম্যাকিয়াভেলির বক্তব্য আলোচনা করুন।
(আপনার উত্তর ১৫ পংক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ হবে।)

২। ধর্ম ও নৈতিকতা প্রসঙ্গে ম্যাকিয়াভেলি কী বলেছেন ?
(উত্তর ২০ পংক্তির মধ্যে সীমিত হবে।)

৩। রাষ্ট্র সম্বন্ধে ম্যাকিয়াভেলির বক্তব্য লিখুন।
(আপনার উত্তর ২০ পংক্তির মধ্যে সীমিত হবে।)

৪। ক্ষমতা সম্বন্ধে ম্যাকিয়াভেলি কী বলেছেন?
(উত্তর ১৫ পংক্তির মধ্যে হবে।)

৫। ম্যাকিয়াভেলির তত্ত্বে আইনপ্রণেতার ভূমিকা কী ?
(আপনার উত্তর ২০ পংক্তির মধ্যে লিখুন।)

৬। রাষ্ট্রশাসনের বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে ম্যাকিয়াভেলির বক্তব্য কী ?
(আপনার উত্তর ২০ পংক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ করুন।)

৭। রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র প্রসঙ্গে ম্যাকিয়াভেলি কী বলেছেন ?
(উত্তর ২০ পংক্তির মধ্যে হবে।)

৫৩.৫ মূল্যায়ন

অনেক অভিনবত্ব থাকার জন্য ম্যাকিয়াভেলির রাষ্ট্রচিন্তা একদিকে নিন্দিত, অন্যদিকে প্রশংসিত হয়েছে। রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে তিনি এক বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর চিন্তায় কিছু অসঙ্গতি ও অসম্পূর্ণতা যেমন আছে, রাষ্ট্রচিন্তায় তাঁর অবদানও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ।

সমালোচকরা ম্যাকিয়াভেলির রাষ্ট্রচিন্তার সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেনঃ-

(১) ম্যাকিয়াভেলি স্থানীয় ইটালির সমাজের আলোকে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। ইটালির মধ্যে আবার ফ্লোরেন্সের লুপ্ত গৌরব উদ্ধারই তাঁর লক্ষ্য ছিল। তাই তাঁর আলোচনা সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট।

(২) উদ্দেশ্য উপায়ক সমর্থন করে—ম্যাকিয়াভেলির এই নীতি অনেকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। তাঁদের মতে, তাঁর লেখা নীতি বর্জিত কাজকে অহেতুক উৎসাহ দেয়।

(৩) ম্যাকিয়াভেলি কোন যুক্তিসম্মত দার্শনিক কাঠামো নির্মাণ করেননি। তাই তাঁর আলোচনাকে অনেকে অগভীর মনে করেন।

(৪) ম্যাকিয়াভেলির মতে মানুষ স্বার্থপর। সেই স্বার্থপর মানুষ কিভাবে রাষ্ট্রগঠনের জন্য বা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য অন্যদের সঙ্গে সহযোগিতা করে বা করতে পারে, সে সম্বন্ধে সমালোচকরা সংশয় প্রকাশ করেন।

(৫) সমালোচকরা মনে করেন যে ম্যাকিয়াভেলি জনগণের ঐক্য ও রাষ্ট্রের স্বার্থে বলপ্রয়োগের ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

(৬) সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক জীবন গঠন প্রসঙ্গের, আইন প্রণেতাদের ভূমিকাকে অনেকে অতিরঞ্জিত মনে করেন।

(৭) রাজা ও প্রজার স্বার্থের ভিন্নতা ও দ্বৈত নৈতিক মান সম্বন্ধে অনেকে প্রশ্ন তোলেন।

(৮) সমালোচকরা মনে করেন যে রাজতন্ত্রের সুপারিশ ও প্রজাতন্ত্রের প্রশংসা—উভয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা যায়।

(৯) দুর্নীতিগ্রস্থ রাষ্ট্রের সংস্কার প্রসঙ্গে রাজার ভূমিকা সংক্রান্ত ম্যাকিয়াভেলির বক্তব্য অনেকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না।

কিছু অসঙ্গতি ও বিরোধিতা সত্ত্বেও ম্যাকিয়াভেলি রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে স্থায়ী আসনে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর রাষ্ট্রচিন্তায় অবদান প্রসঙ্গে বলা যায় ঃ-

(১) ম্যাকিয়াভেলি মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক ঐতিহ্যের সমাপ্তি ঘটান এবং রাজনীতির ভিত্তি হিসাবে ধর্মকে অগ্রাহ্য করেন এবং নৈতিকতাকেও বিসর্জন দেন।

(২) ম্যাকিয়াভেলি চার্চের প্রাধিকারকে উপেক্ষা করেন এবং চার্চকে রাষ্ট্রের অধীনে আনার কথা বলেন।

(৩) ম্যাকিয়াভেলি মানুষের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন এবং মানুষকে গুরুত্ব দিয়ে রাজনীতি ব্যাখ্যা করেন। আধিভৌতিকতা বা আধ্যাত্ম্যবাদ থেকে মুক্ত মানবিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটান।

(৪) ম্যাকিয়াভেলি অভিজ্ঞতা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে বাস্তবমুখী তথ্যভিত্তিক ও ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী রাষ্ট্রচিন্তার অবতারণা করেন।

(৫) ম্যাকিয়াভেলি ব্যক্তিগত নৈতিকতা ও রাষ্ট্রীয় নৈতিকতার মধ্যে পার্থক্য করেন এবং রাষ্ট্রীয় নৈতিকতার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নৈতিকতাকে মূল্যহীন বলে রাজনীতি সংক্রান্ত নতুন নৈতিকতার কথা বলেন। সাবেকী নৈতিকতা যাতে পার্থিব সাফল্যের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করতে না পারে সে সম্বন্ধে তিনি সজাগ ছিলেন।

(৬) ম্যাকিয়াভেলি প্রথম রাষ্ট্র কথাটি ব্যবহার করেন এবং আধুনিককালে রাষ্ট্র বলতে যা বোঝায় সেই জাতীয় ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের ধারণার প্রবর্তন করেন।

(৭) খ্রীষ্টীয় ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের বদলে ম্যাকিয়াভেলি জাতীয় রাষ্ট্রের কথা এবং জাতীয় ঐক্যের কথা বলেন। তাই তাঁকে জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণার অগ্রদূত বলা যায়।

(৮) সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে ধারণা ম্যাকিয়াভেলিই প্রথম লিপিবদ্ধ করেন। তবে তাঁর আলোচনা সুসংবদ্ধ ছিল না। পরে বোডিনও হব্‌স তার পূর্ণ রূপ দেন।

(৯) রাজনীতির বিষয়বস্তু যে ক্ষমতা, তা প্রথম ম্যাকিয়াভেলিই বলেন। তিনি ক্ষমতা অর্জনের উপায় ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁর মতে, ক্ষমতা নিজেই নিজের উদ্দেশ্য। ক্ষমতার নৈতিকতা নিয়ে চিন্তাকে তিনি অর্থহীন বলেন। কোন বিরোধিতা ছাড়া যে ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারে, সেই ক্ষমতার অধিকারী—একথা বলে তিনি ঐশ্বরিক উৎপত্তিতত্ত্বকে অস্বীকার করেন।

(১০) শাসককে পরামর্শদান প্রসঙ্গে তিনি প্রথম মনস্তত্ত্বমূলক আলোচনা করেন।

(১১) ম্যাকিয়াভেলির ইটালির ঐক্য ও সম্পদবৃদ্ধির আগ্রহ ও ফ্লোরেন্সের লুপ্ত গৌরব উদ্ধারের প্রসঙ্গ তাঁর স্বদেশপ্রেম ও জাতির প্রতি ভালবাসার পরিচয় বহন করে।

ম্যাকিয়াভেলি ইউরোপীয় রাষ্ট্রচিন্তার জগতে বিপ্লব নিয়ে আসেন। মধ্যযুগীয় ঈশ্বরকেন্দ্রিক, আধিভৌতিক ও নীতিসমন্বিত রাষ্ট্রচিন্তাকে ধর্ম নিরপেক্ষ ও নীতি নিরপেক্ষতা দান করেন এবং রাষ্ট্রীয় ঐক্য, ক্ষমতা ও বাস্তব রাজনীতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। তাই তিনি আধুনিকতার অগ্রদূত হিসাবে রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে পরিচিত। জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণাগত পরিপ্রেক্ষিত প্রদান করে তিনি পরবর্তীকালে বুর্জোয়াদের বিকাশের পথ প্রশস্ত করেন।

অনুশীলনী —৪

প্রশ্ন ১। ম্যাকিয়াভেলির রাজনৈতিক চিন্তাধারার সমালোচনাগুলি কী কী ?
(উত্তর ২০ পংক্তির মধ্যে সীমিত করুন)

প্রশ্ন ২। রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে ম্যাকিয়াভেলির অবদানগুলি কী কী ?
(উত্তর ২০ পংক্তির মধ্যে লিখুন)

৫৩.৬ সারাংশ

আলোচ্য এককে নবজাগরণ ও ম্যাকিয়াভেলি আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমে নবজাগরণের ধারণা এবং পরে ম্যাকিয়াভেলির সংক্ষিপ্ত জীবনী, তাঁর বিভিন্ন রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে তাঁর মূল্যায়ন আলোচিত হয়েছে।

পঞ্চদশ শতকে ইউরোপ তথা ইটালিতে নবজাগরণের আলোয় মধ্যযুগীয় গীর্জার আধিপত্যবাদের অবসান, বস্তুগত উন্নতি, মানুষের মর্যাদার গুরুত্ববৃদ্ধি, যুক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিকতা, ধর্ম ও নীতির গোঁড়ামি থেকে মুক্তি, জাতীয়তাবোধের সঞ্চার ইত্যাদির ভিত্তিতে আধুনিক যুগের সূচনা ঘটে। ম্যাকিয়াভেলি এই নবজাগরণের প্রতিনিধি। তিনি আরোহ পদ্ধতি, অভিজ্ঞতাবাদ ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানুষের রাজনৈতিক মানসিকতা চিত্রিত করেন, চার্চের বদলে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং

রাষ্ট্রের ঐশ্বরিক ও নৈতিক নিয়মের বদলে ধর্ম নিরপেক্ষ ও নীতি নিরপেক্ষ রাজনীতির অবতারণা করেন। তিনি রাষ্ট্রশাসনের ছয়টি রূপের কথা বলেন। কিন্তু প্রজাতন্ত্র ও রাজতন্ত্র সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন। সাধারণভাবে প্রজাতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর পক্ষপাত থাকলেও তিনি বিশৃঙ্খল ও অরাজক রাজনৈতিক পরিবেশে রাজতন্ত্রকেই কাম্য মনে করতেন। অনৈক্যজনিত দুর্বল ও বিশৃঙ্খল ইটালিতে একজন শক্তিশালী রাজার মাধ্যমে সুশাসন ও ঐক্যপ্রতিষ্ঠার কথা তিনি বলেন। তিনি মনে করতেন যে রাজা সৎ হ'লে ভাল, কিন্তু প্রয়োজনে তিনি অসৎ, পাপাচারী ও কপট হতে পারেন। রাষ্ট্রের ঐক্য ও শান্তিপ্রতিষ্ঠাই রাজার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য রাজা নৈতিক বা অনৈতিক যে কোন পথেই হাঁটতে পারেন। আইন ও পাশবিক বলপ্রয়োগ উভয়ের মাধ্যমে রাজা শাসন করবেন। তিনি ক্ষমতা প্রতিষ্ঠাকে শাসনের উদ্দেশ্য বলে স্বীকার করেছেন। একই সঙ্গে তিনি একজন আইনপ্রণেতার দ্বারা রচিত আইনের প্রয়োজনীয়তার ওপরও গুরুত্ব দিয়েছেন এবং আইনের সাহায্যে নাগরিকদের নিয়ন্ত্রণ ও সমাজের নৈতিকতা প্রতিষ্ঠার কথাও বলেছেন।

ম্যাকিয়াভেলি রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে নানাভাবে সমালোচিত হয়েছেন। তাঁর চিত্রিত মানব চরিত্রের হতাশাজনক রূপ, ধর্ম ও নৈতিকতা বিবর্জিত রাজনীতি, রাজাকে অনৈতিক, কপট ও পাপের পথে রাষ্ট্র শাসনের পরামর্শ ইত্যাদি সমালোচিত হয়েছে। আবার তাঁকে রাষ্ট্রচিন্তায় আধুনিকতার অগ্রদূতের মর্যাদাও দেওয়া হয়। তিনি মধ্যযুগীয় ঈশ্বর নির্ভরতা ও আধিভৌতিকতা থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে মুক্ত করেন, ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ওপর জোর দেন, আধ্যাত্মিক শক্তিকে পার্থিব শক্তির অধীনস্থ করেন, জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণা সমর্থন করেন এবং বস্তুগত সাফল্যকে গুরুত্ব দেন।

৫৩.৭ অনুশীলনী

১। পঞ্চদশ শতকের ইউরোপীয় নবজাগরণ সম্বন্ধে আলোচনা করুন।
(আপনার উত্তর ২৫ পংক্তির মধ্যে হবে।)

২। ম্যাকিয়াভেলির রাজনৈতিক চিন্তাধারার পরিচয় দিন।
(আপনার উত্তর ৩০ পংক্তির মধ্যে শেষ করুন।)

৩। ম্যাকিয়াভেলির রাজনৈতিক চিন্তার মূল্যায়ন করুন।
(উত্তর ২৫ পংক্তির মধ্যে লিখুন।)

৫৩.৮ উত্তরমালা

অনুশীলনী— ১

১। ৫৩.২-এ উত্তর দেখুন।

২। ৫৩.২.১-এ উত্তর আছে।

৩। ৫৩.২.২-এ উত্তর খুঁজুন

অনুশীলনী— ২

১। ৫৩.৩-এ দেখুন।

২। ৫৩.৩-এ উত্তর পাবেন।

৩। ৫৩.৩-এ উত্তর আছে।

অনুশীলনী— ৩

১। ৫৩.৪.১-এ উত্তর আছে।

২। ৫৩.৪.২-এ উত্তর খুঁজুন।

৩। ৫৩.৪.৩-এর সাহায্যে লিখুন

৪। ৫৩.৪.৫-এ দেখুন।

৫। ৫৩.৪.৫-এ উত্তর আছে।

৬। ৫৩.৪.৬-এর সাহায্যে লিখুন

৭। ৫৩.৪.৬ ও ৫৩.৪.৭-এ দেখুন।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

১। ৫৩.২., ৫৩.২.১, ৫৩.২.২-এর সাহায্যে লিখুন।

২। ৫৩.৪.১ থেকে ৫৩.৪.৭-এ উত্তর খুঁজুন।

৩। ৫৩.৫-এ উত্তর পাবেন।

৫৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১। Amal Kumar Mukhopadhyay : *Western Political Thought*, K P Bagchi & Co, Calcutta, 1980, PP 86-98.

২। David Thomson : *Political Ideas*, Penguin Books, 1990, pp 22-33

৩। W.A. Dunning : *A History of Political Theories, Ancient and Mediaeval*, Central Book Depot, Allahabad, 1970, pp 285-325.

৪। R. Pandey : *Political Thought, a Plato to Machiavelli*, Vani Educational Books, 1985, pp 407-443.

৫। দেবাশীষ চক্রবর্তী ঃ *রাষ্ট্রচিন্তার ধারা, ম্যাকিয়াভেলি থেকে রুশো*, সেন্ট্রাল বুক পালিশার্স, কলকাতা, ১৯৯০, পৃষ্ঠা-১০-৫৪।

৬। প্রাণগোবিন্দ দাস ঃ *রাষ্ট্রচিন্তার ইতিবৃত্ত*, সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা-৮৯-১০২।

৭। সুভাষ সোম ঃ *রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-২৫৩-২৯৭।

৮। অমৃতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ *রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৮৭-১০৪.

৯। অমল কুমার মুখোপাধ্যায় ঃ *রাষ্ট্রদর্শনের ধারা*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৭, তৃতীয় অধ্যায়।

১০। Raymond Gettell : *History of Political Thought*, George Allen and Unwin Ltd., Cheaper Ed, 1932, London, Chapter VII.

১১। George H. Sabine : *A History of Political Theory*, Oxford and IBH Publishing Company, Indian Ed. 1961, Chapter 17.

একক ৫৪ ☐ ধর্মসংস্কার ঃ লুথার ও ক্যালভিন

গঠন

৫৪.০ উদ্দেশ্য

৫৪.১ প্রস্তাবনা

৫৪.২ ধর্মসংস্কারের ধারণা

৫৪.২.১ ধর্মসংস্কার আন্দোলনের রাজনৈতিক তত্ত্ব

৫৪.৩ লুথারের সংক্ষিপ্ত জীবনী

৫৪.৩.১ লুথারের চিন্তাধারা

৫৪.৩.২ ধর্মীয় চিন্তাভাবনা

৫৪.৩.৩ রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা

৫৪.৩.৪ লুথারের সমালোচনা ও মূল্যায়ন

৫৪.৪ জন ক্যালভিনের সংক্ষিপ্ত জীবনী

৫৪.৪.১. ক্যালভিনের চিন্তাধারা

৫৪.৪.২. ধর্মীয় চিন্তাভাবনা

৫৪.৪.৩. রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা

৫৪.৪.৪. ক্যালভিনের সমালোচনা ও মূল্যায়ন

৫৪.৫ সারাংশ

৫৪.৬ অনুশীলনী

৫৪.৭ উত্তরমালা

৫৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৫৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল ষোড়শ শতকের ধর্মসংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে আপনাকে অবহিত করা এবং ধর্মসংস্কার আন্দোলনের দুই নেতা লুথার ও ক্যালভিনের চিন্তাধারার সঙ্গে আপনার পরিচিতি স্থাপন। এই উদ্দেশ্যে আপনাকে জানানো হচ্ছে —

- ধর্মসংস্কারের ধারণা এবং ধর্মসংস্কারের রাজনৈতিক তত্ত্ব;
- মার্টিন লুথারের জীবনী, চিন্তাধারা, সমালোচনা ও মূল্যায়ন;
- জন ক্যালভিনের জীবনী, চিন্তাধারা, সমালোচনা ও মূল্যায়ন।

৫৪.১ প্রস্তাবনা

এই এককে আমরা ষোড়শ শতকের ইউরোপের ধর্মসংস্কার আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনের দুই নেতা মার্টিন লুথার ও জন ক্যালভিনের চিন্তাধারার আলোচনা করব।

পঞ্চদশ শতকে ম্যাকিয়াভেলি ধর্মনিরপেক্ষ পথে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে শক্তিশালী করে জাতীয় রাষ্ট্রের বিকাশের পথ সুগম করেন। ষোড়শ শতকে ধর্মসংস্কার আন্দোলন ধর্মের সাহায্যে রোমান ধর্মের অনাচার থেকে সমাজকে মুক্ত করে ধর্মীয় বিশুদ্ধিকরণ ঘটায় এবং ধর্মের ওপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব স্থাপন করে শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে।

ধর্মসংস্কার আন্দোলন পোপ ও যাজকদের 'মার্জনাপত্র বিক্রী' করে অর্থ সম্পদ বৃদ্ধি, ভূসম্পত্তির ওপর লোভ আদায় এবং খ্রীষ্টধর্মবিরোধী অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করে, ধর্মের ক্ষেত্রে বিবেকের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করে। সাধারণ মানুষ ও যাজকের মধ্যে সাম্যের কথা বলে এবং বাইবেলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই আন্দোলন শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব, চার্চের ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ, রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে প্রচার, রাষ্ট্রবিরোধিতার অস্বীকৃতি এবং রাষ্ট্রের প্রতি চরম আনুগত্য— ইত্যাদি বক্তব্যের মাধ্যমে ধর্মীয় পোপের বদলে পার্থিব রাজার অপ্রতিহত প্রাধান্যের কথা বলে। এই বক্তব্যগুলি জাতীয় রাষ্ট্রের বিকাশে সহায়তা করে।

ধর্মসংস্কারের বিভিন্ন নেতার মধ্যে মার্টিন লুথার এবং জন ক্যালভিন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। মার্টিন লুথার জার্মানীতে এবং জন ক্যালভিন সুইজারল্যান্ডে ক্যাথলিক ধর্ম-বিরোধী ধর্মসংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করেন। এই আন্দোলন প্রটেস্ট্যান্ট আন্দোলন নামেও পরিচিত। মার্টিন লুথার ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সৃষ্টিকর্তা এবং জন ক্যালভিন ধর্মসংস্কার আন্দোলনের বিধিব্যবস্থার প্রণেতা ছিলেন।

উভয়েই ছিলেন মূলতঃ ধর্মসংস্কারক। ধর্মসংস্কার উপলক্ষে তাঁরা রাজনৈতিক বক্তব্যও উপস্থাপন করেছেন। উভয়েই ধর্মের বিশুদ্ধিকরণ ঘটাতে এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে শক্তিশালী করতে চেয়েছিলেন। উভয়েই ষোড়শ শতকের ইউরোপের উদীয়মান ব্যবসায়ী শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিনিধি ছিলেন এবং ইউরোপের বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশে সহায়তা করেছেন।

৫৪.২ ধর্মসংস্কারের ধারণা

ম্যাকিয়াভেলির পর ইউরোপের ধর্মনিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষকে শক্তিশালী করা এবং জাতীয় ঐক্য আনার প্রচেষ্টা ভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়। ম্যাকিয়াভেলি ধর্মকে জাতীয় ঐক্য ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিরোধী মনে করতেন। কিন্তু ধর্মসংস্কার আন্দোলন ধর্মের গুরুত্বকে আবার ফিরিয়ে আনে এবং ধর্মের সাহায্যে

ধর্মীয় অনাচার, যাজকদের ভোগলালসা ও সম্পত্তির মোহ থেকে সমাজকে মুক্ত করে ও রাজার নিরঙ্কুশ আধিপত্য কায়েম করে।

মধ্যযুগের শেষ দিকে ক্যাথলিক যাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পত্তি বৃদ্ধি, বিলাসিতা ও ভোগের আকাঙ্খা বৃদ্ধি পায়। তারা জনগণকে কৃচ্ছসাধন ও বৈরাগ্যের পথ দেখালেও নিজেরা ভোগবিলাস ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে। ফলে জনগণের মধ্যে ক্যাথলিক চার্চের যাজকদের প্রতি অসন্তোষ দেখা যায়। এই অসন্তোষ পুঞ্জিভূত হয়ে আন্দোলনের চেহারা নেয় ও সংস্কার আন্দোলনে পরিণত হয়। নেতৃত্ব দেন খৃষ্টধর্মের কিছু নেতা। ক্যাথলিক ধর্মীয় গোষ্ঠীর ধর্মীয় একাধিপত্যের বিরুদ্ধে ধর্মীয় প্রতিবাদীরা পরে প্রটেস্ট্যান্ট নামে পরিচিত হয়।

ষোড়শ শতকের শুরু থেকে সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় দেড়শ বছর ধরে চলছিল ধর্মসংস্কার আন্দোলন। পোপ ও যাজকদের অনাচারের বিরুদ্ধে প্রথম সরব হন জার্মানীর বিশিষ্ট ধর্মীয় নেতা মার্টিন লুথার। ১৫১৭ সালের অক্টোবর মাসে মার্টিন লুথার জার্মানীর উইটেনবার্গের চার্চের দরজায় ৯৫ দফা দাবিপত্রের এক স্মারকলিপি ঝুলিয়ে দেন। তখন থেকেই ধর্মসংস্কার আন্দোলনের শুরু হয় এবং জনগণের অসন্তোষ বাস্তব রূপ পায়। জার্মানী থেকে ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলেও এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, জার্মানী ও ফ্রান্সে এই আন্দোলন শক্তিশালী ছিল। লুথার ছাড়া ধর্মসংস্কার আন্দোলনের অন্যান্য নেতারা হলেন ফিলিপ মেলানকথন, আলরিখ জুহিংগ্লি, জন ক্যালভিন ও জন নক্স।

লুথার বা ধর্মসংস্কার আন্দোলনের অন্যান্য নেতারা খ্রীষ্টধর্মবিরোধী ছিলেন না। তাঁরা ক্যাথলিক চার্চ ও যাজকদের খ্রীষ্টধর্মবিরোধী আচরণের প্রতিবাদ করেছিলেন। চার্চ তখন জনগণের অন্ধবিশ্বাসের ভিত্তিতে নানাভাবে অর্থ উপার্জন করত। খ্রীষ্টান জগতের সর্বত্র ক্যাথলিক চার্চ বিশাল ভূসম্পত্তি ও মূল্যবান সম্পদ গড়ে তুলেছিল। ভূসম্পত্তির অন্তর্গত প্রজাদের কাছ থেকে চার্চ উচ্চহারে কর বা levy আদায় করত। প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মসংস্কারকরা এই প্রথার বিরোধিতা করেন। তাছাড়াও তখন ক্যাথলিক চার্চের যাজকরা অর্থের বিনিময়ে ইচ্ছাপূরণ পত্র ও পাপস্খলনের সার্টিফিকেট দিতেন। প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মসংস্কারকরা এর বিরোধিতা করেন। তাঁদের বক্তব্যগুলি রাজাদের সমর্থন লাভ করে এবং ধর্মসংস্কারকরা সাহসের সঙ্গে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

তাঁরা ক্যাথলিক চার্চ, যাজক ও পোপতন্ত্রের আধিপত্য হ্রাসে উৎসাহী ছিলেন। তাঁরা কোন ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলন গড়ে তোলেন নি। বরং খ্রীষ্টান ধর্মের ঐতিহ্য বজায় রাখা ও তার প্রচার অব্যাহত করাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। তাঁরা তাই ধর্মীয় অন্যায় ও অনাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে খ্রীষ্টান ধর্মকে ক্ষতিকর প্রথা থেকে মুক্ত করে ধর্মের বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় পথে ধর্মের পরিবর্তন শুদ্ধি।

ধর্মসংস্কার আন্দোলন অনুসারে অর্থ দিয়ে পুণ্য কেনা বা পাপপথ থেকে রক্ষা সম্ভব নয়। এই আন্দোলনের নেতাদের মতে পোপ বা কোন যাজক ধর্মের ওপরে নয়। তাঁদের জনকল্যাণের বদলে অর্থোপার্জনে আসক্ত হওয়া ঠিক নয়। পাপপুণ্য ব্যক্তির নিজস্ব বিষয়। পাপমুক্তির জন্য পোপের মাধ্যমের কোন প্রয়োজন নেই। যে কোন ব্যক্তি সরাসরি ঈশ্বরের সঙ্গে নিজে যোগাযোগ করতে পারেন। ব্যক্তিটির কাজ দেখে ঈশ্বর তার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবেন। চার্চ মানুষকে যে পাপমুক্ত করতে পারে না, পুণ্যের পথেও ঠেলে দিতে পারে না। তবে উপদেশ দিতে পারে এবং এই উপদেশ সাধারণ মানুষ, ধর্মগুরু ও যাজক সকলের ওপর সমভাবে প্রযোজ্য। ধর্মগুরু বা যাজককেও সাধারণ মানুষের মত ধর্মীয় উপদেশ মেনে চলতে হবে। এই আন্দোলন ধর্মের কঠোরতার বদলে ধর্মের উদারতা, সারল্য ও সংযম প্রতিষ্ঠার কথা বলে।

৫৪.২.১. ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের রাজনৈতিক তত্ত্ব

ধর্মসংস্কার আন্দোলন মূলতঃ ধর্মীয় আন্দোলন হলেও বাস্তবে তা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনের রূপ নেয়। ধর্মসংস্কার আন্দোলনে ধর্মের সাথে রাজনীতির প্রশ্নও যুক্ত ছিল। ধর্মীয় যুক্তির সাহায্যে রাজনৈতিক তত্ত্বের সমর্থন বা অস্বীকার করা হয়েছিল। তবে রাজনৈতিক তত্ত্ব প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে কোন বিশেষ দল বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়নি।

ধর্মসংস্কার আন্দোলনের নেতারা চেয়েছিলেন খ্রীষ্টধর্মের সংস্কারসাধন, সংরক্ষণ ও বিশুদ্ধিকরণ। তাঁরা খ্রীষ্টীয় সমাজের সকল অংশের ওপর পোপের অস্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ হ্রাস, চার্চের বিশাল সম্পত্তির ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ, চার্চ ও যাজকদের দমন পীড়নমূলক ক্ষমতার অবসান, জনগণ দ্বারা যাজকদের নির্বাচন, বিবেকের স্বাধীনতা ও বাইবেলের গুরুত্বের কথা বলে ধর্মীয় জগতে গণতন্ত্রের ধারণার প্রতিষ্ঠা করেন।

মানুষ বাইবেল অনুসারে ধর্মাচারণ করবে, চার্চ বা পোপের পাপপুণ্যের ব্যাপারে কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না এবং ঈশ্বরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ দ্বারা ব্যক্তির পাপমুক্তি বা পুণ্যার্জন সম্ভব — এই বক্তব্যগুলি মানুষের ব্যক্তিসত্তার গুরুত্বকে স্বীকার করে এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার ধারণার প্রতিষ্ঠা করে। ধর্মসংস্কারবাদী নেতারা মানুষের ধর্মীয় আচরণের ওপর প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্বের নিয়ন্ত্রণের প্রতিবাদ করে ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠানের ওপরে গুরুত্ব দিয়েছেন। ঈশ্বর ও মানুষের মাধ্যম হিসাবে কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে তাঁরা মানেন নি। এই ধারণা মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণা থেকে স্বতন্ত্র এবং অভিনব। ঊনবিংশ শতকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ ও স্বাধীনতার বাণী ধর্মসংস্কার আন্দোলনেই এইভাবে প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল।

ধর্মসংস্কার আন্দোলন প্রচার করে যে সাধারণ মানুষের মত পোপ ও যাজকেরাও ঈশ্বরের অধীন। ধর্মসংস্কার আন্দোলন চার্চের অমানবিক আচরণের নিন্দা করে, চার্চের স্বৈরাচার ও অবিচার থেকে মানুষকে

রক্ষা করে। সাম্য, ধর্মীয় উদারতা ও ব্যক্তিস্বার্থের প্রাধান্যের এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলি মানবিকতার অর্থবাহী। তাই ধর্মসংস্কার আন্দোলনকে অনেকে মানবতাবাদী বলে মনে করেন।

এই ধর্মসংস্কার আন্দোলনের দুটি পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখযোগ্য। এই আন্দোলন চর্চা বা পোপের অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অধিকার স্বীকার করে কিন্তু রাজার স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিকারের কথা বলে না। বরং রাজার প্রতি অনুগত থাকতে বলে। রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে প্রচার করে এই মত রাজার প্রতি বাধ্যতামূলক আনুগত্য এবং মানুষের বিবেকের ওপর চার্চ ও পোপের কোন অধিকার নেই বলে চার্চ বা পোপের প্রতি বিরোধিতার ধারণা প্রতিষ্ঠা করে। এইভাবে রাজনীতির অন্যতম প্রশ্ন রাজনৈতিক আনুগত্য বা বিরোধিতার ধারণাটি সংস্কার আন্দোলন থেকে জন্ম নেয়।

চার্চ ও পোপের একচ্ছত্র অধিকারের বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীন রাজশক্তিকে সমর্থন করার ফলে এই আন্দোলন যেমন রাষ্ট্রের প্রাধিকারকে গুরুত্ব দেয়, তেমনি রাজার কর্তৃত্বকেও শক্তিশালী করে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সংক্রান্ত ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদের জন্ম ঘটেছিল এই সময়ে। ঐশ্বরিক অধিকারের ভিত্তিতে শাসন চলায় এবং কেবলমাত্র ঈশ্বরের কাছে রাজার দায়িত্ব থাকায় রাজা চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে পড়েন এবং জনগণের সকলের কাছ থেকে নিঃশর্ত আনুগত্য দাবী করতে থাকেন।

বাস্তবিক পক্ষে ধর্ম সংস্কার ছিল খ্রীষ্টান সমাজে নেতৃত্ব বদল — পোপের বদলে রাজার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা। মধ্যযুগে ধর্মের ভিত্তিতে পোপের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ধর্মসংস্কারকরা সেই ধর্মের ভিত্তিতেই ষোড়শ শতকে রাজার কর্তৃত্বের কথা বললেন। তাঁরা ধর্মতত্ত্ব ও রাজনীতিকে একই স্রোতে নিয়ে আসেন। ম্যাকিয়াভেলির 'দি প্রিন্স' রচনার এক দশকের মধ্যেই নতুন ভাবে ধর্ম ও রাজনীতি সংযুক্ত হয়ে পড়ে।

তবে নবজাগরণের ফলে ধর্মীয় রাষ্ট্রের বদলে যে শক্তিশালী সার্বভৌম রাষ্ট্রের ধারণা জন্মলাভ করেছিল, ধর্মসংস্কার আন্দোলনের নেতারা তাকে পরোক্ষ স্বাগত জানান। ধর্মীয় অনাচার থেকে মুক্তির জন্য ধর্মসংস্কারবাদীরা রাজশক্তিকে সমর্থন করেছেন, রাজশক্তির সাহায্য নিয়েছেন এবং জনগণ, ধর্ম ও ধর্মীয় যাজকদের ওপর রাজার অধিকারকে সমর্থন করেছেন। এইভাবে সার্বভৌম রাষ্ট্রের ধারণাকে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

মধ্যযুগে খ্রীষ্টীয় ঐক্যের যে ধারণা ছিল ষোড়শ শতকে তার অবসান ঘটে। ধর্ম নয়, জাতীয়তার ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের প্রয়াস শুরু হয়। ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে জাতীয় রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবোধ জনিত ঐক্যের অনুভূতি দেখা যায়। সংস্কার আন্দোলন এই জাতীয়তাবোধের অনুভূতিকে অনুপ্রাণিত করেছে। ধর্মের উপর ভিত্তি করে ইউরোপে ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্টদের মধ্যে বিরোধ ষোড়শ শতকে (১৬১৮ -১৮৪৮) তিরিশ বছর ধরে যুদ্ধের চেহারা নেয়। এই যুদ্ধ শেষে যে ওয়েস্টফালিয়া শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়, সেই চুক্তি অনুসারে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্টদের মধ্যে বন্টিত

হয়। এই অঞ্চল বন্টনকে রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্ধারণ বলা যায়। ধর্মীয় ঐক্য ভেঙ্গে দেখা দেয় রাষ্ট্র - ভিত্তিক জাতীয় ঐক্য। জাতীয় ঐক্যভিত্তিক জাতীয় রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয় পার্থিব রাজার অসীম নিয়ন্ত্রণ।

ধর্মসংস্কার আন্দোলনকে নতুন সমাজের উদীয়মান শ্রেণীর স্বার্থপ্রসূত অর্থনৈতিক আন্দোলন হিসাবেও চিহ্নিত করা যায়। এই আন্দোলন রাজার কর্তৃত্বের ওপর নিঃশর্ত আনুগত্যের কথা বলে শাসকের নিরাপত্তা ও স্বার্থ রক্ষা করে, শাসিতের নয়। রাজার অপ্রতিহত কর্তৃত্ব দ্বারা শৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্নটি তৎকালীন উদীয়মান ব্যবসায়ী শ্রেণীর স্বার্থে জরুরী ছিল। ব্যবসায়ী শ্রেণীর স্বার্থে ধর্মসংস্কারকরা জার্মানীর কৃষক বিদ্রোহের বিরোধীতাও করেছেন।

ধর্মসংস্কার আন্দোলন নানাভাবে সমালোচিতও হয়েছে। বিবেকের স্বাধীনতা তত্ত্ব অসংখ্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুর সৃষ্টি করেছিল। অনেক চার্চ গড়ে উঠেছিল। এদের প্রত্যেকে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে সচেষ্ট ছিল। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। ক্যাথলিকরা প্রটেস্ট্যান্ট রাজা, এবং প্রটেস্ট্যান্টরা ক্যাথলিক রাজার বিরুদ্ধতা করত। জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হত। ম্যাকিয়াভেলির ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ অবলুপ্ত হয়ে রাজনীতি ও ধর্ম সংমিশ্রিত হয়ে পড়েছিল। এই আন্দোলনকে তাই ইতিহাসের পশ্চাদগামী আন্দোলন বলা হয়।

ফলে যে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী অনুগতদের ধর্মসংস্কার আন্দোলনে দেখা দেয়, তারা সংখ্যা বৃদ্ধিতে উৎসাহী হওয়ায় পরধর্মসহিষ্ণুতা ও সহনশীলতার আদর্শ লুপ্ত হয়। ধর্মীয় সহনশীলতার আদর্শ বিলুপ্ত হওয়ায় ধর্মীয় বিভেদ থেকে বিছিন্নতা, বিছিন্নতা থেকে সংঘাত ও গৃহযুদ্ধ এবং তা থেকে জাতিগত ও রাষ্ট্রীয় যুদ্ধের সূচনা হয়।

উপসংহার ঃ- ধর্মসংস্কার আন্দোলন একই সঙ্গে একদিকে আধুনিক ও বৈপ্লবিক এবং অন্যদিকে মধ্যযুগীয় ও প্রতিক্রিয়াশীল। সুনির্দিষ্ট ভূ-খন্ডগত শক্তিশালী আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, বিবেকের গুরুত্ব, চার্চের স্বৈরাচারের বিরোধীতা ইত্যাদি বৈপ্লবিক ধারণাগুলি মধ্যযুগের অবসান ও আধুনিকতার সূচক। অন্যদিকে আবার ধর্মীয় আদর্শ, ধর্মমিশ্রিত রাজনীতি, শাস্ত্রের দোহাই ইত্যাদি মধ্যযুগীয় ধারণার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং নবজাগরণ বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের দ্যোতক।

অনুশীলনী—১

১। ধর্মসংস্কার আন্দোলন বলতে কী বোঝায়? (উত্তর ২৫ পংক্তির মধ্যে লিখুন।)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২। ধর্মসংস্কার আন্দোলনের রাজনৈতিক তত্ত্বগুলি কী কী ? (উত্তর ৩০ পংক্তির মধ্যে লিখুন।)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৫৪.৩ লুথারের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ধর্মসংস্কার আন্দোলনের অন্যতম নেতা ও সৃষ্টিকর্তা ছিলেন জার্মান পন্ডিত ও সন্ন্যাসী মার্টিন লুথার। তিনি ১৪৮৩ সালে জার্মানীর থুরিঙ্গিয়ার অন্তর্গত আইসলেবেনের এক সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন (১৪৮৩-১৫৪৬)। ছেলেবেলা থেকে বিদ্যার প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল। তাঁর পিতা তাকে উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান। কিন্তু প্রবল ধর্মানুরাগ তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে না গিয়ে মঠে বিদ্যাশিক্ষায় অনুপ্রাণিত করে এবং তিনি সন্ন্যাসী হন। মঠে বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি প্রথমে ক্যাথলিক ধর্মযাজক এবং পরে উইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৫১১ সালে রোমে গিয়ে তিনি উচ্চতর ক্যাথলিক যাজকদের আচরণে ব্যথিত হন। তারপর দেশে ফিরে চার্চের সংস্কারের প্রচেষ্টায় ব্রতী হন। তাঁর এই প্রচেষ্টা আরও প্রবলতর হয় জন টেৎজেল নামে এক ক্যাথলিক যাজকের 'পাপ প্রায়শ্চিতের ক্ষমার তত্ত্ব' (Theory of Efficacy of Indulgences) শোনার পর এবং টেৎজেলকে জামনী 'মার্জনাপত্র' বিক্রী করতে দেখার পর। টেৎজেলের মতে, যে কোন পাপী ব্যক্তির পাপ ক্ষমা করা যেতে পারে এবং সে স্বর্গে পৌছতে পারে, যদি সে চার্চকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থদান করে। লুথার এই বক্তব্য ও 'মার্জনাপত্র' বিক্রীর প্রতিবাদ করেন। কিন্তু কোন ফল না হওয়ায় ক্যাথলিক চার্চ ও পোপের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করতে প্রয়াসী হন।

ক্যাথলিক চার্চের একজন অনুগামী হিসাবে লুথার প্রথমে রোমের ক্যাথলিক চার্চ ও রোমান সম্রাটকে চার্চের প্রয়োজনীয় সংস্কারের জন্য আবেদন করেন। কিন্তু তাঁর আবেদনে কোন সাড়া না পেয়ে লুথার জামানীর সম্ভান্ত ব্যক্তিদের সাহায্য চান এবং তিনি তাদের সমর্থন লাভ করেন। লুথার প্রথামে অন্যায় শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করেন। পোপের কর্তৃত্বকে প্রথমে চ্যালেঞ্জ করেননি। পরে চার্চ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি চার্চ ও পোপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন।

১৫১৭ সালের ৩১ শে অক্টোবর লুথার উইটেনবার্গ চার্চের দরজায় ৯৫ টি অভিযোগ সমন্বিত একটি ইস্তাহার ঝুলিয়ে দেন। চার্চের 'মার্জনাপত্র' বিক্রী ও পোপেব অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং পোপের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জও এই অভিযোগগুলির মধ্যে ছিল। এইভাবে লুথার ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান।

লুথারের প্রধান অভিযোগ ছিল অর্থের বিনিময়ে মার্জনাপত্রের বিক্রীর প্রথার বিরুদ্ধে। তাঁর মতে চার্চ কখনই দোষী ব্যক্তিকে দোষমুক্ত করতে পারে না। মার্জনাপত্রের জন্য অর্থদান করে দোষী ব্যক্তিটি চার্চের শাস্তি থেকে মুক্ত হতে পারে, কিন্তু দোষ থেকে নয়। ঈশ্বরই একমাত্র অপরাধীকে ক্ষমা করতে পারেন, অর্থ নয়, চার্চের হস্তক্ষেপ নয়, এ প্রসঙ্গে তিনি বিবেকের ওপর গুরুত্ব প্রদান করেন। অপরাধী তার বিবেককে সামনে রেখে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। লুথার চার্চ ও পোপের অনাচার থেকে

খ্রীষ্টধর্মকে মুক্ত করে খ্রীষ্টধর্মের বিশুদ্ধি ঘটাতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে, ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ক্ষেত্র — সেখানে সে বিবেক দ্বারা চালিত হয়—কোন বাইরের শক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা নয়। তিনি চার্চের প্রতি মানুষের আনুগত্যের ধারণাকে অস্বীকার করেন। তিনি একথাও বলেছেন যে সাধারণ মানুষের মত চার্চের যাজকরাও খ্রীষ্টীয় আদর্শ মানতে এবং আচরণ করতে বাধ্য। খ্রীষ্টধর্মের কাছে সব খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরাই সমান।

ধর্ম সম্বন্ধে লুথারের এই ধারণা ও পোপের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য পোপ লুথারকে ধর্মচ্যুত করে একটি চিঠি পাঠান। লুথার সেই চিঠি পুড়িয়ে দেন। তখন লুথারকে চার্চ ডেকে পাঠায় এবং লুথার যাজক, রাজা ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সামনে জানান যে তাঁর মত বাইবেলের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তিনি ঠিক কাজ করেছেন। পোপের আদেশে রোমের সম্রাট তখন তাঁকে সমাজচ্যুত করার নির্দেশ দেন। এই সময় লুথারের নের্তৃত্বে বিশাল সংখ্যক মানুষ ধর্ম বিদ্রোহে যোগ দেয়। ক্যাথলিক ধর্মের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদীরা প্রটেস্ট্যাট ধর্মগোষ্ঠী বলে পরিচিত হন এবং ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্টদের মধ্যে এই ধর্মযুদ্ধ জার্মানী থেকে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়ে।

লুথারের চিন্তাভাবনা বিভিন্ন পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'On Christian Liberty', 'The Babylonian Captivity of the Church', 'Address to Christian Noblity of the German Nation','Of Secular Authority', 'How far is Obedience Due to it', 'On Good Works', 'Concerning Christianity', 'Of Temporal Govt.' ইত্যাদি।

লুথারের ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে জার্মানীতে আলাদাভাবে চার্চ গঠন করেন। ইংল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, স্ক্যান্ডিনেভিয়া অঞ্চল ইত্যাদি ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় আলাদাভাবে চার্চ গঠিত হয়। লুথার এইভাবে খ্রীষ্টান জগতের নব রূপায়ন ঘটান। পোপতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সাধারণ পরিষদের ওপর চার্চব্যবস্থা পরিচালনার ভার অর্পণ করেন।

আধ্যাত্মিক চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে লুথার রাজনৈতিক প্রশ্নেও তাঁর মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন যে রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং ঈশ্বরের অনুমোদন দ্বারাই রাষ্ট্রে রাজার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত। রাজা তাই ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্র শাসন করেন। ঈশ্বরের প্রতিনিধি হওয়ায় রাজা নিজ ইচ্ছানুসারে শাসন করবেন। প্রজারা তার শাসনের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য জানাবে। রাজা অন্যায় করলেও প্রজারা তাঁকে মানতে বাধ্য। তারা শুধু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতে পারে। রাজার প্রতি প্রজার কর্তব্য হল ঈশ্বরের প্রতি তাদের কর্তব্যের প্রতিফলন। অর্থাৎ, লুথার প্রজাদের রাষ্ট্র বিরোধিতার অধিকার সমর্থন করেননি।

যে লুথার পোপতন্ত্র ও ক্যাথলিক চার্চের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিরোধিতায় সরব, সেই লুথারই রাষ্ট্র সম্পর্কে বক্তব্যের ক্ষেত্র হয়ে পড়েন কর্তৃত্ববাদী। ধর্মের ক্ষেত্রে বিদ্রোহী লুথার রাষ্ট্রচিন্তায় ছিলেন রক্ষণশালী। রাজার প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য এবং শক্তিশালী রাজতন্ত্রকে তিনি সমর্থন করেন। চার্চের সঙ্গে

বন্ধন ছিন্ন করে তিনি ধর্মীয় সাম্যের কথা বলেন, কিন্তু যখন জার্মানীর শোষিত কৃষকরা তাঁরই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৫২৫ সালে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাদের নিজস্ব অধিকার দাবী করে তখন তিনি তাদের বিরোধিতা করেন। কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন অ্যানা-ব্যাপটিস্ট গোষ্ঠী, যারা লুথারের ধর্মীয় সাম্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত বামপন্থী সংস্কারবাদী ছিলেন। তাঁদের মতে, বিশ্বাসের ভিত্তিতে পৃথিবীতে স্বর্গ আনা সম্ভব হবে—যেখানে সামাজিক সাম্য বিরাজ করবে। কৃষকরা আশা করেছিল যে লুথার তাদের আন্দোলনকে সাফল্য লাভ করতে সাহায্য করবে। তিনি তাদের কিছু অভিযোগের প্রতি সহানুভূতিও দেখান। কিন্তু তিনি কৃষকদের বিদ্রোহের পথ পরিহার করে শান্ত হতে বলেন, কারণ তাঁর মতে, বিদ্রোহের পথ জার্মানীর ধ্বংস ডেকে আনবে। বিদ্রোহী কৃষকরা তাঁর কথা না শোনায় তিনি জার্মান প্রিন্সদের পক্ষ নেন এবং কৃষকদের বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রিন্সদের উৎসাহ দেন। একবছরের মধ্যে ১,০০,০০০ কৃষক মারা যায়। এইভাবে লুথারের সাহায্যে কৃষক বিদ্রোহ নির্মূল হয়। জীবনের শেষ পর্যন্ত লুথার জার্মান প্রিন্সদের পক্ষে ছিলেন। ধর্মের ক্ষেত্রে সমতাপন্থী ও বিদ্রোহী লুথার শেষ পর্যন্ত বলপ্রয়োগকারী রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এবং অসম সামাজিক ব্যবস্থার সমর্থকে পরিণত হন।

লুথারের ক্যাথলিক চার্চ ব্যবস্থার পরিবর্তনের বৈপ্লবিক দাবী, কর্তৃত্বশালী ও বল প্রয়োগকারী রাজার প্রতি সমর্থন এবং কৃষক বিদ্রোহের বিরোধিতা—এই বক্তব্যগুলির পরিপ্রেক্ষিত হল তাঁর সময়ের জার্মানীর উদীয়মান ব্যবসায়ী শ্রেণীর প্রয়োজন। তারা চার্চের স্বৈরাচার থেকে মুক্ত অথচ শক্তিশালী রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ দ্বারা শাসিত সুশৃঙ্খল রাষ্ট্রকে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের উপযোগী পরিবেশ বলে মনে করত। তারাই আবার কৃষক বিদ্রোহেরও বিরোধী ছিল। লুথারের আন্দোলন ও বক্তব্যগুলি তৎকালীন জার্মানীর উদীয়মান ব্যবসায়ী শ্রেণীর আত্মবিকাশের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে।

৫৪.৩.১. লুথারের চিন্তাধারা

লুথার ছিলেন ধর্মীয় সংস্কারক। প্রকৃতপক্ষে ধর্মসংক্রান্ত প্রশ্ন ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে তাঁর চিন্তাভাবনা। তিনি রাজনৈতিক চিন্তাবিদ ছিলেন না। তবে তাঁর ধর্মীয় প্রশ্ন আলোচনা প্রসঙ্গে এসেছে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা। স্যাবাইন তাই বলেছেন যে লুথারের রাজনীতিতে খুব সামান্য আগ্রহ ছিল। শুধুমাত্র ঘটনাবলীর ভিত্তিতে বাধ্য হয়ে রাজনীতির প্রতি তিনি দৃষ্টি দেন। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা তাই সুসংবদ্ধ ছিল না, বরং অসঙ্গতিপূর্ণ ছিল।

৫৪.৩.২. ধর্মীয় চিন্তাভাবনা

লুথার এবং তার খ্রীষ্টান প্রটেস্ট্যান্ট গোষ্ঠী ধর্মসংক্রান্ত চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে ষোড়শ শতকে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল।

তিনি যাজকদের 'মার্জনাপত্র বিক্রী' ও নানাভাবে অর্থসংগ্রহের, ভূসম্পত্তি অর্জনের এবং ভূসম্পত্তির

ওপর লোভ আদায়ের অন্যায় ব্যবস্থার বিরোধীতা করে খ্রীষ্টান ধর্মের বিশুদ্ধিকরণের চেষ্টা করেন। ধর্মরক্ষা ও অনাচার থেকে ধর্মের মুক্তি ছিল তাঁর প্রধান চিন্তা এবং তাই তিনি ধর্মের প্রচলিত আনুষ্ঠানিক ধারণাকে অস্বীকার করে বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করেন।

তিনি ক্যাথলিক চার্চ ও পোপের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাকে নস্যাৎ করে দেন। জার্মানী, ইংল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড ইত্যাদি বিভিন্ন ইউরোপীয় রাষ্ট্রে আলাদা চার্চ গড়ে ওঠে এবং খ্রীষ্টান জগতে রোমের পোপের প্রভুত্ব হ্রাস পায়।

তিনি খ্রীষ্টান জগতে সাম্যনীতির কথা বলেন। তাঁর মতে চার্চের যাজক এমন কি পোপও সাধারণ মানুষের মত ধর্মীয় শিক্ষা অনুসারে চলতে বাধ্য। চার্চ মানুষকে শাস্তি দিতে পারে না, একমাত্র ঈশ্বরই তা দিতে পারে; এই বক্তব্য মানুষকে চার্চ ও যাজকদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করে।

বাইবেল ও বিবেক অনুযায়ী চলার শিক্ষা জনগণকে বহু শতাব্দীব্যাপী চার্চের প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করে। ধর্ম ব্যক্তির নিজস্ব ব্যাপার বলায় ধর্ম জগতে চার্চের কর্তৃত্ব হ্রাস পায় এবং ব্যক্তির বিবেকের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

ধর্মীয় কর্তৃত্বের বিরোধিতার কথা বলে লুথারীয় প্রচার মধ্যযুগীয় বাতাবরণ অভিনবত্বের সূচনা করে। লুথার ধর্মের ক্ষেত্রে সাম্য, গণতন্ত্র ও বিবেকের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেন।

৫৪.৩.৩. রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা

লুথারের রাজনৈতিক চিন্তাধারা তাঁর ধর্মীয় শিক্ষা ও বক্তব্যের প্রসঙ্গেই সৃষ্ট। তিনি প্রচলিত অর্থে রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছিলেন না। তবে মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা বৈপ্লবিক ছিল।

লুথার রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক জগতের পার্থক্য করেন এবং বলেন যে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ধর্মীয় যাজকীয় কর্তৃত্বের থেকে উচ্চতর। তিনি চার্চকে করসংগ্রহের ক্ষমতা দেননি, বরং বলেছেন যে এই ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে পার্থিব রাজার। তাঁর মতে, রাজার কাজের পর্যালোচনা বা রাজাকে বরখাস্ত করা বা সমাজচ্যুত করার কোন অধিকার পোপের নেই। বরং যাজকরা কর্তব্য পালনে অযোগ্য হলে রাজাকে যাজকের দায়িত্ব গ্রহণ করতে বলেছেন।

লুথার রাষ্ট্রের উচ্চতর কর্তৃত্বের সমর্থনে ধর্মীয় যুক্তির অবতারণা করেন। তিনি রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে ঐশ্বরিক উৎপত্তি তত্ত্বের ভিত্তিতে সমর্থন করেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্র ঈশ্বর সৃষ্ট এবং রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্র শাসন করেন। তাই প্রজারা তাঁকে শর্তহীন আনুগত্য দেখাতে বাধ্য। প্রচলিত রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে লুথার রাজতন্ত্রের নিরঙ্কুশ আধিপত্যের পথ উন্মুক্ত করেন। রাজার চরম ও অসীম ক্ষমতার কথা বলে তিনি স্বৈরাচারকে সমর্থন করেন।

লুথার ব্যক্তির রাষ্ট্রবিরোধী অধিকার সমর্থন করেননি। তিনি ব্যক্তির স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব এই দুয়ের মধ্যে দ্বিতীয়টির পক্ষে ছিলেন। লুথার রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে সমর্থন করেন নিজের স্বার্থে, কারণ চার্চের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার জন্য তিনি রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সমর্থন চেয়েছিলেন এবং তৎকালীন জার্মান শাসকদের সমর্থন লাভ করেন।

রাষ্ট্রের শক্তিশালী কর্তৃত্বের মাধ্যমে লুথার ইউরোপে জাতীয় ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের ধারণাকে স্বাগত জানান।

৫৪.৩.৪. লুথারের সমালোচনা ও মূল্যায়ন

লুথারের চিন্তাধারার মধ্যে কিছু স্ববিরোধিতা লক্ষণীয়। ধর্মের আলোচনায় লুথার মানবতাবাদী, কিন্তু রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রশ্নে লুথার মানবতাবিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করেন, তিনি চার্চের স্বৈরাচারের প্রতিবাদ করেন, কিন্তু রাষ্ট্রের স্বৈরাচারকে সমর্থন করেন। তিনি ধর্মীয় জগতে ব্যক্তির স্বাধীনতার কথা বলেন, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রজাদের রাজার প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যের কথা বলে প্রজাদের স্বাধীনতাকে বিপন্ন করে তোলেন। লুথার চার্চের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জনগণকে বিদ্রোহী করে তোলেন, কিন্তু রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের বিরোধিতা সমর্থন করেননি। তিনি চার্চের আধ্যাত্মিক গুরুত্ব হ্রাস করেন, কিন্তু রাষ্ট্রকে আধ্যাত্মিক ভিত্তির ওপর স্থাপন করেন এবং ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ তত্ত্ব দ্বারা রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে সমর্থন করেন। তিনি প্রতিটি ব্যক্তিকে বিবেক অনুযায়ী প্রার্থনার অধিকার দেন, আবার বলেন যে ধর্মীয় বিষয় রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। চার্চের সংস্কার প্রসঙ্গে লুথার গণতন্ত্রবাদী, কিন্তু রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের প্রশ্নে তিনি কর্তৃত্ববাদী। সাম্য, বিবেক ও ধর্মীয় স্বাধীনতার আলোচনা থেকে মনে হয় লুথার মানবতাবাদী। আবার যখন তিনি কৃষক বিদ্রোহকে নিদারুণভাবে দমন করতে সাহায্য করেন, তখন তাঁর মানবতাবাদ হারিয়ে যায়। চার্চ ও পোপের দুর্নীতি তাঁকে ভাবায়, কিন্তু তিনি জার্মান শাসকদের দ্বারা শোষিত কৃষকদের আন্দোলনে সহানুভূতি জানানোর প্রয়োজন বোধ করেন না।

লুথার কৃষক বিদ্রোহ দমনের জন্য জার্মানীর শাসকদের বলপ্রয়োগে উৎসাহিত করেন বলে অনেকে লুথারের সঙ্গে ম্যাকিয়াভেলির তুলনা করেন। ম্যাকিয়াভেলি ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিতে রাজাকে শক্তিশালী করতে চেয়েছিলেন, লুথার ধর্মীয় ভিত্তিতে রাজাকে শক্তিশালী করেন। এজন্য ম্যাকিয়াভেলি ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য করেন, কিন্তু লুথার ধর্মের সঙ্গে রাজনীতিকে যুক্ত করেন।

লুথার যখন চার্চের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, তখন জামানীর উদীয়মান ব্যবসায়ী শ্রেণী তাঁকে সমর্থন জানায় এবং লুথারকে তাঁদের প্রবক্তা বলে মনে করে। পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে রোমের পোপ দ্বারা জার্মান জনগণের অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে জার্মানীতে অসন্তোষ জমা হচ্ছিল। জার্মান জনগণের ওপর লেভির মাধ্যমে ক্যাথলিক চার্চ প্রভূত অর্থ উপার্জন করত। এর ফলে জামনীর উদীয়মান

ব্যবসায়ী শ্রেণী রোমের ক্যাথলিক চার্চের বিরোধী হয়ে পড়ে। লুথারের ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং রাজার ছত্রছায়ায় জার্মান ঐক্যের ধারণা তাই জার্মান ব্যবসায়ী গোষ্ঠী সমর্থন করে এবং তাদের সমর্থন লুথারের ধর্মসংস্কার আন্দোলনকে শক্তিশালী করে।

লুথারের ধর্মতত্ত্ব, তাঁর পার্থিব রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা, কৃষক বিদ্রোহের প্রতি সহানুভূতিহীনতা এবং জার্মানীর শাসককূলকে নিঃশর্ত সমর্থন — ইত্যাদি আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী বলে প্রতিভাত হলেও এদের পশ্চাতে ছিল জার্মানীর ব্যবসায়ী শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার প্রচেষ্টা। ক্যাথলিক চার্চের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে এবং ধর্মকে ব্যক্তিগত বিবেকের বিষয় বলে লুথার সমাজে ধর্মের সুগভীর প্রভাব হ্রাস করতে এবং ব্যবসায়ীদের বস্তুগত উদ্যোগের পক্ষে অনুকূল সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। আবার তাঁর ধর্মতত্ত্বে নতুন ব্যাখ্যা ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মীয় জাতীয়তার সঞ্চার করে, যা পরবর্তীকালে ইউরোপে জাতীয় রাষ্ট্রের বিকাশের পথ প্রশস্ত করে। জার্মান ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসার অগ্রগতির স্বার্থে শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্রের প্রয়োজনবোধ করে। রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়ে এবং রাজার বিরোধীতাকে অসম্ভব বলে লুথার শক্তিশালী জাতীয় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন, যা তৎকালীন ইউরোপের ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর বিকাশের প্রথম যুগে ব্যবসার অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন ছিল। লুথার ও তাঁর ধর্মসংস্কার আন্দোলন এইভাবে বুর্জোয়া শ্রেণীর আবির্ভাব ও বিকাশে সহায়তা করেছে।

অনুশীলনী — ২

১। লুথারের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁর সময় সম্বন্ধে লিখুন? (উত্তর ৩০ পংক্তির মধ্যে শেষ করুন)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২। লুথারের ধর্মীয় বক্তব্যগুলি কী কী ? (উত্তর ৩০ পংক্তির মধ্যে শেষ করুন।)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৩। লুথারের রাজনৈতিক চিন্তাধারার পরিচয় দিন ? (উত্তর ৩০ পংক্তির মধ্যে শেষ করুন।)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৪। লুথারের ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সমালোচনা ও মূল্যায়ন করুন ? (উত্তর ৩০ পংক্তির মধ্যে শেষ করুন।)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৫৪.৪ জন ক্যালভিনের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ধর্মসংস্কার আন্দোলনের নেতা জন ক্যালভিন (১৫০৯- ১৫৬৪) ফ্রান্সের পিকার্ডিতে এক ক্যাথলিক আইনজীবি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ল'স্কুল অফ ওরলিনস ও বার্জেস থেকে তিনি আইন শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তিনি ১৫৩৩ সালে মার্টিন লুথারের সংস্পর্শে আসেন ও প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম গ্রহন করেন। ১৫৩৬ সালে মাত্র ২৭ বছর বয়সে প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মমতকে সমর্থন করে লিখিত তাঁর গ্রন্থ "Institute of the Christian Religion" চারিদিকে হইচই ফেলে দেয়। এই গ্রন্থে ছিল তাঁর ধর্মতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক ধারণাসমূহ। পোপতন্ত্রের বিরুদ্ধে ক্যালভিনের প্রতিবাদ এবং ফ্রান্সের রাজা ফ্রান্সিসকে ক্যালভিন প্রদত্ত কিছু উপদেশ এখানে ছিল। ক্যালভিন রাজা ফ্রান্সিসকে ধর্মতত্ত্বের মূল শিক্ষা, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলার জন্য উপদেশ দেন এবং ধর্ম বিদ্বেষীদের প্রতি ফ্রান্সিসের নির্মম আচরণের বিরোধীতা করেন, যদিও প্রটেস্ট্যান্টদের রক্ষাকর্তা হিসাবে ফ্রান্সিসের প্রশংসা করেন। কিন্তু ক্যালভিনের উপদেশ ফ্রান্সিসের ক্রোধের কারণ হয় এবং তিনি ফ্রান্স থেকে পলায়ন করতে বাধ্য হন। তিনি সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় বসবাস করেন। জেনেভায় তিনি প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মকে সংগঠিত করার উপযুক্ত পরিবেশ পান। ক্যালভিন তাঁর চিন্তাধারাকে জেনেভায় প্রচারিত করে জেনেভাকে ভগবানের শহর এবং জেনেভার মানুষদের ধর্মপ্রাণ করে তোলার চেষ্টা করেন। একই সঙ্গে জেনেভার ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারে তিনি মন দেন। রোমান চার্চ দীর্ঘদিন ধরে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আদর্শসংক্রান্ত যে ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে তারই সমান্তরাল একটি সুসংবদ্ধ প্রটেস্ট্যান্ট দর্শন ও বিধিব্যবস্থা গড়ে তোলাই ছিল ক্যালভিনের লক্ষ্য। "Institute of the Christian Religion"-এ তিনি তাঁর পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয় দর্শনের সঙ্গে নিজস্ব রাষ্ট্রদর্শন ও লিপিবদ্ধ করেছেন। ক্যালভিনের চিন্তধারা ধীরে ধীরে হল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ইত্যাদি ইউরোপীয় রাষ্ট্রে বিস্তারলাভ করে।

৫৪.৪.১ ক্যালভিনের চিন্তাধারা

প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মের গুরু হিসাবে লুথারের নাম করা হয়, কিন্তু প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মের প্রচার ও প্রসারে সবথেকে বেশী উদ্যোগী ছিলেন ক্যালভিন। তিনি চার্চ ও রাষ্ট্র উভয়কেই নিজ নিজ এলাকায় স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলে মনে করতেন। তাঁর মতে রাষ্ট্র ও চার্চ একক ব্যবস্থার অন্তর্গত কোন ঐক্যবদ্ধ প্রতিষ্ঠান নয়। চার্চের ক্ষমতা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হবে, আর রাষ্ট্র তার ক্ষমতা আধ্যাত্মিক জগৎ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রসারিত করবে। তাঁর "Institute'-এ ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনের লক্ষ্য ও তাৎপর্য সম্বন্ধে তাঁর সুস্পষ্ট ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে।

৫৪.৪.২ ধর্মীয় চিন্তাভাবনা

ক্যালভিন ম্যাকিয়াভেলির মত মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে অসৎ মনে করতেন। তাঁর মতে মানুষের নিজের জীবনকে ঈশ্বরের অপরিবর্তনীয় নিয়মের অধীনে পরিচালিত হতে হবে। ঈশ্বরের পরিকল্পিত পথে

পরিচালিত হলে মানুষের অসৎ ও কপট প্রবণতা দূরীভূত হবে। তিনি বলেছেন যে কোন নিয়ম দ্বারা মানুষ পরিচালিত হবে বাইবেলে তার নির্দেশ আছে। ক্যালভিন মানুষের জীবনকে ঈশ্বর নির্ধারিত ও পূর্ব পরিকল্পিত মনে করতেন। অর্থাৎ ক্যালভিন অদৃষ্টবাদের সমর্থক ছিলেন।

ক্যালভিনের মতানুসারে, মানুষ দুটি নিয়মের অধীনে — আধ্যাত্মিক এবং রাজনৈতিক। প্রথমটি অনুযায়ী ঈশ্বর ও মানুষের এবং দ্বিতীয়টি অনুযায়ী মানুষের সঙ্গে মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হবে। প্রথমটি ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ— ঈশ্বরের হাতে সেই নিয়ন্ত্রণ অর্পিত এবং এই নিয়ন্ত্রণ তাকে সৎ ও সুন্দর জীবনের শিক্ষা দেবে। চার্চ তার প্রশাসনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক লক্ষ্যপূরণে সাহায্য করবে। দ্বিতীয়টি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ — রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ সেই নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা করবেন এবং এই নিয়ন্ত্রণ পার্থিব শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করবে। এক্ষেত্রে চার্চ কোন হস্তক্ষেপ করবে না।

আইনের ছাত্র ক্যালভিন আইনগত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আইনগত সংস্কারের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর কাছে শৃঙ্খলাই প্রধান, তা মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনেই হোক, বা রাজনৈতিক জীবনেই হোক। ঈশ্বরের বাণী, বাইবেলের শিক্ষা, ধর্মতাত্ত্বিকদের চিন্তা এবং রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলার আদর্শ সব কিছুর দিকে দৃষ্টি দিয়েই তিনি তাঁর 'Institute' রচনা করেছেন। ধর্মজগতে রোমান চার্চের মত প্রটেস্ট্যান্ট দর্শন ও বিধিব্যবস্থা গড়ে তোলায় তাঁর ধর্মীয় চিন্তাভাবনার বৈশিষ্ট্য।

৫৪.৪.৩ রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা

রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে ধর্মসংস্কারকদের মধ্যে ক্যালভিনের অবদানই সর্বপ্রধান। আইনবিদদের দৃষ্টি দিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। ভানিং-এর মতে ক্যালভিন হলেন ধর্মসংস্কারের বিধিপ্রণেতা। আইনগত ধারণার ভিত্তিতেই তিনি রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও শৃঙ্খলার আলোচনা করেছেন। কিন্তু রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ধর্মের আবরণে আবৃত। মধ্যযুগের ভাবধারা থেকে তিনি পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেননি। তবে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারার মধ্যে সঙ্গতি লক্ষণীয়।

ক্যালভিনের মতে, ধর্মীয় প্রশাসন ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পুরোপুরি আলাদা। প্রত্যেকে নিজ এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। অন্যের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করবে না। আধ্যাত্মিক বিষয় থাকবে চার্চের হাতে আর রাষ্ট্রের কাজ শৃঙ্খলা রক্ষা। চার্চের এলাকায় রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের যেমন কোন কর্তৃত্ব থাকবে না, তেমনি চার্চেরও কোন অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার কোন ক্ষমতা থাকবে না।

মানুষের অস্তিত্বরক্ষা, শৃঙ্খলা আনয়ন ও স্বাধীনতা প্রদানের জন্য রাষ্ট্রে সরকারের প্রয়োজন। কোন বিশেষ ধরনের সরকার সম্বন্ধে তাঁর পছন্দ না থাকলেও তিনি অভিজাততন্ত্রের প্রতি বেশী আস্থা স্থাপন করেছেন, সরকারের কর্তব্য হল মানবিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা, ঈশ্বরভাব ও ধর্মভক্তির উদ্রেক এবং শান্তিরক্ষা।

তিনি সরকারের দন্ড দেওয়ার অধিকার, যুদ্ধ করার অধিকার, কর আরোপের অধিকার সমর্থন করেছেন। রাষ্ট্রের নীতি ভঙ্গ করার জন্য চার্চকেও সরকার শাস্তি প্রদান করতে পারবে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও সরকারকে ক্যালভিন মানুষের কাছে খাদ্য ও রাষ্ট্রের মত প্রয়োজনীয় বা অপরিহার্য মনে করতেন।

ক্যালভিন বলেছেন যে সরকারের রূপ অভিজাততন্ত্র, রাজতন্ত্র বা গণতন্ত্র, যাই হোক না কেন, রাষ্ট্র মানুষের জন্য ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট। রাষ্ট্র মানুষের ইচ্ছা বা যুক্তির দ্বারা গড়ে ওঠেনি। রাষ্ট্র ঈশ্বর সৃষ্ট হওয়ায় রাষ্ট্রের কর্তৃত্বও পবিত্র ও প্রশ্নাতীত।

ক্যালভিনের মতে, যে কোন নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টানের রাষ্ট্র ও সরকারকে আনুগত্য দেখানো উচিত। সরকার বিরোধিতাকে তিনি খ্রীষ্টান ধর্মবিরোধী বলেছেন। তাই প্রতিটি ব্যক্তিকে তিনি সরকারকে মেনে চলতে বলেছেন। রাজা অন্যায় করলেও তাঁকে অমান্য করার অধিকার নাগরিকের নেই। রাজা তাঁর কাজের জন্য ঈশ্বরের কাছে দায়ী। মানুষ অসৎ বলে ঈশ্বর মানুষকে শাস্তি দেওয়ার জন্য রাজাকে প্রেরণ করেছেন। তবে তিনি বলেছেন যে শাসক ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কোন কাজের জন্য নাগরিকদের প্ররোচিত করলে, তখন তারা রাজাকে অমান্য করতে পারে, কারণ রাজার ওপর আছেন ঈশ্বর। তাঁকে কেউ অমান্য করতে পারে না। তবে রাজার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অধিকার থাকলেও ক্যালভিন জনগণকে রাজার বিরুদ্ধে বিপ্লবের অধিকার দেননি। ক্যালভিন লুথারের মতই বিপ্লব বিরোধী ও প্রচলিত ব্যবস্থার সংরক্ষক ছিলেন।

৫৪.৪.৪ ক্যালভিনের সমালোচনা ও মূল্যায়ন

ক্যালভিন শাসকের বিরুদ্ধে প্রজাদের বিপ্লবের অধিকারকে সমর্থন করেননি। রাজার ক্রিয়াকলাপ ঈশ্বরের আদর্শের বিরোধী হলে অবশ্য তিনি নাগরিকদের বিরোধিতাকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু ঈশ্বরের আদেশ কি তার প্রকৃত ব্যাখ্যা তিনি দেননি। ফলে তাঁর লেখা থেকে এই নির্দেশই পাওয়া যায় যে প্রজারা শাসকের অনুগত থাকবে। তিনি জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় আগ্রহ দেখাননি। শাসকের থেকে শাসিতের সংস্কারের দিকেই তিনি বেশি মনোযোগী ছিলেন।

ক্যালভিনের চিন্তাধারার মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব দেখা যায়। তিনি লুথারের মত রাজতন্ত্রের জয়গান করেননি, আবার প্লেটোর মত গণতন্ত্রের নিন্দা করেছেন। তিনি আনা-ব্যাপটিস্ট আন্দোলনের বিরোধিতা করেছেন, অথচ অভিজাততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রশংসা করেছেন। রাষ্ট্রকে স্বীকার করেছেন, কিন্তু লুথারের মত চার্চকে পুরোপুরি অস্বীকার করেননি।

তবে এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে ক্যালভিন অন্যান্য ধর্মসংস্কারকদের তুলনায় অধিক সাফল্য অর্জন করেন। ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডে ক্যালভেনীয় পথে প্রটেস্ট্যান্টবাদ অগ্রগতি লাভ করেছিল। ক্যালভিন রাষ্ট্রের সঙ্গে গীর্জার সুস্পষ্ট সীমারেখা নির্দেশ করেন। তাই কোথাও রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ

মানুষের ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের ওপর অন্যায় হস্তক্ষেপ করলে সেই শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ক্যালভেনীয় প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলেন। ফলে ক্যালভেনীয় এলাকাগুলিতে পৌর ও ধর্মীয় অধিকারের পার্থক্য রচিত হয়। ধর্মীয় বিষয়ে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ সম্ভব হয় না।

বিবেকের স্বাধীনতার প্রতি ও গণতন্ত্রের প্রতি লুথারের আর্কষণ ছিল। কিন্তু তাঁর বক্তব্য ও ক্রিয়াকলাপ রাষ্ট্রের স্বৈরাচারিতাকে প্রশয় দেয়। তিনি নির্মমভাবে কৃষক বিদ্রোহ নির্মূল করতে শাসকদের সাহায্য করেন। কিন্তু ক্যালভেনিয়রা বিবেকের স্বাধীনতার কথা না বললেও এবং সরকারী স্বৈরাচার সমর্থন করলেও তাঁদের আন্দোলন ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রসার ঘটায়। ক্যালভিনপন্থীদের আন্দোলন অনেক জায়গায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং স্বৈরবাদ বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল, যা লুথারের ক্ষেত্রে হয়নি।

ক্যালভিনের আধ্যাত্মিক ও রাষ্ট্রীয় জগতের পার্থক্যকরণ; স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ সংক্রান্ত পরবর্তী আন্দোলন এবং এই জগৎ ও পরজগতের ব্যাখ্যা ইউরোপে বিকাশশীল ব্যবসায়ী শ্রেণীর অগ্রগতিকে সাহায্য করেছিল। পরবর্তীকালে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশে এই মত সাহায্য করেছিল।

অনুশীলনী — ৩

১। ক্যালভিনের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখুন? (উত্তর৩০ পংক্তির মধ্যে শেষ করুন।)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২। ক্যালভিনের ধর্মীয় ভাবনাগুলির পরিচয় দিন? (উত্তর ৩০ পংক্তির মধ্যে শেষ করুন।)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৩। ক্যালভিনের রাজনৈতিক ভাবনাগুলি কী কী ? (উত্তর ৩০ পংক্তির মধ্যে শেষ করুন।)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৪। ক্যালভিনের মতবাদের মূল্যায়ন কর ? (উত্তর ৩০ পংক্তির মধ্যে শেষ করুন।)

.....

.....

.....

.....

.....

৫৪.৫ সারাংশ

এই এককে ধর্মসংস্কার আন্দোলন এবং লুথার ও ক্যালভিন আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমে ধর্মসংস্কারের ধারণা ও তার রাজনৈতিক তত্ত্ব এবং পরে লুথার ও ক্যালভিনের ধর্মসংস্কার সংক্রান্ত বক্তব্য আলোচিত হয়েছে।

ষোড়শ শতকে ধর্ম ও রাজনীতিকে একত্রিত করে ধর্মসংস্কার আন্দোলন একদিকে চার্চের অমানবিক প্রথা দূরীকরণ করে চার্চ ও পোপের কর্তৃত্ব হ্রাস করে এবং অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে চার্চের ওপর স্থাপন করে শক্তিশালী রাজতন্ত্রের পথ প্রশস্ত করে। ষোড়শ শতকের ইউরোপের ব্যবসায়ী শ্রেণী তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য ধর্মীয় বাতাবরণমুক্ত বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমাজে শৃঙ্খলারক্ষার জন্য শক্তিশালী রাজতন্ত্রের প্রয়োজন অনুভব করেছিল। ধর্মসংস্কার আন্দোলন তাদের এই প্রয়োজন পূর্ণ করে এবং জাতীয় রাষ্ট্রের বিকাশে সাহায্য করে।

লুথার ও ক্যালভিন ধর্মসংস্কারের দুই নেতা ছিলেন। ধর্মসংস্কার সংক্রান্ত তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ষোড়শ শতকের ইউরোপে জনপ্রিয় হয়।

৫৪.৬ অনুশীলনী

১। ধর্মসংস্কারের ধারণা ও রাজনৈতিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ করুন। (আপনার উত্তর ৪০ পংক্তিতে সীমিত করুন।)

.....

.....

.....

.....

.....

২। লুথারের. ধর্মসংস্কার সংক্রান্ত চিন্তাধারার মূল্যায়ন করুন। (আপনার উত্তর ৪০ পংক্তিতে সীমিত করুন।)

.....

.....

.....

.....

৫৪.৭ উত্তরমালা

অনুশীলনী— ১

১। ৫৪.২ দেখুন

২। ৫৪.২.১ - এর সাহায্য নিন

অনুশীলনী— ২

১। ৫৪.৩ - এর সাহায্যে লিখুন

২। ৫৪.৩.২ - এ উত্তর আছে

৩। ৫৪.৩.৩ - এ উত্তর পাবেন

৪। ৫৪.৩.৪ - এ দেখুন

অনুশীলনী— ৩

১। ৫৪.৪ - এর সাহায্যে লিখুন

২। ৫৪.৪.২ - এ উত্তর আছে

৩। ৫৪.৪.৩ - এ উত্তর পাবেন

৪। ৫৪.৪.৪ - এ দেখুন

৫৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। Raymond G.Gettel : *History of Political Thought*, George Allen and Unwin Ltd., London, Cheaper Edition, 1932 Chap.viii

২। W.A.Dunning : *A History of Political Theories from authar to Montesquie*, Central Book Dept., Allahabad,1996, Ch.1

৩। George H. Sabine : *A History of Political Theory*, Oxford & I.B.H. Publishing Co.,Indian Edition, 1961, Ch.18

৪। David Thomson : *Political Ideas*, Penguin Books,C.A.Waatts & Co. Ltd.,1996) ,Ch.3

৫। Amal Kumar Mukhopadhyay : *Western Political Thought*, K.P. Bagchi & Co., Calcutta,1980, Ch.4 Sec ii

৬। প্রাণগোবিন্দ দাশ ঃ *রাষ্ট্রচিন্তার ইতিবৃত্ত*, সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৯০, অধ্যায় — ৩।

৭। *রাষ্ট্রচিন্তার ধারা (ম্যাকিয়াভেলী থেকে রুশো)*, সেন্ট্রাল বুক পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯০। অধ্যায় — ৩।

৮। সুভাষ সোম ঃ *রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস*, ক্যালকাটা বুক হাউস প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৯৯৫, অধ্যায় ১২

৯। অমৃতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৯৬, অধ্যায় — ১১

একক ৫৫ ☐ ষোড়শ শতকের রাজতন্ত্র বিরোধী তত্ত্ব

গঠন

৫৫.০ উদ্দেশ্য

৫৫.১ প্রস্তাবনা

৫৫.২ ষোড়শ শতকের প্রেক্ষাপট

৫৫.৩ রাজকীয় একচ্ছত্রবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ামূলক তত্ত্বসমূহ

৫৫.৩.১ প্রটেস্ট্যান্ট একচ্ছত্রবাদ বিরোধী তত্ত্বসমূহ

৫৫.৩.২ ক্যাথলিক একচ্ছত্রবাদ বিরোধী তত্ত্বসমূহ

৫৫.৪ রাজতন্ত্র বিরোধী তত্ত্বগুলির মূল্যায়ন

৫৫.৫ সারাংশ

৫৫.৬ অনুশীলনী

৫৫.৭ উত্তরমালা

৫৫.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৫৫.০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধের ধর্মসংস্কার এবং ধর্মজনিত বিভাজন থেকে ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে গৃহযুদ্ধ, ধর্মযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক সমস্যা দেখা দিয়েছিল তার সঙ্গে আপনার পরিচয়স্থাপন এবং এই সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত রাজতন্ত্র বিরোধী তত্ত্বগুলির উপস্থাপনা এবং তাদের মূল্যায়ন। এজন্য আপনাকে জানানো হচ্ছে —

- ষোড়শ শতকের রাজনৈতিক অবস্থা;
- রাজকীয় একচ্ছত্রবাদের বিরুদ্ধে রচিত তত্ত্বসমূহ এবং
- সেই তত্ত্বগুলির মূল্যায়ন।

৫৫.১ প্রস্তাবনা

ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে ইউরোপে যে ধর্মসংস্কার আন্দোলন হয়েছিল, তার মূল উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় অন্যায় ও অবিচার থেকে সমাজকে রক্ষা করা এবং ধর্মের ওপর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বস্থাপন। এই সংস্কার আন্দোলন থেকে প্রটেস্ট্যান্ট গোষ্ঠী জন্মলাভ করে এবং ক্যাথলিক-প্রটেস্ট্যান্ট বিরোধ ষোড়শ শতকের

দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপের রাজনৈতিক মঞ্চে গুরুত্ব লাভ করে। রাজা যে ধর্মীয় গোষ্ঠীর সমর্থক, তার বিরোধী গোষ্ঠীর ওপর চলতে থাকে অত্যাচার। এ থেকে জন্ম নেয় রাজনৈতিক বিরোধ ও সংঘর্ষ। অর্থনৈতিক কারণ ও বাণিজ্যিক স্বার্থ যুক্ত হয়ে বিরোধ চরমাকার নেয়। ধর্মযুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ ও অস্থিরতা শান্তির পরিবেশকে বিঘ্নিত করে।

ইংল্যান্ডে প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম রানীর সমর্থন লাভ করে। ফলে ক্যাথলিকরা শাস্তি পায়। স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ ছিলেন ক্যাথলিক ধর্মের সমর্থক। বাণিজ্যিক স্বার্থ ও ধর্মীয় গোঁড়ামি উভয়কে কেন্দ্র করে ইংল্যান্ড ও স্পেনের যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে স্পেনীয় নৌবহর অর্মাডার পতন ঘটে। নেদারল্যান্ডের রাজনীতিতেও এ সময় রাজনৈতিক বিরোধ চলেছিল। নেদারল্যান্ড স্পেনের ক্যাথলিক রাজার শাসনাধীন ছিল। প্রটেস্ট্যান্টরা নানাভাবে নিগৃহীত হতে থাকে। প্রটেস্ট্যান্টদের নেতৃত্বে নেদারল্যান্ডের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয় এবং অবশেষে নেদারল্যান্ড স্পেনীয় শাসনমুক্ত হয়। আয়ারল্যান্ড ছিল ক্যাথলিক প্রধান দেশ। তারা ইংল্যান্ডের রানী এলিজাবেথের প্রটেস্ট্যান্ট প্রীতিতে সন্তুষ্ট ছিল না। ক্যাথলিক পোপ ও স্পেনের রাজার সাহায্যে তারা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। কঠোরভাবে এই বিদ্রোহ দমন করে আয়ারল্যান্ডকে ইংল্যান্ড তার আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করে। ফ্রান্সের শাসকও ছিলেন ক্যাথলিক ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। সেখানে প্রটেস্ট্যান্ট হুগোনটরা সংখ্যায় ও গুরুত্বে বাড়তে থাকে। ফলে দেখা দেয় ক্যাথলিক হুগোনট বিরোধ। ম্যাটল্যান্ডেও রানী ছিলেন ক্যাথলিক। সেখানেও ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট প্রেসবিটারিয়ানদের সংঘর্ষ চলেছিল।

এই অশান্ত আবহাওয়ায় পুরোনো খ্রীষ্ট্রীয় নিষ্ক্রিয় আনুগত্যের তত্ত্বের বদলে রাষ্ট্রবিরোধিতার তত্ত্ব প্রাধান্যলাভ করে। ফ্রান্স,-স্কটল্যান্ড ও নেদারল্যান্ড — এই তিনটি ক্যাথলিক শাসক শাসিত প্রটেস্ট্যান্টরা রাজতন্ত্রবিরোধী তত্ত্বের নির্মাতা। ক্যাথলিক শাসক থাকলেও স্পেন ও ফ্রান্সে কিছু ক্যাথলিক লেখক রাজতন্ত্রবিরোধী তত্ত্ব প্রচার করেন। এঁরা সকলেই প্রতিসংস্কারবাদী ছিলেন এবং ক্যাথলিক ধর্মের পুরোনো গৌরব ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। জেস্যুইট নামে এঁরা পরিচিত। তবে এঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নৈতিক এবং এঁরা রাজার ওপর চার্চের শাসন সমর্থন করেন।

৫৫.২ ষোড়শ শতকের প্রেক্ষাপট

ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধকে ধর্মীয় আলোড়ন, ধর্মসংস্কার এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে শক্তিশালী করার অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বৈশিষ্ট্য হল ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নানা বিরোধ, ধর্মযুদ্ধ থেকে গৃহযুদ্ধ সংশয়, সংকট এবং আন্তর্জাতিক নানা সমস্যা। ঘটনাবহুল ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নানা বিরোধ ও সংকটের মধ্যে ধর্মজনিত বিভাজন গুরুত্বলাভ করে এবং রাজার একচ্ছত্র কর্তৃত্ব এই সময় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়।

লুথার ও ক্যালভিনের ধর্মসংস্কার আন্দোলন ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রশ্ন উপস্থাপিত করার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় মতবিরোধকে কেন্দ্র করে পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক বিরোধ দেখা দেয়। ১৫৬৪ সালে ক্যালভিনের মৃত্যুর বছরই নানা ঘটনা ও নানা প্রভাব নাটকীয় ইতিহাসের সূচনা করে। ধর্মবিরোধের সঙ্গে যুক্ত হয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিরোধ। ব্রিটেন, স্পেন, ফ্রান্স, স্কটল্যান্ড, নেদারল্যান্ডের রাজনৈতিক অবস্থা অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে।

স্পেনে রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ এবং ইংল্যান্ডে রানী এলিজাবেথ উভয়েই চরম রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপনে সক্ষম হন। তাঁরা জাতীয় মনোভাবের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। তাই এই দেশ দুটিতে কোন গৃহযুদ্ধ ঘটেনি। কিন্তু ফ্রান্স, স্কটল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডের অবস্থা সুস্থির ছিল না। তবে ইংল্যান্ডেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসন্তোষ ছিল, চরম বেকারত্বের বিরুদ্ধে কৃষক ও শ্রমিক বিদ্রোহ তীব্র আকার নিয়েছিল। স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধ ও ক্ষতি জাতীয় জীবনকে বিপর্যস্ত করে। ১৫৫৮-১৬০৩ সালের মধ্যে ধর্মসমস্যাও প্রকট হয়। রানী এলিজাবেথ প্রটেস্ট্যান্টদের সমর্থন জানাতে থাকেন এবং ক্যাথলিকদের শাস্তি দেন। পোপের নেতৃত্বে ক্যাথলিকরা তাদের পুরনো ক্ষমতা উদ্ধারের জন্য প্রতিসংস্কার আন্দোলনে নামে। স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ ছিলেন ক্যাথলিক ধর্মের গোঁড়া সমর্থক। তাঁর ধর্মীয় গোঁড়ামি ও বাণিজ্যিক স্বার্থের সঙ্গে ইংল্যান্ডের রানী এলিজাবেথের সংঘাত থেকে যুদ্ধ ঘটে। ইংল্যান্ড ও স্পেনের যুদ্ধ প্রটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক যুদ্ধ হিসাবে দেখা ঠিক নয়, উভয় রাষ্ট্রের বাণিজ্যিক ও আর্থিক লড়াই ছিল আসল কারণ। আমেরিকায় স্পেনের বাণিজ্যিক অধিকার স্থাপনে বাধা দেয় ইংল্যান্ড। তাছাড়াও স্পেন-অধিকৃত নেদারল্যান্ডের বিপ্লবীদের ইংল্যান্ড অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে। ইংল্যান্ড ও স্পেনের যুদ্ধে স্পেনীয় নৌবহর আর্মাডার পরাজয় ইউরোপীয় রাজনীতিতে স্পেনের প্রতিপত্তির অবসান ঘটায় এবং নেদারল্যান্ডের স্বাধীনতার সুযোগ করে দেয়। ইংলন্ড ও আয়ারল্যান্ডের বিরোধও ছিল এই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আয়ারল্যান্ডের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ছিল ক্যাথলিক। তারা ইংল্যান্ডের প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মপ্রীতি মেনে নিতে পারেনি। ক্যাথলিক পোপ ও স্পেনের রাজার সহায়তায় ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আয়ারল্যান্ড ১৫৭৯ এবং ১৫৯৮ সালে দুটি বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহ ইংল্যান্ড কড়াভাবে দমন করে এবং আয়ারল্যান্ড ইংল্যান্ডের আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য হয়। এলিজাবেথের যুগে ইংল্যান্ডে শিল্পবাণিজ্যের প্রসার ঘটে, নৌশক্তি ও বাণিজ্যশক্তি বৃদ্ধির ফলে বহির্বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বিস্তার হয়, জাতীয় রাষ্ট্রের সম্বন্ধে সচেতনতা বাড়ে এবং সামন্ত ও যাজকদের ওপর ব্যবসায়ী তথা বুর্জোয়াদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংল্যান্ডে এলিজাবেথের যুগে স্পেন, নেদারল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ডের রাজনৈতিক পরিবর্তন সূচিত হয়।

স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ স্পেন ও অধিকৃত নেদারল্যান্ডে চরম সার্বভৌম রূপে শাসন করতে থাকেন, প্রটেস্ট্যান্টদের নিঃশেষ করতে থাকেন এবং ক্যাথলিক ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ইংলন্ডের প্রটেস্ট্যান্টপন্থী রানী এলিজাবেথের সঙ্গে স্পেনের রাজার বিরোধ, যুদ্ধ ও স্পেনীয় নৌবহর আর্মাডার পরাজয়ের কথা আগেই বলা হয়েছে। নেদারল্যান্ডে দ্বিতীয় ফিলিপ স্পেনের মত স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। স্বৈরাচারিতার বিরুদ্ধে

এবং স্বাধীনতার সমর্থনে নেদারল্যান্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে অভিজাত শ্রেণী দ্বারা পরিচালিত আন্দোলন দেখা যায়। দ্বিতীয় ফিলিপ অলভার ডিউকের নেতৃত্বে স্পেনীয় সৈন্য পাঠিয়ে নেদারল্যান্ডের অশান্ত অঞ্চলগুলিকে ঠান্ডা করার পরিচালনা নেন। ফলে গৃহযুদ্ধ ও আন্দোলন জোরদার হয় এবং এগুলির নেতৃত্ব দেন ক্যালভিনপন্থী প্রটেস্ট্যান্টরা। নেদারল্যান্ডের জনগণের মধ্যে এই মতবাদ শক্তিশালী ছিল। রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণু মনোভাবের ফলে সমঝোতা অসম্ভব হয়। ১৫৮১ সালে নেদারল্যান্ডের উত্তরাঞ্চল (যেখানে প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মের প্রভাবে বেশি) রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে। নেদারল্যান্ডের বিদ্রোহ জাতীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা ও স্বৈরাচারিতা বিরোধিতার উদাহরণ।

ফ্রান্সে ক্যাথরিন ডি মেডিকি তাঁর দুর্বল পুত্রের হয়ে কর্তৃত্ব হাতে নেন এবং ম্যাকিয়াভেলির পথে তাঁর ক্যাথলিক ধর্মের প্রীতিকে কাজে লাগিয়ে শাসন করতে থাকেন। রাজা প্রথম ফ্রান্সিস ও রাজা দ্বিতীয় হেনরির আমলে প্রটেস্ট্যান্ট হুগোনটরা, কঠোর শাস্তি সত্ত্বেও সংখ্যায় বাড়তে থাকে। ক্যালভেনীয় শিক্ষা অনুসারে প্রটেস্ট্যান্টরা প্রথম দিকে রাজার অধীনতা স্বীকার করে। কিন্তু পরে তারা উচ্চ অভিজাত শ্রেণীর সমর্থন লাভ করে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। রাজা দ্বিতীয় হেনরি ও তাঁর পুত্র দ্বিতীয় ফ্রান্সিস-এর মৃত্যুর পর দুই অভিজাতগোষ্ঠী — ক্যাথলিক গাইস এবং প্রটেস্ট্যান্ট বোরবনসদের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। ১৫৫২ থেকে ১৫৫৮ পর্যন্ত এই ক্যাথলিক-প্রটেস্ট্যান্ট বিরোধ চলে। এই বিরোধের প্রকৃতি ছিল রাজনৈতিক, ধর্মীয় নয়। ১৫৭২ সালে ফ্রান্সে বার্থলেমিউর হত্যাকান্ড সমগ্র বিশ্বকে আলোড়িত করে। ক্যাথরিন ডি মেডিকি প্রটেস্ট্যান্ট হুগোনট প্রধানদের হত্যা করে তাদের প্রাধান্য খর্ব করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সমগ্র বিশ্বে এই হত্যাকান্ড প্রটেস্ট্যান্টদের শেষ করার জন্য নিধনযজ্ঞ হিসাবে প্রতিভাত হয়। ফ্রান্সের অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশের সুযোগ নিয়ে স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ ধর্মীয় আবরণে ফ্রান্সকে নিজের অধীনস্থ করার পরিকল্পনা করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সের জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত হয় এবং প্রটেস্ট্যান্ট বোরবনদের নেতা চতুর্থ হেনরি সিংহাসনে বসেন।

স্কটল্যান্ডেও ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিরোধ মিশ্রিত ছিল। রানী মেরী অভিজাতদের মধ্যে ক্যাথলিক গোষ্ঠীকে গুরুত্ব দিতেন এবং প্রেসবিটারিয়ান (জন নক্সের সমথর্ক প্রটেস্ট্যান্ট গোষ্ঠী) অভিজাতদের বিরুদ্ধে তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্ব ব্যবহার করেন। কিন্তু তিনি তাদের বিরুদ্ধে তাঁর নিয়ন্ত্রণ প্রসারে সফল হননি। তাঁর মৃত্যুর পর চতুর্থ জেমসের রাজত্বকালে এই বিরোধ চরম হয় এবং গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি দেখা দেয়।

লুথার ও ক্যালভিনের ধর্মীয় শিক্ষা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ইউরোপের রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে পরিবর্তনের সূচনা করে। জঙ্গী মনোভাব দ্বারা চালিত হয়ে দুই ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে (ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট) বিরোধ অশান্তিজনক পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই অশান্ত আবহাওয়ায় নিষ্ক্রিয় আনুগত্যের পুরোনো আদর্শের পরিবর্তন ঘটে এবং নতুন ভাবে খ্রীষ্টীয় কর্তব্যের আদর্শ রচিত হয়, যা রাষ্ট্রবিরোধীতাকে প্রচার করে। এই প্রসঙ্গে কিছু রাজনৈতিক তত্ত্ব রচিত হয়। এরপর সেগুলির আলোচনা করা হবে। এসময় ইংল্যান্ডে রাজতন্ত্রবিরোধী রাজনৈতিক তত্ত্ব এ

সময়ে গড়ে ওঠেনি। কিন্তু ফ্রান্স, স্কটল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডের অশান্তিজনক পরিবেশে রাজতন্ত্রবিরোধী রাজনৈতিক তত্ত্ব বিকাশলাভ করে। এই তিনটি দেশে শাসকগোষ্ঠী ছিল ক্যাথলিক এবং তার বিরোধী প্রটেস্ট্যান্ট লেখকরা রাজতন্ত্রবিরোধী তত্ত্ব রচনা করেছেন। আবার স্পেনে ক্যাথলিক ধর্ম রাজশক্তির প্রাধান্য পেলেও কিছু স্পেনীয় ক্যাথলিক লেখক রাজতন্ত্রবিরোধী তত্ত্ব প্রচার করেন। একজন ফরাসী ক্যাথলিক লেখকও রাজতন্ত্রবিরোধী তত্ত্ব লেখেন। এঁরা সকলেই প্রতিসংস্কারবাদী হিসেবে ক্যাথলিক ধর্মের পুনরুদ্ধার চেয়েছিলেন।

অনুশীলনী — ১

১। ষোড়শ শতকের পশ্চিম ইউরোপের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটি আলোচনা করুন ? (আপনার উত্তর ৬০ পংক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ করুন।)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৫৫.৩ রাজকীয় একচ্ছত্রবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ামূলক তত্ত্বসমূহ

রাজকীয় একচ্ছত্রবাদবিরোধী তত্ত্ব কিছু প্রটেস্ট্যান্ট এবং কিছু ক্যাথলিক লেখক রচনা করেন। ফ্রান্স, স্কটল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডে রাজা ছিলেন ক্যাথলিক ধর্মের সমর্থক। প্রটেস্ট্যান্টদের ওপর তাই চলেছিল অত্যাচার। কিছু প্রটেস্ট্যান্ট লেখক রাজশক্তির ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ করে তাঁদের রাজতন্ত্রবিরোধী তত্ত্বে জনগণের সার্বভৌমিকতার কথা বলেন। অন্যদিকে স্পেনে ক্যাথলিক ধর্ম রাজশক্তির সমর্থন পেলেও কিছু ক্যাথলিক স্পেনীয় লেখক রাজতন্ত্রবিরোধী বক্তব্য রাখেন। তবে তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল রাজাকে পোপ ও চার্চের অনুগত করা। একজন ফরাসী ক্যাথলিক লেখকও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এঁরা সকলেই প্রতিসংস্কারবাদী হিসেবে ক্যাথলিক ধর্মের পুনরুদ্ধারে উৎসাহী ছিলেন।

৫৫.৩.১. প্রটেস্ট্যান্ট একচ্ছত্রবাদ বিরোধী তত্ত্বসমূহ

ফ্রান্সের প্রটেস্ট্যান্ট হুগোনট গোষ্ঠী প্রথম রাজার একচ্ছত্র স্বৈরাচারী অধিকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। তারা দেখে যে ইংল্যান্ডে রাজতন্ত্রের পাশাপাশি সংসদীয় শাসনের ঐতিহ্য থাকায় সেখানে একচ্ছত্রবাদ গড়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু ফ্রান্সে সংসদীয় শাসন বা বিধিবদ্ধ শাসন না থাকায় ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রাজতন্ত্র একচ্ছত্র ও স্বৈরাচারী রূপ পরিগ্রহ করে। হুগোনটরা রাজার ক্ষমতাকে সীমিতকরণ, স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির সুযোগ সুবিধা ও দাবি এবং রাজার স্বৈরাচারের বিরোধিতা সমর্থন করে।

হুগোনট আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও তত্ত্ব ফ্রান্সিস হটম্যান লিখিত ' ফ্রাঙ্কোগোলিয়া ' বইটিতে লেখা আছে।

এই বইটির মূল বক্তব্য হল জনসমর্থনই রাজার ক্ষমতার ভিত্তি। নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি ক্ষমতালাভ করেন। করধার্য ও আইন প্রণয়নের ব্যাপারে তিনি জনগণের সাধারণ সভার পরামর্শ নিয়ে চলবেন। জনগণ রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে তিনি রাজার সীমাবদ্ধতার কথা আলোচনা করেছেন।

'De Jure Magistratum in Subditas' হল একচ্ছত্রবাদের বিরুদ্ধে প্রটেস্ট্যান্টদের প্রতিবাদমূলক দ্বিতীয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থের লেখক সম্পর্কে বিতর্ক আছে। তবে মনে করা হয় যে বইটি ক্যালভিনের বন্ধু থিয়োডোর রেজা দ্বারা ছদ্মনামে লিখিত। তাঁর মতে স্বেচ্ছাচারী রাজাকে প্রতিহত করার ক্ষমতা সাধারণ নাগরিকের নেই। কিন্তু রাজার অধস্তন কর্তাদের আছে। তাঁর মতে, ধর্মরক্ষার জন্যই রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা প্রয়োজন।

তৃতীয় বইটি হল 'Vindicae Contra' এই বইটির রচয়িতা সম্বন্ধে কোন ঐকমত্য নেই। এই বইটি তৎকালীন যুগের বিপ্লবী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বইটি ফ্রান্স ছাড়াও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে গণতান্ত্রিক চিন্তার প্রসার ঘটায়। রাজার সীমাবদ্ধতার পক্ষে এই বইয়ে জোরালো যুক্তি উপস্থিত করা হয়েছে।

Vindicae অনুসারে রাজা, ঈশ্বর ও জনগণের মধ্যে সমাজশাসনের প্রশ্নে এক ধরনের চুক্তি হয় এবং চুক্তি অনুসারে ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট সমাজের গঠন, পরিচালনা ও পরিকল্পনা করেন এবং সেই পরিকল্পনা অনুসারে ঈশ্বর ও জনগণ এবং রাজা ও জনগণের সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। বইয়ে দুটি চুক্তির কথা আছে — প্রথমত, ঈশ্বরের সঙ্গে রাজা ও প্রজাদের মধ্যে চুক্তি এবং এর ফলে রাজা ও প্রজার ধর্মপালনের দায়িত্ব থাকে। দ্বিতীয়ত, রাজার সঙ্গে প্রজার চুক্তি। এই চুক্তি রাজনৈতিক, যার ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও সরকার গড়ে ওঠে, রাজার রাজনৈতিক কর্তব্য এবং প্রজাদের অধিকার ও কর্তব্য স্থিরীকৃত হয়। রাজা যতদিন সুশাসন নিশ্চিত করবেন, অর্থাৎ চুক্তি মেনে চলবেন, ততদিন প্রজারা তাঁর আনুগত্য দেখাবেন। ধর্ম বিদ্রোহী রাজার বিরুদ্ধে অর্থাৎ চুক্তিভঙ্গকারী রাজার বিরুদ্ধে প্রজাদের বিদ্রোহের অধিকার আছে। ধর্মীয় মত এবং রাজার ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতার কথা থাকলেও বইটিতে আইন সমর্থিত চুক্তি, অর্পিত ক্ষমতার তত্ত্ব, রাজার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কথা ইত্যাদি প্রাধান্য পেয়েছে। জনগণের নিরাপত্তা রক্ষাই যে রাজার প্রধান কর্তব্য, নিরাপত্তা রক্ষায় রাজার সাফল্যের ওপরই যে জনগণের আনুগত্য নির্ভর করে এবং রাজার ক্ষমতার পেছনে যে জনসম্মতি থাকা প্রয়োজন, তা এই বইটিতে গুরুত্ব সহকারে বিবৃত হয়েছে। এই বই অনুসারে, প্রজাকল্যাণই রাজার অস্তিত্বের কারণ। রাজা সমাজের জন্য যে কাজ করেন তার বিবেচনা করেই জনগণ রাজাকে মেনে নেয়। রাজা ঠিকমত কাজ না করলে প্রজারা বিরোধিতা করবে। এই বক্তব্যগুলির মধ্যে উপযোগিতা তত্ত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। তাছাড়াও শাসনকে আইনের অধীনে আনা এবং আইনের প্রতি শাসকের শ্রদ্ধা উদ্রেক করানোও বইটির লক্ষ্য। রাজার বিরোধীতা ও প্রতিরোধই বইটির মূল বক্তব্য।

স্কটল্যান্ডে জন নক্সের সমর্থকরা রাজকীয় একচ্ছত্রবাদের প্রতিবাদ করেন। তাঁদের মতে, রাজার সঙ্গে প্রজার সম্বন্ধ কর্তব্যের চুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং কর্তব্যচ্যুত রাজা প্রজাদের আনুগত্য পেতে পারে না। জন নক্সের নানা লেখা ষোড়শ শতকে খুব প্রভাব বিস্তার করেছিল, তবে সেগুলিতে রাজনীতির সুসংবদ্ধ আলোচনা ছিল না। স্কটিশ রেফরমেশনের লেখক জর্জ বুচানন তাঁর 'On Sovereign Power Among The Scots' গ্রন্থে

বলেছেন যে সমাজই রাজার ক্ষমতার উৎস, সমাজের আইনানুসারে রাজার ক্ষমতা পরিচালিত হবে এবং রাজার কর্তব্য পালনের ওপর প্রজার আনুগত্য নির্ভর করে। তিনি রাজা ও স্বৈরাচারী শাসকের পার্থক্য করেন। প্রচীনকালের আইনহীন প্রাকৃতিক অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য সমাজ ও সরকার সৃষ্ট হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে, সমাজজীবনের অন্যতম প্রেরণা হল স্বার্থরক্ষার প্রবণতা এবং প্রকৃতি বা ঈশ্বর প্রদত্ত সংঘমূলক প্রবৃত্তি। সমাজে টিকে থাকার জন্য প্রয়োজন ন্যায়বিচার। এজন্য রাজার কর্তব্য হল ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মানুষ জানে যে আইন দ্বারাই ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব। শাসকরা শুরুতে অসীম ক্ষমতাধর হলেও ধীরে ধীরে আইনের অধীন হয়েছে। আইনের সৃষ্টিকর্তা হল জনগণ। তারা প্রতিনিধিমূলক সভায় আইন প্রণয়ন করে। এই সভা বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত। আইনের ব্যাখ্যাকর্তা, তাঁর মতে, স্বাধীন বিচারকরা, রাজা নয়। ফলে রাজার আইনসংক্রান্ত বিশেষ ক্ষমতা নেই। বরং ধর্ম ও যুক্তিভিত্তিক জীবনধারা প্রতিষ্ঠিত করে তাঁকে জনগণের সামনে উচ্চ আদর্শ স্থাপন করতে হবে।

এইভাবে রাজার চরিত্রায়নের পরে তিনি স্বৈরাচারী শাসক সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য রাখেন। স্বৈরাচারী শাসক হলেন এমন একজন রাজা যিনি জনগণের সম্পত্তির ভিত্তিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নন বা ন্যায়বিচার দ্বারা শাসন করেন না। প্রথম ক্ষেত্রে তিনি বেআইনী ও সকলের শত্রু এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তিনি আইনভঙ্গকারী, কারণ সমাজচিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে আইনের দ্বারাই ন্যায়বিচার প্রকাশিত হয়। ধর্মশাস্ত্রে রাজার প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যে শিক্ষা দেওয়া হলেও বুচানন স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কথা বলেন।

রাজাও জনগণের সম্পর্ককে বুচানন চুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। জনগণ উত্তরাধিকার সূত্রে রাজার শাসন মেনে নেয়। কিন্তু এটাও ঠিক নয় যে সেই রাজাকে কোন ভাবে বিচার না করে তারা মেনে নেবে। এ প্রসঙ্গে আইন ও ন্যায়বিচারের প্রতি অঙ্গীকারকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। যে কোন পক্ষ (রাজা বা জনগণ) চুক্তি না মানলে চুক্তি বিনষ্ট হয় এবং উভয় পক্ষের সম্বন্ধ ভেঙ্গে যায়। স্বৈরাচারের দ্বারা জনগণের মধ্যে আইনের শাসন চালু করা যায় না।

রাজার বিচার জনগণ কিভাবে করবে সেই প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর বুচানন দেননি। তিনি বলেছেন যে সমগ্র জনগণ বিচার করবে। জনগণের মধ্যে বিভাজন হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ এই দায়িত্ব নেবে। যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ভয়ে রাজার পক্ষ নেয়, তাহলে তারা কুনাগরিক বলে পরিগণিত হবে। সক্ষেত্রে সুনাগরিকরা, যারা সবসময়েই স্বাধীনতার পক্ষে, তারা সিদ্ধান্ত নেবে। এই ধরনের সিদ্ধান্ত বুচাননের সমগ্র তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগকে অসম্ভব করে তোলে। সুনাগরিক কারা, তার কোন মানদন্ড তিনি দেননি। ফলে তত্ত্বটি মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

নেদারল্যান্ডের স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে অ্যালথুসিয়াস ষোড়শ শতকের শেষে একচ্ছত্রবাদ বিরোধী বক্তব্য রাখেন। নেদারল্যান্ডের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আদর্শ, যার ভিত্তিতে জনগণ স্পেনের শাসন থেকে নিজেদের মুক্ত করতে চাইছিল তার প্রতি অ্যালথুসিয়াস বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁর কাজ এবং তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য দ্বারা সহানুভূতি জানান, নেদারল্যান্ডের অবস্থার পটভূমিতে তাঁর 'Systematic Politics Confirmed by

Examples from Sacred and Profane History' পুস্তকটি লিখিত। তাঁর চিন্তাধারায় উল্লেখযোগ্য হল সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন ব্যাখ্যায় চুক্তিতত্ত্বের প্রয়োগ, সার্বভৌমিকতার স্বচ্ছ ধারণা। জনগণের হাতে সার্বভৌমিকতা অর্পণ এবং জনগণ সম্পর্কে পরিষ্কার বক্তব্য।

অ্যালথুসিয়াসের মতে, যে কোন সংঘমূলক জীবনই চুক্তির ভিত্তিতে গঠিত হয় এবং সেই জীবনে থাকেকিছু আইন যার দ্বারা সংঘ চালিত হয়। সদস্যদের মধ্যে থাকে আদেশ ও আনুগত্যের সম্বন্ধ। মানুষের সমাজে নানা ধরনের সংঘ আছে — পরিবার থেকে ক্রমশ জটিলতর রূপ ধারণ করতে করতে সেগুলি রাষ্ট্রে পরিণত হয়। রাষ্ট্র হল একটি সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান, যেখানে কিছু শহর ও প্রদেশ একত্রিত হয়ে একটি সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। অ্যালথুসিয়াসের মতে, রাষ্ট্রের সীমানায় বসবাসকারী ব্যক্তিরা নয়, শহর ও প্রদেশগুলি, যারা চুক্তির পক্ষে তারাই রাষ্ট্রের সদস্য। সার্বভৌম ক্ষমতা হল রাষ্ট্রের সদস্যদের আধ্যাত্মিক ও শারীরিক কল্যাণসাধনের চূড়ান্ত ক্ষমতা। এই ক্ষমতা সামগ্রিকভাবে জনগণের ওপর ন্যাস্ত — প্রতিটি ব্যক্তি এককভাবে নয়, সকল ব্যক্তি মিলিতভাবেই এই ক্ষমতা ভোগ করে। সার্বভৌমিকতার প্রতিনিধি হিসাবে রাজা ও ম্যাজিস্ট্রেটরা কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেন। তাঁরা একক ব্যক্তির ওপর যে ক্ষমতা প্রয়োগ করুন না কেন, সামগ্রিকভাবে জনগণের অধীন, কারণ তারাই সার্বভৌম। এই সার্বভৌমিকতা জনগণের কোন একজনের হাতে স্থানান্তরিত করা যায় না। সুতরাং রাষ্ট্রের কোন একজন অফিসার বা রাজা কেউই এই ক্ষমতার অধিকারী নয়। যে আইন সার্বভৌম দ্বারা অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে জনগণ দ্বারা প্রণীত তাই তাঁরা প্রয়োগ করতে বাধ্য। অর্থাৎ, জনগণ একদিকে শাসকের ক্ষমতার উৎস, অন্যদিকে শাসকের ক্ষমতার ক্ষেত্রে বাধা।

অ্যালথুসিয়াস রাষ্ট্রের মধ্যে দুধরনের শাসনের কথা বলেছেন — জনপ্রতিনিধি (ephors) এবং প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট। বিভিন্ন শহর ও প্রদেশে বিভিন্ন ব্যক্তি ও ব্যক্তিসংসদ সমগ্র জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে সমগ্র জনগণের অর্থাৎ সার্বভৌম ইচ্ছার ভিত্তিতে প্রধান ম্যাজিস্ট্রেটকে নিয়ন্ত্রণ করেন। প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট হলেন রাজা, যিনি জনগণের শাসক এবং আইনের ভিত্তিতে তাদের স্বার্থ ও নিরাপত্তাবিধানের ব্যবস্থা করেন। চুক্তির ভিত্তিতে তিনি শাসন করেন। দেশের মৌলিক আইন ভঙ্গ করলে স্বৈরাচারী শাসকে পরিণত হন। সেক্ষেত্রে জনগণ তাঁর প্রতি আনুগত্যের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়। ফলে তখন তারা রাজার বিরোধিতার অধিকার লাভ করে। এই ক্ষমতা অবশ্য সার্বভৌম হিসাবে সমগ্র জনগণ জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে পারে। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই প্রতিরোধের অধিকার ভোগ করে এবং স্বৈরাচারী শাসককে বিতাড়িত করতে বা হত্যাও করতে পারে। ফলে দেশের আইন রক্ষিত হয়।

এছাড়া তিনি সরকারের কাজ সম্বন্ধেও লিখেছেন। সামাজিক সংগঠনের উদ্দেশ্য হল আধ্যাত্মিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দুইই। তাই সরকারের কাজ হল:—

১। ধর্ম, নীতিও শিক্ষাব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ।

২। সামাজিক ব্যবহারের জন্য সাধারণ নিয়ম, যাতে শাস্তির কথা থাকবে, তার প্রণয়ন।

৩। সাধারণ কল্যাণবৃদ্ধির জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য, মুদ্রাব্যবস্থা ও জনব্যবস্থা, জনসম্পত্তি, কর পরিচালনা, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ইত্যাদি।

৪। রাষ্ট্রীয় চার্চের রক্ষণাবেক্ষণ।

৫৫.৩.২ ক্যাথলিক একচ্ছত্রবাদ বিরোধী তত্ত্বসমূহ

চার্চের অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে যেমন সংস্কার আন্দোলন এবং প্রটেস্ট্যান্ট মত গড়ে উঠেছিল, তেমনি পোপের নের্তৃত্বে চার্চের পুরোনো ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য গড়ে উঠেছিল ইগনাসিয়াস লায়লা প্রতিষ্ঠিত Society of Jesuits বা জেস্যুইটদের আন্দোলন, যা প্রতিসংস্কার আন্দোলন নামে পরিচিত। এই জেস্যুইট আন্দোলন জঙ্গী প্রটেস্ট্যান্ট আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য সংগঠন গড়ে তোলে এবং নিজেদের ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে মিশ্রিত করে। তবে জেস্যুইটরাও প্রটেস্ট্যান্ট বিপ্লবীদের মতই একচ্ছত্র রাজতন্ত্রের বিরোধিতা করেছে এবং নিজেদের দেশের রাজতন্ত্রকেও সমর্থন করেনি, যদিও শাসকরাও ক্যাথলিক ছিলেন। জেস্যুইট আন্দোলনের প্রবক্তাদের মধ্যে স্পেনের চিন্তাবিদ ডি মারিয়ানা, ফ্রান্সিসকো সুয়ারেজ এবং ফরাসী তাত্ত্বিক বেলারমিনের নাম উল্লেখযোগ্য।

ডি ম্যারিয়ানার 'On Kingship and the Education of a King' বইটি রাজা তৃতীয় ফিলিপকে উৎসর্গ করা হয়েছে এবং এখানে রাজা কিভাবে রাজ্য পরিচালনা করবেন, তার ইঙ্গিত আছে। প্রাকৃতিক অবস্থা, যেখানে মানুষ বন্য জন্তুর মত প্রবৃত্তিতাড়িত হয়ে খাদ্যসন্ধান ও বংশবৃদ্ধির প্রচেষ্টায় নিযুক্ত থাকত। সেখান থেকে ম্যারিয়ানা শুরু করেন। তখন কোন আইন বা কর্তৃত্ব ছিল না, তবে প্রকৃতি খাদ্য, পানীয় ও আস্তানার যোগান দিত ফল, নদীর জল ও গুহার মধ্য দিয়ে। মিথ্যা কথা, প্রতারণা বা উচ্চাশা তখন অজানা ছিল; ব্যক্তিগত সম্পত্তিও ছিল না। কিন্তু মানুষের চাহিদা পশুর তুলনায় উচ্চতর ও অনেক বেশী বৈচিত্র্যপূর্ণ। তাছাড়াও প্রাণীজগৎ ও প্রাকৃতিক শক্তির বিপদ থেকে নিজেকে ও নিজের সন্তানকে রক্ষা করার ক্ষমতাও তার কম। এই অসুবিধা দূর করার স্বার্থে মানুষ নিজেদের সংঘবদ্ধ করে এবং একজন নেতার বশ্যতা স্বীকার করে। এইভাবে পৌর সমাজ গড়ে ওঠে। সরকারের প্রাচীনতম ও প্রাকৃতিক রূপ হল বিজ্ঞ একজনের শাসন। মানুষের মধ্যে প্রথমে আইন বলে কিছু ছিল না। কিন্তু পরে মানুষের কুপ্রবৃত্তি দমনের জন্য এবং রাজার নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য আইন গড়ে ওঠে। শুরুতে আইনের সংখ্যা ছিল কম এবং তা ছিল সরল প্রকৃতির। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আইনের জটিলতা বৃদ্ধি পায়। আইন হল সরকারের ভিত্তি। প্রাকৃতিক রাজতন্ত্র থেকে অন্যান্য ধরনের কর্তৃত্ব সম্বন্ধেও তিনি বক্তব্য রেখেছেন। রাজতন্ত্র তাঁর প্রিয় ছিল। গণতন্ত্রকেও তিনি সমর্থন করেছেন। কিন্তু বলেছেন যে অনেকের শাসনে সব সময় কম জ্ঞানীরাই প্রাধান্য পায়, কারণ তারা সংখ্যায় বেশি। আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্রের এই অসুবিধা নেই। রাজতন্ত্র দক্ষ শাসনব্যবস্থা হিসেবেও স্বীকৃত। কিন্তু তা আবার স্বৈরাচারী শাসনে পরিণত হতে পারে। রাজতন্ত্র প্রজার বদলে রাজার স্বার্থে পরিচালিত হলে স্বৈরাচারী রূপ নেয়। এই ধরনের শাসনের প্রসঙ্গে তিনি স্বৈরাচারবিরোধী তত্ত্বের

অবতারণা করেন এবং স্বৈরাচারের প্রতিরোধের কথা বলেন। প্রতিরোধের কারণগুলি হল : —

১। জনগণের সার্বভৌমকিতা,

২। ইতিহাসে প্রকাশিত মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞান বা common sense।

জনগণ-প্রদত্ত অধিকার হল রাজার ক্ষমতার উৎস। কিন্তু কিছু অধিকার রাজাকে দিলেও জনগণ বেশিটাই নিজেদের কাছে রেখে দেয়, যেমন কর আরোপ, আইনপ্রণয়ন, সিংহাসনে আরোহন সংক্রান্ত আইন, রাজস্ব ও ধর্ম। ম্যারিয়ানা জনগণকে রাজার উর্দ্ধে স্থান দেন। তিনি বলেছেন যে জনগণ দ্বারা স্বৈরাচারী রাজার শাস্তি ও মুন্ডচ্ছেদনের উদাহরণ পৃথিবীর সব দেশেই দেখা যায়। ইতিহাস থেকে তাই তিনি এই সর্বজনীন বিশ্বাসের কথা বলেছেন যে রাজা যদি রাষ্ট্রকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যান, তাহলে জনগণ তাঁকে সরিয়ে দিতে পারবে। জনগণের সভা প্রথমে রাজার সংস্কারের চেষ্টা করবে। রাজা তা না মানলে জনগণ চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেবে। জনগণের সভা তার মত প্রকাশ করার পরই ব্যক্তিগতভাবে প্রজা রাজার মুন্ডচ্ছেদন করতে পারবে। যদি সভা বসার অনুমতি না মেলে তাহলেও ব্যক্তি রাজাকে হত্যা করতে পারবে।

এই মত অনুসারে ব্যক্তির বিচারের ওপরই নির্ভর করে কে স্বৈরাচারী তা স্থির করা। তাই এই মত রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রতি আঘাত। কিন্তু ম্যারিয়ানা এই বক্তব্যের বিপদ সম্বন্ধে সচেতন থাকা সত্ত্বেও এই বক্তব্যকে উপযোগী মনে করেন। তাঁর মতে, রাজার জানা প্রয়োজন যে প্রজার কর্তৃত্ব তাঁর উর্দ্ধে। তাছাড়াও তিনি মনে করেন যে অত্যাচারী রাজাকে সকলের হত্যার অধিকার আছে এই বক্তব্যই রাজাকে সংযত রাখে।

রাজতন্ত্রের গঠন প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে বিশপ, অভিজাত ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত এস্টেটই দেশের মৌলিক আইনের রক্ষক এবং রাজাকে নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতাযুক্ত। এস্টেটই কর, সিংহাসন, উত্তরাধিকার ইত্যাদি স্থির করে। রাজার ক্ষমতা এস্টেট, ঈশ্বরের ইচ্ছা, জনগণের ইচ্ছা ও মৌলিক আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ।

ম্যারিয়ানা প্রটেস্ট্যান্ট রাজতন্ত্র বিরোধীদের মতই রাজার স্বৈরাচারের বিরোধিতা করেন। তবে তিনি রাষ্ট্রকে চার্চের তুলনায় ছোট বলেছেন এবং নৈতিক প্রশ্নকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। ম্যারিয়ানা প্রশাসন সংক্রান্ত বাস্তব সমস্যাও আলোচনা করেছেন। কর ব্যবস্থা, দরিদ্রের ত্রাণ ব্যবস্থা, সামরিক নীতির ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা এবং জনকল্যাণের প্রশ্নও তাঁর লেখায় আছে। তিনি যুদ্ধকে অনিবার্য এবং সাম্রাজ্য বিস্তারকে স্বাভাবিক বলেছেন। এজন্য অনেকে তাঁকে ম্যাকিয়াভেলীয় আখ্যা দিয়েছেন।

স্পেনের আর একজন ক্যাথলিক চিন্তাবিদ ফ্রান্সিসকো সুয়ারেজ চার্চকে বিশ্বব্যাপী ঐশ্বরিক প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রকে জাতীয় ও বিশেষ প্রতিষ্ঠান বলেছেন যা মানুষের প্রয়োজনে সৃষ্ট মানবিক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রকে মানুষের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে হবে এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় পোপের পরোক্ষ ক্ষমতা থাকবে বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে, রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস সমাজ এবং সমাজের মঙ্গলের জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতার ওপর পোপের নৈতিক দায়িত্ব আছে। প্রাকৃতিক আইনকে তিনি অভ্রান্ত, চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয় মনে করেন এবং তাঁর মতে এই

প্রাকৃতিক আইন ঈশ্বর সৃষ্ট। রাষ্ট্র প্রাকৃতিক আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং প্রাকৃতিক আইনই আইনের শাসন ও রাষ্ট্রসমূহের সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। সুয়ারেজ রাজনৈতিক প্রশ্নের থেকে নৈতিক প্রশ্নকে বেশি গুরুত্ব দেন। তবে রাষ্ট্রের শাসনকে অসীম ক্ষমতাধর না বলে নিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার অধিকারী বলেছেন, যা পোপের ক্ষমতা ও প্রাকৃতিক আইনের অধীন।

ফরাসী জেসুইট বেলারমিন আধ্যাত্মিক ব্যাপারে চার্চ ও পোপের প্রাধান্য এবং আধাত্মিক উদ্দেশ্যে লৌকিক কাজ করা হলে তাতেও পোপের পরোক্ষ ক্ষমতার কথা বলেছেন। তিনি বৃহৎ জাতীয় রাষ্ট্রে জনসমর্থন দ্বারা এস্টেট পরিচালিত ব্যবস্থার কথা বলেন। এই এস্টেট ব্যবস্থা রাজার ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করে এবং জনগণের প্রাকৃতিক অধিকার রক্ষা করে। তিনি রাজার ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতার কথা মানেন না। বরং মনে করেন যে রাজার অত্যাচার ও ধর্মদ্রোহিতা থেকে প্রজাদের রক্ষা করতে পারেন পোপ, যাঁর ক্ষমতা ঈশ্বরদত্ত।

রাজতন্ত্র বিরোধী তত্ত্বের উগ্রতা এবং বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর বিভিন্নতাজনিত বিরোধ থেকে রাজনৈতিক স্থায়িত্ব বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখে ষোড়শ শতকের শেষে পলিকিউজ গোষ্ঠী রাজার ক্ষমতার সমর্থনে নতুন ব্যাখ্যা দেন। তাঁরা রাজার ঐশ্বরিক অধিকার তত্ত্বের কথা বলে রাজার কর্তৃত্বকে শক্তিশালী করেন। এই পলিকিউজ গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য জাঁ বোদাঁর বক্তব্য পরবর্তী এককে আলোচিত হয়েছে।

অনুশীলনী— ২

১। ষোড়শ শতকের রাজতন্ত্র বিরোধী তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করুন? (উত্তর ৫০ পংক্তির মধ্যে হবে।)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২। ষোড়শ শতকের রাজতন্ত্র বিরোধী প্রটেস্ট্যান্ট তত্ত্বগুলি আলোচনা করুন। (উত্তর ৫০পংক্তির মধ্যে হবে।)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৩। ষোড়শ শতকের রাজতন্ত্র বিরোধী ক্যাথলিক তত্ত্বগুলির আলোচনা করুন। (উত্তর ৫০পংক্তির মধ্যে হবে।)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৫৫.৪ রাজতন্ত্র বিরোধী তত্ত্বগুলির মূল্যায়ন

রাজতন্ত্র বিরোধী লেখকদের তত্ত্বগুলির মধ্যে বিভিন্নতা দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে রচিত প্রটেস্ট্যান্ট ও জেস্যুইট চিন্তাধারার মধ্যেও কিছুটা ভিন্ন সুর লক্ষ্য করা যায়। জেস্যুইটরা নৈতিক আদর্শকে বড় করে দেখেছেন, কিন্তু প্রটেস্ট্যান্টরা মূলত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা চালিত। কিন্তু বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে কিছু মিলও খুঁজে পাওয়া যায়। সকলেই বলেছেন যে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের উৎস জনগণ, ঈশ্বর নয়। রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে রাজতন্ত্র বিরোধী তত্ত্বের সব প্রবক্তাই মানবিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন এবং রাজার কাজকেও মানবিক দৃষ্টিতে বিচার করার কথা বলা হয়। এই দিক থেকে ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্টদের মধ্যেও মতৈক্য দেখা যায়। স্বৈরাচারকে কেউই সমর্থন করেননি।

তবে রাজতন্ত্রবিরোধী তত্ত্বগুলির কিছু ত্রুটিও ছিল। জনগণ সম্বন্ধে ধারণা সেখানে অস্পষ্ট। বিভিন্ন লেখক জনগণ বলতে বিভিন্ন কথা বলেছেন। শ্রেণী, গোষ্ঠী বা এস্টেট এ প্রসঙ্গে প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু জনগণ যে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রত্যক্ষভাবে অংশীদার, সে কথা নেই। চুক্তি সম্বন্ধে ধারণাও পরিষ্কার নয়।

তবে সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও রাজতন্ত্রবিরোধী তত্ত্বের লেখকরা তাঁদের উদ্দেশ্যসাধনে কিছুটা সফল হয়েছেন। তাঁদের তত্ত্বে যে সকল বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে, যেমন প্রাকৃতিক অবস্থা, চুক্তির ভিত্তিতে সমাজ ও সরকার সৃষ্টি , জনসার্বভৌমিকতা, সেগুলি উনবিংশ শতক পর্যন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত হয়েছে। এই বিষয়গুলি গ্রহণযোগ্য হোক বা না হোক, এগুলি কেউ অস্বীকার করতে পারেনি।

পঞ্চদশ শতকের শুরুতে ধর্মীয় জগতকে গণতান্ত্রিক করার প্রচেষ্টা চলেছিল। ষোড়শ শতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক জগতকে গণতান্ত্রিক করার তত্ত্ব গড়ে ওঠে। পঞ্চদশ শতকে কনসিলিয়ার দল যেমন পোপের স্বৈরাচার নির্মূল করার কথা বলে এবং সাধারণ সভার (General Council) প্রসঙ্গ তোলে, ষোড়শ শতকে রাজতন্ত্রবিরোধী লেখকরা একইভাবে রাজার স্বৈরাচার বন্ধ করতে চায় এবং এস্টেটের হাতে ক্ষমতার প্রসঙ্গের অবতারণা করে।

রাজতন্ত্রবিরোধী তত্ত্বের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ধর্মনিরপেক্ষ অভিজাতদের হাতে ক্ষমতা প্রদান। জনগণের সার্বভৌমিকতা তত্ত্বের আড়ালে তাঁরা সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। সেই সময় সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতদের হাত থেকে কর্তৃত্ব রাজার হাতে স্থানান্তরিত হচ্ছিল এবং জাতীয় রাষ্ট্রের সম্বন্ধে সচেতনতা গড়ে উঠেছিল। মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতদের গোষ্ঠীগত প্রাধান্য খর্ব হচ্ছিল। সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতগোষ্ঠীর প্রাধান্য ফিরিয়ে আনাই ষোড়শ শতকের রাজতন্ত্রবিরোধী লেখকদের মূল উদ্দেশ্য ছিল।

ষোড়শ শতকের শেষ দিকে আইনগত বুদ্ধি, ইতিহাসবোধ ও দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা চালিত হয়ে বোডিন রাষ্ট্রচিন্তার নতুন দিক উন্মোচিত করেন। পরবর্তী এককে তারই আলোচনা হবে।

অনুশীলনী — ৩

১। রাজতন্ত্রবিরোধী তত্ত্বগুলির মূল্যায়ন করুন। (আপনার উত্তর ৪০ পংক্তির মধ্যে হবে।)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৫৫.৫ সারাংশ

ধর্মসংস্কার আন্দোলন, প্রটেস্ট্যান্ট-ক্যাথলিক বিরোধ, রাজার ধর্মগোষ্ঠী প্রীতি এবং অন্য ধর্মের লোকদের ওপর নিগ্রহ, বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যিক স্বার্থের লড়াই ইত্যাদি ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপে বিরোধপূর্ণ ও অশান্তিজনক পরিবেশ সৃষ্টি করে। ফ্রান্স, স্কটল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডে চরম সংঘর্ষ ও অস্থিরতা ঘটে। ইংল্যান্ডের সঙ্গে স্পেনের এবং আয়ারল্যান্ডের যুদ্ধ ঘটে। এই অশান্তিজনক পরিবেশে রাজশক্তির প্রতি আনুগত্যের ধারণার বদলে রাষ্ট্রবিরোধীতার আদর্শ প্রাধান্য পায়। ফ্রান্সে হুগোনট আন্দোলন, ফ্রান্সিস হটম্যানের ' ফ্রাঙ্কেগোলিয়া ' গ্রন্থ, থিয়োডোর রেজা লিখিত 'De Jure Magistratum' পুস্তক, অজ্ঞাত লেখক রচিত 'Vindiciae Contra' বই, স্কটল্যান্ডে জন নক্সের সমর্থকদের আন্দোলন, জর্জ বুচানন লিখিত 'On Sovereign Power among The Scots' গ্রন্থ, নেদারল্যান্ডে অ্যালথুসিয়াস রচিত 'Systematic Politics Confirmed by Examples from Sacred and Profane History' পুস্তক ইত্যাদি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ফ্রান্স, স্কটল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডে রাজশক্তি ছিল ক্যাথলিক শাসকের হাতে এবং এই রাজতন্ত্রবিরোধী বক্তব্যযুক্ত গ্রন্থগুলির লেখকরা হলেন প্রটেস্ট্যান্ট। তবে ক্যাথলিক শাসক-শাসিত স্পেন ও ফ্রান্সে ক্যাথলিক লেখকরাও রাজতন্ত্রবিরোধী তত্ত্ব লেখেন।

স্পেনে ডি মারিয়ানা , ফ্রান্সিসকো সুয়ারেজ এবং ফ্রান্সে বেলারমিন এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই ক্যাথলিক লেখকরা জেস্যুইট বলে পরিচিত। এরাঁ প্রতিসংস্কারবাদী ছিলেন এবং এঁদের উদ্দেশ্য ছিল রাজশক্তিকে চার্চের অধীনে নিয়ে আসা। এঁরা পোপের ঐশ্বরিক ক্ষমতার কথা বলে রাজাকে সীমাবদ্ধ করতে চান। নৈতিক আদর্শই এঁদের লেখায় প্রাধান্য পেয়েছে।

রাজতন্ত্রবিরোধী তত্ত্বগুলি ষোড়শ শতকের বিভিন্ন লেখক দ্বারা রচিত এবং তাঁদের তত্ত্বের মধ্যেও বিভিন্নতা দেখতে পাওয়া যায়। তবে সবাই বলেছেন যে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের উৎস জনগণ, ঈশ্বর নয় এবং সবাই স্বৈরাচার বিরোধী ছিলেন। এই জনগণ সম্বন্ধে কিন্তু স্পষ্ট ধারণা তাঁরা দিতে পারেনি। এস্টেট, গোষ্ঠী বা শ্রেণীকেই তাঁরা জনগণ বলেছেন, যারা অভিজাত শ্রেণীর প্রতিনিধি। এই তত্ত্ব ছিল ষোড়শ শতকের সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতদের প্রাধান্য প্রচারের প্রচেষ্টা এবং জাতীয় স্তরে রাজার ধারণার বিরোধীতা।

৫৫.৬ অনুশীলনী

১। ষোড়শ শতকের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট কেমন ছিল ? (উত্তর ২৫ পংক্তির মধ্যে দেওয়া চাই।)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২। রাজকীয় একচ্ছত্রবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ামূলক তত্ত্বগুলির পরিচয় দাও। (আপনার উত্তর ৩০ পংক্তির মধ্যে দিন।)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৩। রাজকীয় একচ্ছত্রবাদের বিরুদ্ধে তত্ত্বগুলির মূল্যায়ন করুন। (আপনার উত্তর ২৫ পংক্তির মধ্যে দিন।)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৫৫.৭ উত্তরমালা

অনুশীলনী — ১

১। ৫৫.২ দেখুন

অনুশীলনী — ২

১। ৫৫.৩ , ৫৫.৩.১ , ৫৫.৩.২ - এ উত্তর আছে।

২। ৫৫.৩.১ - এ উত্তর আছে।

৩। ৫৫.৩.২ - এ উত্তর আছে।

অনুশীলনী — ৩

১। ৫৫.৪ - এ উত্তর দেখুন।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

১। ৫৫.২ - এ ডত্তর দেখুন।

২। ৫৫.৩ , ৫৫.৩.১ এবং ৫৫.৩.২ - এ উত্তর আছে।

৩। ৫৫.৪ - এ দেখুন।

৫৫.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। W.A. Dunning, *A History of Political Theories, From Luther to Montesquien*, Central Book Deprt., Allahabad 1970 Ch. II & IV.

২। R.G Gettel, *A History of Political Thought*, George Allen & Unwin Ltd. London, Cheaper Edition, 1932, Ch. 9

৩। G.H. Saine, *A History of Political Thought*, Oxford and IBH Publishing Co., Indian Ed., 1961, Ch.19

৪। W. Ebenstein, *Great Political Thinkers*, Oxford & IBH Publishing Co., 1966, Ch. 12

৫। H.J. Laski, *The Rise of European Liberalism*, Unwin Books, London, 1962, Ch. 1

৬। দেবাশিষ চক্রবর্তী, *রাষ্ট্রচিন্তার ধারা, ম্যাকিয়াভেলি থেকে রুশো*, সেন্ট্রাল বুক পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯০, অধ্যায় ৪।

একক ৫৬ □ বোডিন

গঠন

৫৬.০ উদ্দেশ্য

৫৬.১ প্রস্তাবনা

৫৬.২ বোদাঁ বা বোডিনের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সময়

৫৬.৩ বোদাঁর রাষ্ট্রচিন্তার বৈশিষ্ট্য

৫৬.৪ বোদাঁর রাষ্ট্রচিন্তার পরিচয়

৫৬.৪.১. রাষ্ট্র সম্বন্ধে ধারণা

৫৬.৪.২. সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণা

৫৬.৪.৩. রাষ্ট্র ও সরকারের রূপ

৫৬.৪.৪. নাগরিকতার প্রশ্ন

৫৬.৪.৫. বিপ্লব

৫৬.৪.৬. অন্যান্য বক্তব্য

৫৬.৫ মূল্যায়ন

৫৬.৬ সারাংশ

৫৬.৭ অনুশীলনী

৫৬.৮ উত্তরমালা

৫৬.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৫৬.০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল ষোড়শ শতকের ফ্রান্সের রাষ্ট্রচিন্তাবিদ বোডিনের রাষ্ট্রচিন্তার সঙ্গে আপনাদের পরিচয় স্থাপন। এই উদ্দেশ্যে এখানে আলোচিত হয়েছে —

- বোডিনের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সময়;
- বোডিনের রাষ্ট্রচিন্তার বৈশিষ্ট্য;
- বোডিনের রাষ্ট্রচিন্তার বিভিন্ন দিক;
- বোডিনের রাষ্ট্রচিন্তার মূল্যায়ন।

৫৬.১ প্রস্তাবনা

ষোড়শ শতকের ফ্রান্স এক সংকটকালীন অবস্থার মুখোমুখি হয়। ধর্মসংস্কারের সময় থেকে ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্টদের মধ্যে বিরোধ বৃদ্ধি পায় এবং তা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ধর্মনিরপেক্ষ রাজারা হয় ক্যাথলিক নয় প্রটেস্ট্যান্টদের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে থাকেন। ক্যাথলিক রাষ্ট্রে প্রটেস্ট্যান্টরা এবং প্রটেস্ট্যান্ট রাষ্ট্রে ক্যাথলিকরা নানাভাবে অত্যাচারিত হতে থাকে। ধর্মীয় দ্বন্দ্ব ও গৃহযুদ্ধ ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের শান্তি বিঘ্নিত করতে থাকে। এই সময় ফ্রান্সের রাজশক্তি সুদৃঢ় ঐক্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। রাজার বিরুদ্ধে ছিল নানা অসন্তোষ। পুরোহিত ও অভিজাত সম্প্রদায় খুবই শক্তিশালী ছিল এবং তারা নানাভাবে রাজার ক্ষমতা খর্ব করত। প্রটেস্ট্যান্ট হুগোনট গোষ্ঠী সেখানে প্রাধান্য বিস্তার করে, যদিও রাজশক্তি ছিল ক্যাথলিক ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। ফলে ধর্মীয় দ্বন্দ্ব প্রায়ই দেখা যায়। এই অস্থির রাজনৈতিক পরিবেশে ফ্রান্সে ক্যাথলিকদের পলিকিউজ গোষ্ঠী দ্বন্দ্বমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ স্থাপনের প্রচেষ্টায় রত হয়। তাঁরা জাতীয়তাবাদী দৃষ্টি নিয়ে ধর্মীয় বিশৃঙ্খলা বন্ধ করে রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করতে থাকেন। এই গোষ্ঠীর সদস্য বোডিন সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব দ্বারা রাষ্ট্রকে চরম ক্ষমতা প্রদান করেন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তত্ত্বগত ভিত্তি নির্মাণ করেন। এই সময়ে ফ্রান্সে উদীয়মান ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসার অগ্রগতি ও বিকাশের স্বার্থে শক্তিশালী ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনুভব করেছিল। বোডিনের সার্বভৌম চরম শক্তিশালী রাষ্ট্রের তত্ত্ব এই প্রয়োজন পূর্ণ করে। ঐতিহাসিক পদ্ধতি, আইনের তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী এবং বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষনের সাহায্যে বোডিন তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্ব নির্মাণ করেন।

রাষ্ট্রকে তিনি পরিবারের সম্প্রসারিত রূপ বলে মনে করতেন। পরিবারের কর্তার মত রাষ্ট্রে রাজা কর্তৃত্ব প্রয়োগ করবেন এবং নাগরিকরা তাঁর প্রতি আনুগত্য দেখাবেন বলে বোডিন বলেছেন। পরিবার ও রাষ্ট্রের মাঝখানে আছে নানা পৌর সংগঠন। পরিবার ও রাষ্ট্রকে তিনি প্রাকৃতিক ও অপরিহার্য সংগঠন মনে করতেন, পৌর সংগঠনগুলিকে নয়। বোডিনের রাষ্ট্রে ব্যক্তির প্রসঙ্গ নেই, ব্যক্তির পরিচিতি পরিবারের সদস্য হিসাবে। তাঁর মতে, রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সার্বভৌমিকতা, যা হল নাগরিক ও প্রজাদের ওপর চরম ও অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা, যা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। এই সার্বভৌম ক্ষমতাবলে প্রণীত রাষ্ট্রীয় আইনের প্রতি নাগরিকরা আনুগত্য দেখাতে বাধ্য। তবে তিনি প্রাকৃতিক আইন, ও সম্পত্তির অবাধ অধিকার দ্বারা সার্বভৌমকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। রাষ্ট্রের সাবভৌম ক্ষমতা ব্যবহারকারীদের সংখ্যা ও পরিচালনা পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে বোডিন সরকারের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্র — তিন ধরনের সরকারের কথা তিনি বলেছেন। তিনটির মধ্যে শেষ পর্যন্ত রাজতন্ত্রকেই তিনি শ্রেষ্ঠ বলেছেন। পরিবারের সদস্যপদের ভিত্তিতেই বোডিন নাগরিকতার ধারণা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পরিবারের প্রধান পুরুষ বা পিতাই, তাঁর মতে, নাগরিক। নাগরিকতার ভিত্তি হল রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য, সরকারী কাজে

অংশগ্রহণ নয়। বোঁদা সাম্যের ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন না। বোঁদার রাষ্ট্রচিন্তায় বিপ্লবের কারণ সম্বন্ধেও আলোচনা আছে।

বোঁদার রাষ্ট্রতত্ত্ব নানাভাবে প্রশংসিত ও সমালোচিত হয়েছে। তবে তাঁর সার্বভৌমিকতা তত্ত্ব, ঐতিহাসিক পদ্ধতির প্রয়োগ, প্রাকৃতিক আইনের প্রসঙ্গ, রাষ্ট্রের তত্ত্ব, সমাজের ওপর পরিবেশের প্রভাব সংক্রান্ত তত্ত্ব ইত্যাদি রাষ্ট্রচিন্তায় তাঁর অসামান্য কীর্তির স্বাক্ষর।

৫৬.২ বোঁদা বা বোডিনের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সময়

ষোড়শ শতকের এক সংকটকালীন পরিস্থিতিতে জাঁ বোঁদা বা বোডিনের আর্বিভাব (১৫৩০-১৫৯৬)। তিনি ১৫৩০ সালে ফ্রান্সের অ্যাঙ্গার নামক স্থানে এক দর্জি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে কিছুদিন ধর্মতত্ত্বের ওপর শিক্ষালাভ করে পরে আইনপাঠ করেন টনলাউস বিশ্ববিদ্যালয়ে। আইন শিক্ষা সমাপ্ত করে প্রথমে তিনি আইন বিষয়ে অধ্যাপক হন। অধ্যাপকের পদ ছেড়ে তিনি আবার প্যারিসে আইনজীবীর কাজ করেন। ফ্রান্সের রাজা হেনরি III-এর ভাই ফ্রান্সিসের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ খুব ভাল ছিল। তাঁর সাহায্যে তিনি কাউন্সিলার পদে নিজেকে নির্বাচিত করতে সমর্থ হন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁকে বিদায় নিতে হয়। তাঁর পান্ডিত্য ও দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে রাজা হেনরী III তাঁকে ১৫৭৬ সালে এ্যাটর্নির পদে নিযুক্ত করেন। ১৫৮১ সালে তাঁকে ইংল্যান্ডের রানী এলিজাবেথের রাজদরবারে দূত হিসাবে পাঠান হয়। এই কাজগুলির মাধ্যমে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার ভান্ডার স্ফীত হয় এবং এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বিশ্লেষণাত্মক ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন। ১৫৯৬ সালে প্লেগ রোগে তিনি মারা যান।

যে সকল গ্রন্থগুলিতে বোদাঁর চিন্তাধারা লিপিবদ্ধ হয়েছে, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— 'Methodus'(1566), 'Reponse'(1568), 'Six Books on the State'(1576), 'Demonomanie de Sorciers'(1580), 'Universae Nature Theatrum', 'Heptaplumeres' ইত্যাদি। 'Methodus' গ্রন্থ অনুসারে সবকিছুর শুরু ও শেষ হল ঈশ্বর এবং তাই ঈশ্বরকে জানা প্রয়োজন। কিন্তু আধিভৌতিক দৃষ্টি দ্বারা ঈশ্বরকে জানা সম্ভব নয়। এজন্য সমন্বয়মূলক দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োজন। মানুষ ও তার প্রাকৃতিক জগতকে জানার মাধ্যমে এই সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে। অর্থাৎ ঈশ্বরকে জানতে হলে মানুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জানতে হবে। মানুষের প্রকৃতি কিভাবে সমাজের মূল প্রতিষ্ঠানগুলির বিকাশে সাহায্য করেছে এবং ভৌগলিক ও আবহাওয়াজনিত অবস্থা কিভাবে মানবিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রভাবিত করেছে — তা না জানলে ঈশ্বরকে জানার জন্য সমন্বয়মূলক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে না। এইভাবে 'Methodus' গ্রন্থটিতে তিনি ইতিহাস পাঠের পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং জগৎ সম্বন্ধে একটি সমন্বয়মূলক দর্শন গড়ে তুলেছেন। তাঁর 'Response' গ্রন্থে তৎকালীন ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থার আলোচনা দ্বারা রাজনৈতিক অর্থনীতি (Political Economy)-র সূচনা ঘটিয়েছেন। এই গ্রন্থে তিনি পশ্চিম ইউরোপের সর্বত্র মূল্যবৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করেছেন, মুদ্রার অবমূল্যায়ন (depreciation)-এর ফল

আলোচনা করেছেন, বাণিজ্যের স্বাধীনতার পক্ষে ওকালতি করেছেন এবং জানিয়েছেন যে অর্থনৈতিক উপাদান দ্বারাই রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্পর্ক স্থিরীকৃত হয়। তাঁর আগে কেউ অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার প্রকৃতি ও গুরুত্ব এত পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেননি। তাঁর পূর্বোক্ত দুটি গ্রন্থের বক্তব্যের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে তাঁর রাষ্ট্রপাঠ সংক্রান্ত গ্রন্থ 'Six Books on the Nature of the State'। ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির জগতের ওপর তাঁর আকর্ষণ বেশি ছিল। তাই তিনি 'Methodus' -এর ঈশ্বরের আলোচনা থেকে আলোচ্য গ্রন্থগুলিতে রাজনীতির প্রতি দৃষ্টি দেন। কিন্তু রাজনীতির জগতে আসার পর আর ঈশ্বরের জগতের দিকে ফিরে তাকাননি। রাষ্ট্রের প্রকৃতি আলোচনার জন্য তিনি রাষ্ট্র বিকাশের ইতিহাস অনুসন্ধান করেছেন এবং পরিবার থেকে রাষ্ট্রের বিকাশ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করে পরিবারের কর্তার মত রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের চরম ক্ষমতার কথা বলেছেন, যাকে সার্বভৌমিকতা বলা হয়। সার্বভৌমিকতাকে তিনি রাষ্ট্রের বিশেষ বৈশিষ্ট হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর 'Demonomanie de Sorciers' পুস্তকে আছে ম্যাজিক ও ডাইনীতন্ত্রের প্রসঙ্গে এবং মানুষের সঙ্গে আধিভৌতিক অস্তিত্বের সম্পর্কের ভিত্তিতে তা আলোচিত হয়েছে। 'Universae Naturae Theatrum' গ্রন্থটি হল মনুষ্যজীবনের রহস্যময় প্রকৃতি সমন্ধে তাঁর আলোচনা। 'Heptaplomeres-এ আলোচিত হয়েছে তাঁর ধর্মসংক্রান্ত বক্তব্য।

বোঁদার বিভিন্ন বক্তব্যগুলি ভালভাবে অনুধাবন করার জন্য তাঁর সময়ের ফ্রান্সের সংকটকালীন অবস্থার সম্যক জ্ঞান প্রয়োজন। পঞ্চদশ শতকে মার্টিন লুথারের ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সময় থেকে ইউরোপীয় খ্রীষ্টান জগতে প্রটেস্ট্যান্টদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ক্যাথলিক খ্রীষ্টানরা এই প্রাধান্য প্রতিহত করার জন্য বিভিন্ন ভাবে সচেষ্ট ছিল। এই ধর্মীয় বিভেদ ধীরে ধীরে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হতে থাকে। ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপে দেখা যায় যে ধর্মনিরপেক্ষ রাজারা হয় ক্যাথলিক, নয় প্রটেস্ট্যান্টদের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে বাধ্য হচ্ছেন। প্রটেস্ট্যান্ট রাজারা ক্যাথলিকদের এবং ক্যাথলিক রাজারা প্রটেস্ট্যান্টদের রাষ্ট্র থেকে বিতাড়িত করতে থাকেন। ধর্মীয় দ্বন্দ্ব ও গৃহযুদ্ধ এক অস্থিরতার বাতাবরণ সৃষ্টি করে। সমাজের রাজনৈতিক ভিত্তি সংকটের সম্মুখীন হয়। ইংল্যান্ডে সুদৃঢ় জাতীয় ঐক্যের ভাব এবং শক্তিশালী রাজনৈতিক কর্তৃত্ব থাকায় ধর্মসংস্কার জনিত ধর্মীয় দ্বন্দ্ব কোন সমস্যা সৃষ্টি করেনি। স্পেনের রাজা ফিলিপ ক্যাথলিকদের পৃষ্ঠপোষকতা দ্বারা এবং ইংল্যান্ডের রানী এলিজাবেথ প্রটেস্টান্টদের সমর্থনের মাধ্যমে দেশের জনগণকে তাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীন করতে সমর্থ হন। কিন্তু অন্যান্য রাষ্ট্র বিশেষত ফ্রান্সের অবস্থা ছিল ভিন্ন ধরনের। পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে একজন স্বাধীন জাতীয় রাজার অধীনে ফ্রান্সের জাতীয় ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু সেই রাজার কর্তৃত্ব শক্তিশালী ও সুদৃঢ় ছিল না। তত্ত্বগতভাবে রাজা ক্ষমতাশালী ছিলেন, কিন্তু কার্যত তিনি নানাভাবে সীমাবদ্ধ ছিলেন। কার্যকরী রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন ঐক্যবদ্ধ আইনব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। পুরোহিত ও অভিজাত সম্প্রদায় নানা ধরনের সুযোগসুবিধা ভোগ করতেন, যেগুলি রাজার ক্ষমতাকে খর্ব করত। ফ্রান্সের শাসক ক্যাথলিক ধর্মের সমর্থক ছিলেন, কিন্তু সেখানে প্রটেস্ট্যান্ট মতবাদ বিস্তার লাভ করেছিল। সেই সঙ্গে ফ্রান্সে প্রটেস্ট্যান্ট সমাহত হুগোনট গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। একদল অভিজাত সম্প্রদায়ের সমর্থনে এই হুগোনট গোষ্ঠী রাজার ক্ষমতার বিরোধিতা করতে থাকে। ষোড়শ শতকের

প্রথম দিকে ক্যাথলিক গাইস ও প্রটেস্ট্যান্ট বোরবন্‌স—এই দুই অভিজাত গোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ফলে ফ্রান্সে বিশৃঙ্খলা, অশান্তি ও অরাজকতার এক দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি চলে। রাজনীতি ও ধর্মের মিশ্রণে ফ্রান্সের রাজনৈতিক স্থায়িত্ব বিঘ্নিত হয়। পোপতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও রাজতন্ত্রবিরোধী সংগ্রাম একই সঙ্গে অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। রাজাও তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার দ্বারা জনগণের সমর্থন থেকে বঞ্চিত হন। যথেচ্ছভাবে কর ধার্য করা ও ন্যায়বিচার বিলম্বিত করা ও তা অস্বীকার করা—ইত্যাদির জন্য রাজার বিরুদ্ধে জনগণের একাংশ ক্রুদ্ধ হন। ফ্রান্সের জাতীয় ঐক্য বিপন্ন হয় এবং ফ্রান্স অনিবার্য পতনের পথে অগ্রসর হতে থাকে।

এই সময় একদল প্রশাসক, আইনজ্ঞ ও রাজনীতিবিদ 'পলিকিউজ' (Poliques) গোষ্ঠী গঠন করে ফ্রান্সকে ধর্মের উন্মাদনা ও দ্বন্দ্বের হাত থেকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেন। তাঁরা ক্যাথলিক ছিলেন, কিন্তু ধর্মের ঊর্দ্ধে স্থাপন করেন তাঁদের জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী। তাঁরা সহিষ্ণুতার ধর্মমত ও স্বাধীনতার বাণী প্রচার করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ধর্মের নামে বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটান। তাঁরা অনুধাবন করেছিলেন যে রাষ্ট্র কোন একটি ধর্মমতকে জনগণের ওপর জোর করে চাপিয়ে দিলে দেশে শান্তি ও অগ্রগতির রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে। তাই তাঁরা চেয়েছিলেন রাজনীতি থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করে রাষ্ট্রকে সমস্ত ধর্মীয় অনৈক্যের ওপরে স্থাপন করতে। ধর্মের নামে বিশৃঙ্খলা বন্ধ করার জন্য তাঁরা রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করতে চেয়েছিলেন এবং রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতার কথা বলেন। জাঁ বোদাঁ ছিলেন এই পলিকিউজ গোষ্ঠীর একজন নেতা। ফ্রান্সের সংকটজনক পরিস্থিতিতে তাঁর রচিত রাষ্ট্রতত্ত্ব শুধু যে ফ্রান্সের শৃঙ্খলার প্রয়োজন পূর্ণ করেছে তাই নয়, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এক যুগান্তকারী সংযোজন হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। বোদাঁর রাষ্ট্রতত্ত্বকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রথম আধুনিক তত্ত্ব মনে করা হয়। তাঁর পূর্ববর্তী ম্যাকিয়াভেলিকে যদিও প্রথম আধুনিক রাষ্ট্রনৈতিক দার্শনিক বলা হয়, তবুও বোদাঁর রাষ্ট্রতত্ত্বসংক্রান্ত গ্রন্থগুলিকেই প্রথমে আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্বের গ্রন্থ বলে স্বীকার করা হয়। ম্যাকিয়াভেলি সরকারের কলাকৌশল বা যান্ত্রিক দিকের মধ্যেই তাঁর আলোচনা সীমিত রেখেছিলেন, রাষ্ট্রের তত্ত্বগত দিকের ওপর আলোকপাত করেননি। বোদাঁই প্রথম রাষ্ট্রের তত্ত্বগত দিক নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন এবং তাঁর সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব এখনও জাতীয় রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হিসাবে স্বীকৃত।

ফ্রান্সের বিশৃঙ্খল ও অশান্তিপূর্ণ আবহাওয়া তৎকালীন ফ্রান্সের ব্যবসায়ী শ্রেণীর অগ্রগতির পক্ষে অনুকূল ছিল না। তাদের অর্থনৈতিক কাজকর্ম দুর্বল রাজার কর্তৃত্বাধীনে এবং রাজনৈতিক অরাজক পরিবেশে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল। তারা তাদের ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতির স্বার্থে একটি শক্তিশালী রাজকীয় কর্তৃত্ব এবং শান্তিশৃঙ্খলার প্রয়োজন অনুভব করছিল। ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সময় এই শ্রেণী ধর্মের সাহায্যে শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন করে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পরে তারা ধর্মনিরপেক্ষ শাসককে ধর্মের সাহায্য ছাড়া নতুনভাবে সমর্থনের প্রয়োজন বোধ করে। অন্যান্য রাষ্ট্রের থেকে ফ্রান্সের এই প্রয়োজন বেশি অনুভূত হয় ফ্রান্সের ভয়ংকর অরাজক অবস্থা ও অস্থিতিশীলতার জন্য। বোডিনের রাষ্ট্রতত্ত্ব তাঁর সময়ের ফ্রান্সের প্রয়োজন পূর্ণ করে।

অনুশীলনী — ১

১। বোডিনের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখুন। (উত্তর ৩০ পংক্তির মধ্যে হবে।)

২। বোডিনের সময় ফ্রান্সের অবস্থা কেমন ছিল? (উত্তর ৪০ পংক্তির মধ্যে হবে।)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৫৬.৩ বোদাঁর রাষ্ট্রচিন্তার বৈশিষ্ট্য

বোদাঁ ছিলেন ষোড়শ শতকের ফ্রান্সের একজন সর্বজনস্বীকৃত অসাধারণ পান্ডিত্যপূর্ণ রাজনৈতিক লেখক ও চিন্তাশীল ব্যক্তি এবং নানা বিষয়ের আলোচনায় তাঁর অত্যাধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। প্রচন্ড ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামির যুগে তিনি যুক্তিবোধ দ্বারা পরিচালিত হন। অযৌক্তিক ধর্মবিশ্বাস তাঁকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। ধর্মীয় সহিষ্ণুতা তাঁর চিন্তাধারার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট হুগোনাট, গাইস ও বুরবন্‌সদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ফ্রান্সের রাজনৈতিক অস্তিত্বকে সংকটপূর্ণ করে তুলেছিল। তাই বোদাঁ পলিকিউজ (Politique) গোষ্ঠীর সদস্য হিসাবে ফ্রান্সের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য রাজতন্ত্রের অধীনে শক্তিশালী সরকারকে সমর্থন করেন। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থেও তিনি শক্তিশালী রাজার কর্তৃত্বের ছত্রছায়ায় শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্র গঠন দ্বারা নিয়মশৃঙ্খলা স্থাপনে সুপারিশ করেছেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্রের কাজ কোন বিশেষ ধর্মমতকে লালন করা নয়, জনকল্যাণ ত্বরান্বিত করা। ডানিং-এর মতে, বোডিনই প্রথম লেখক যিনি

আধুনিক অর্থে ইতিহাসের দর্শন প্রতিষ্ঠা করেছেন। ইতিহাস থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের ভিত্তিতেই তিনি মানববিকাশের সূত্রকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি বলেছেন যে মানুষ ও তার সমাজকে জানার জন্য ইতিহাসের দিকে তাকানো প্রয়োজন। ইতিহাস, তাঁর মতে, শুধুমাত্র কিছু ঘটনার নথিপত্র নয়। তিনি ইতিহাস সম্বন্ধে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন। ইতিহাস, তাঁর মতে, রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তির পূর্ণ চিত্র তুলে ধরে। তাই ঐতিহাসিকের কাছে জনগণের চরিত্র, সমাজের প্রকৃতি, সামাজিক ও রাজনৈতিক পমরিবর্তনের ধারা ইত্যাদি সব কিছুই মূল্যবান।

ইতিহাস আইনব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়, এই বিশ্বাস নিয়ে বোদাঁ আইনের আলোচনা ও ব্যাখ্যা করেন। আইনের আলোচনায় তিনি দার্শনিক অনুভূতি নিয়ে আসেন। তিনি আইন ও রাজনীতিকে সংযুক্ত মনে করতেন এবং উভয়কেই ইতিহাসের মাধ্যমে অনুধাবন করার কথা বলেছেন। বিভিন্ন দেশের আইন ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে পড়াশুনার মাধ্যমে তিনি একটি তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি আইনের সঙ্গে ইতিহাসের সমন্বয় ঘটান।

ম্যাকিয়াভেলির মত দেশের শান্তি, শৃঙ্খলা ও উন্নতির স্বার্থে বোদাঁ রাজনীতির প্রসঙ্গ এনেছেন, সুশাসন ও রাজনৈতিক বৈধতার প্রশ্ন আলোচনা করেছেন। কিন্তু ম্যাকিয়াভেলির মত রাজনীতি তাঁর লক্ষ্য ছিল না। প্লামেনাৎজ বলেছেন যে জগত ও জগতে মানুষের স্থানসংক্রান্ত বৃহত্তর তত্ত্ব এবং সৃষ্টিতত্ত্ব প্রসঙ্গে এসেছে তাঁর রাজনৈতিক তত্ত্ব। তাই তাঁর বিজ্ঞানধর্মী রাজনীতিতে আছে মানুষের কথা, তার পরিবেশ প্রসঙ্গ, সৃষ্টিতত্ত্ব ইত্যাদি। দার্শনিক তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এসেছে তাঁর রাজনৈতিক তত্ত্ব।

ম্যাকিয়াভেলির মত বোডিন ধর্মীয় পরিপ্রেক্ষিতকে বর্জন করে রাজনীতিকে পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র দান করেন। কিন্তু তিনি ম্যাকিয়াভেলির মত ধর্মকে এবং খ্রীষ্টান মূল্যবোধকে পুরোপুরি অস্বীকার করেননি। তিনি বলেছেন যে ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার জন্য মানুষের সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টি গড়ে তুলতে হবে, ঈশ্বরকে জানতে হলে মানুষ ও তার প্রকৃতি সম্বন্ধে সমন্বয়মূলক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন এবং সমাজে কিভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তা দেখা প্রয়োজন।

তাঁর সমকালীন লেখকেরা রোমান আইনের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। বোদাঁ সেখানে ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং ভৌগলিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে আইনশাস্ত্রের বিচারে ব্যবহার করেছেন। রোম বা কোন বিশেষ দেশের আইন নয়, বিভিন্ন দেশের আইনের তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন এবং বিশ্বজনীন আইনের কথাও বলেছেন।

বোদাঁ রাজনৈতিক দর্শন সমন্বয়ের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করে। তাঁর মধ্যে একাধারে পুরাতন ও নূতনের সংমিশ্রণ ঘটেছে। ষোড়শ শতক না ছিল পুরোপুরি মধ্যযুগীয়, না ছিল পুরোপুরি আধুনিক, এই

শতক ছিল এক মিশ্র যুগ। মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণা ও কুসংস্কারের সঙ্গে আধুনিক রেনেসাঁসের সংস্কার মুক্ত যুক্তিবাদের সমন্বয় এই যুগের বুদ্ধিজীবিদের বৈশিষ্ট্য ছিল। বোদাঁও ঐ বৈশিষ্ট্যের বাহক ছিলেন। তিনি মধ্যযুগীয় প্রভাব থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেননি। গ্রহের দ্বারা মানুষ ও জাতির ভাগ্য নির্ধারিত হয় বলে বিশ্বাস করতেন। ভূতপ্রেত, দৈত্য ও জ্যোতিষীতে বিশ্বাস স্থাপন করতেন। আবার আধুনিক ভাবধারাও তাঁর মধ্যে দেখা যায়। তিনি ধর্মীয় বোধ দ্বারা চালিত হননি , ধর্ম নিরপেক্ষ কর্তৃত্বের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন, রাষ্ট্রতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নির্মাণ করেছেন, জাতির বস্তুগত ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কথাও ভেবেছেন। তাই আমরা বলতে পারি যে রাজনৈতিক সমস্যা আলোচনা ও তাদের সমাধানের ক্ষেত্রে বোদাঁর দৃষ্টিভী ছিল আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক, যদিও তাঁর কিছু কিছু বিশ্বাস ছিল মধ্যযুগীয়।

অনুশীলনী — ২।

১। বোডিনের রাষ্ট্রচিন্তার বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী ? (উত্তর ৪০ পংক্তির মধ্যে হবে।)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৫৬.৪ বোদাঁর রাষ্ট্রচিন্তার পরিচয়

বোদাঁ রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ম্যাকিয়াভেলি রাজনীতিকে যে ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র দান করেছেন, বোদাঁর প্রচেষ্টায় সেই ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ম্যাকিয়াভেলি শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্রের সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, কিন্তু সেই জাতীয় রাষ্ট্রের সাফল্যের পরিবেশ উপস্থিত করতে পারেননি। বোদাঁ ম্যাকিয়াভেলির এই অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণ করে জাতীয় রাষ্ট্রের তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণ করেন। বোদাঁ তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা প্রসঙ্গে জাতীয় রাষ্ট্রের তত্ত্ব, সার্বভৌমিকতার ধারণা, রাষ্ট্র ও সরকারের রূপ, নাগরিকতার প্রশ্ন, বিপ্লব, প্রশাসনিক নীতি, আর্থিক নীতি ইত্যাদির কথা বলেন।

৫৬.৪.১ রাষ্ট্র সম্বন্ধে ধারণা

রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বোদাঁ রাষ্ট্রের বিকাশের ইতিহাস অনুসন্ধান করেছেন এবং এই অনুসন্ধান থেকে তিনি বলেছেন যে পরিবার হল মানুষের প্রাথমিক, প্রাকৃতিক ও গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন, যা থেকে রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। অ্যারিস্টটলের মতই বোদাঁ রাষ্ট্রকে পরিবারের বৃহত্তর রূপ মনে করতেন। জীবনের মৌল কিছু প্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্য মানুষ পরিবার গঠন করে। বোদাঁ পরিবারের দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন -

(১) পরিবার সম্পত্তির ভিত্তির ওপর গঠিত। সম্পত্তি ছাড়া পরিবার অচল।

(২) পরিবারের মধ্যে কর্তৃত্ব ও সরকারের পূর্ণ রূপ প্রতিফলিত হয়। পরিবারের কর্তার কর্তৃত্বের ভিত্তিতে পরিবার পরিচালিত হয়। পরিবারে পুরুষরা নারী ও শিশুদের ওপর প্রভুত্ব করেন। কালক্রমে কিছু পরিবার একত্রিত হয়ে তাদের পারস্পরিক সুবিধার জন্য প্রথমে সংঘমূলক প্রতিষ্ঠান এবং শেষে সংঘমূলক প্রতিষ্ঠান থেকে রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। কি ভাবে সংঘমূলক প্রতিষ্ঠান থেকে রাষ্ট্র গড়ে উঠল তার পূর্ণ ব্যাখ্যা তিনি করেননি। তার এ প্রসঙ্গে যুদ্ধ ও যুদ্ধজয়ের ভূমিকা স্বীকার করেছেন।

বোদাঁর মতে এইভাবে পরিবার থেকে সৃষ্ট রাষ্ট্র পরিবারের কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, পরিবারে যেমন সবাই সমান নয়, নারী ও শিশুরা পুরুষদের থেকে নিকৃষ্টতর মর্য্যাদাযুক্ত তেমনি রাষ্ট্রেও সবাই সমান নয়। রাষ্ট্রের সদস্যদের মধ্যে পূর্ণ সাম্য আনার প্রচেষ্টা মানুষের প্রকৃতির বিরোধী। তাই রাষ্ট্র সদস্যদের মধ্যে অসাম্যের নীতির ভিত্তিতে গঠিত হবে। দ্বিতীয়ত, পরিবার যেমন সম্পত্তির ভিত্তি দ্বারা অচল, রাষ্ট্রও তেমনি ব্যক্তিগত

সম্পত্তির অধিকার ছাড়া তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না। তৃতীয়ত, পরিবার যেমন কর্তার উচ্চতর কর্তৃত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, রাষ্ট্রও তেমনি তার চরম ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, যাকে বোদাঁ সার্বভৌমিকতা বলেন, তাঁর মতে, এই সার্বভৌমিকতাই হল রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বোদাঁর মতে, পরিবার হল সমাজের প্রাথমিক এবং রাষ্ট্র হল তার চূড়ান্ত স্তর। দুয়ের মাঝে বিভিন্ন পৌর সংগঠন। ভালবাসা ও স্নেহমমতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে পরিবার, বন্ধুত্ব ও সামাজিক সম্পর্কের উদ্দেশ্যে দেখা দেয় পৌর সংগঠন, যেগুলি সমাজে বৈচিত্র্য ও গতিময়তা নিয়ে আসে আর রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষার তাগিদে। পরিবার ও রাষ্ট্রকে স্বাভাবিক সংগঠন বললেও পৌর সংগঠনগুলিকে তিনি স্বাভাবিক বলেননি। সামাজিক দিক থেকে প্রয়োজনীয় হলেও এরা রাষ্ট্র বা পরিবারের মত অপরিহার্য নয় বলে এগুলির স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র দিতে অস্বীকার করেছেন বোদাঁ। এগুলিকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন করে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু পরিবার রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে কিনা এ প্রশ্নের কোন উত্তর বোদাঁ দেননি। তবে পরিবারের সদস্য ও সম্পত্তির ওপর পরিবারের কর্তার স্বাভাবিক অধিকার তিনি মেনে নিয়েছেন।

বোদাঁর রাষ্ট্রের তত্ত্বে ব্যক্তি উপস্থিত নেই। ব্যক্তিকে তিনি পরিবারের সদস্য হিসাবেই দেখেছেন। ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বা সামাজিক চুক্তির ভিত্তিতে রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে — এই মত তিনি মানেননি। ব্যক্তি স্বাধীনতার থেকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের বৈধতার প্রশ্ন তার কাছে জরুরী ছিল। অ্যারিস্টটল পরিবার থেকে রাষ্ট্র সৃষ্ট হয়েছে বললেও রাষ্ট্রের লক্ষ্য হিসাবে নাগরিকের সুখ ও সাধুতার প্রতি দৃষ্টি দিয়েছিলেন। বোদাঁর আলোচনায় সে লক্ষ্য অনুপস্থিত। তিনি রোমান আইনের মত পরিবার রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংগঠনগুলিকে মানুষের সামাজিক অনুভূতির, প্রকাশ মনে করেছেন।

রাষ্ট্র সম্পর্কে বোদাঁর তত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে কোন পরিস্থিতিতে ও কি উদ্দেশ্যে তিনি রাষ্ট্রতত্ত্ব রচনা করেছেন। ইউরোপের প্রতিটি দেশে তখন ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্টদের মধ্যে ধর্মীয় বিরোধ রাষ্ট্রীয় ঐক্যকে বিঘ্নিত করে তুলেছিল। এই অবস্থায় বোদাঁ রাষ্ট্রতত্ত্বকে ধর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত করে রাষ্ট্রের চরম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, যা সমস্ত নাগরিক মানতে বাধ্য। তাই তিনি রাষ্ট্রকে ঐশ্বরিক প্রতিষ্ঠান বলতে অস্বীকার করেন এবং অন্যদিকে রাষ্ট্র শাসিতের সম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত —এই তত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করেন। বোদাঁ রাষ্ট্রের ন্যায়সঙ্গত ও বৈধ প্রাধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তাই তাঁর মতে, রাষ্ট্র হল বিষয় সম্পত্তিসহ পরিবারের সমষ্টি, যা সার্বভৌম শক্তি ও যুক্তি দ্বারা শাসিত এবং শক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

সবশেষে আমরা বোদাঁর রাষ্ট্রের ধারণার বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করতে পারি:—

i) রাষ্ট্র হল পরিবারসমূহ ও' তাদের বিষয়সম্পত্তির সমষ্টি। পরিবারের সদস্য হিসাবে ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের যোগ। ব্যক্তি তাই রাষ্ট্রের প্রাথমিক উপাদান নয়। তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বেরও কোন গুরুত্ব নেই।

ii) রাষ্ট্রের শাসকের মূল বৈশিষ্ট্য হল সার্বভৌম বা চরম ক্ষমতা, যার ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রজাদের ওপর তার কর্তৃত্ব আরোপ করে এবং শাসন করে।

iii) পরিবারের বিষয় সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় এক্তিয়ার বহির্ভূত এবং তাই এর ওপর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নেই।

iv) রাষ্ট্র পাশবিক বলপ্রয়োগ দ্বারা সৃষ্ট।

v) বল প্রয়োগ দ্বারা রাষ্ট্র সৃষ্ট হলেও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বলপ্রয়োগের ওপর নির্ভরশীল নয়, যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। যুক্তিকে তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়ামক এবং স্বাভাবিক আইনকে তিনি যুক্তির অনুশাসন বলেছেন, যা প্রধানত নৈতিক আইন। অর্থাৎ যুক্তি ও নৈতিক আইনের ওপর অস্তিত্ব নির্ভর করে।

vi) রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হল সব রকমের ভালর প্রতিষ্ঠা — ন্যায়বিচার, প্রতিরক্ষা, বস্তুগত কল্যাণ এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি।

৫৬.৪.২ সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণা

বোদাঁ রাষ্ট্রের ধারণার সঙ্গে সার্বভৌমিকতাকে যুক্ত করেছেন এবং সার্বভৌমিকতাকে রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সার্বভৌমিকতা হল রাষ্ট্রের চরম ও চিরস্থায়ী ক্ষমতা, যার ভিত্তিতে রচিত আইনের প্রতি রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিক আনুগত্য দেখাতে বাধ্য। আইন হল সার্বভৌমের আদেশ এবং আইনের মাধ্যমেই সার্বভৌমিকতা প্রতিফলিত হয়। সার্বভৌমিকতা হল নাগরিক ও প্রজাদের ওপর রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা যে ক্ষমতা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। এই সার্বভৌমিকতা অনিয়ন্ত্রিত, চিরন্তন ও অবিভাজ্য। তবে সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য, সরকারের নয়। রাষ্ট্রে সরকার বদল হতে পারে। এক সরকারের বদলে তখন অন্য সরকার সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহার করে, কিন্তু রাষ্ট্র যতদিন থাকে সার্বভৌমিকতা ততদিন থাকে। আইনের মাধ্যমে প্রকাশিত সার্বভৌম ক্ষমতা সমাজে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে এবং ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করে। বোডিনের মতে সার্বভৌমিকতা ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রকাশ নয়। মানুষের সুবিধার জন্য মানুষের দ্বারা সৃষ্ট। তাই এর উৎস হল মানব প্রকৃতি।

বোদাঁর মতে সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্যগুলি হল : —

i) এই ক্ষমতা চিরন্তন, এর কোন শেষ নেই। যতদিন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, ততদিনই সার্বভৌমিকতার অস্তিত্ব, ইতিমধ্যে সরকারের পরিবর্তন ঘটতে পারে। বোদাঁর মতে, যে সার্বভৌম সে ঈশ্বর ছাড়া আর কারো কর্তৃত্ব স্বীকার করে না। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে দায়িত্বশীল থেকে তিনি ক্ষমতা ব্যবহার করেন তিনি সার্বভৌম নয়। তাই রাজার প্রতিনিধিরা সার্বভৌম হতে পারে না। রাজা সারা জীবন ধরে চরম ক্ষমতা ভোগ করেন, তাই তিনি সার্বভৌম। বোদাঁ সার্বভৌমিকতার ধারণাটিকে রাজতন্ত্রের স্বপক্ষে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। চিরন্তন সার্বভৌম ক্ষমতা বলতে রাজার ক্ষমতার কথা

বলেছেন, যে ক্ষমতা অন্যকে প্রদত্ত হলেও নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। অধস্তন কর্মচারীকে আদেশ দেবার বা তার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার অধিকার রাজার থাকবে।

ii) সার্বভৌমিকতা হল চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতা, যার মাধ্যমে আইন সৃষ্ট হয়। সার্বভৌমের কর্তৃত্ব নাগরিকরা মানতে বাধ্য। বাইরের কোন শক্তি এই ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। এই বৈশিষ্ট্য ঘোষণা দ্বারা বোদাঁ প্রথমত, রোমের পোপ ও রোমের সম্রাটের মত বাইরের কর্তৃত্বের দাবী অস্বীকার করে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং, দ্বিতীয়ত, সামন্ততান্ত্রিক প্রভু, কর্পোরেশন ইত্যাদিরও সাধারণ নাগরিকের মত রাজার কর্তৃত্বের অধীনে স্থাপন করেন। প্রথমটি সার্বভৌমিকতার বাহ্যিক এবং দ্বিতীয়টি অভ্যন্তরীণ দিক।

iii) সার্বভৌম কর্তৃত্ব আইন দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত। সার্বভৌমই বিধিগত আইনের উৎস। বিধিগত আইনের সৃষ্টিকর্তাকে সেই আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা যায় না। সার্বভৌম দেশের বিধিবদ্ধ আইন ছাড়াও প্রথাগত আইনের ওপরে বিরাজ করেন, কারণ প্রথাগত আইন সার্বভৌম থেকেই তার প্রাধিকার লাভ করে।

iv) সার্বভৌম ক্ষমতা মৌলিক, অর্পিত নয়। জনগণের থেকে এই ক্ষমতা নির্গত হয়, ঈশ্বর বা পোপের কাছ থেকে নয়।

v) সার্বভৌম ক্ষমতা অ-হস্তান্তর যোগ্য। একে কখনই রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

vi) সার্বভৌম ক্ষমতা অবিভাজ্য। একে বিভিন্ন এককের মধ্যে বিভক্ত করা যায় না। সার্বভৌম কর্তৃত্ব অধীনস্থদের হাতে কিছু ক্ষমতা অর্পণ করতে পারেন, কিন্তু অধীনস্থরা তার ফলে সার্বভৌম হয় না।

এই সার্বভৌম ক্ষমতার বলে রাষ্ট্রপ্রধান যুদ্ধ বা শান্তি ঘোষণা করতে পারেন, প্রধান অফিসারদের নিয়োগ করেন, স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন, আইন প্রণয়ন করেন, বিচারকার্য পরিচালনা করেন। নাগরিকরা সার্বভৌমের আদেশ মানতে বাধ্য। একমাত্র ঈশ্বরই সার্বভৌমের বিচার করতে পারেন।

বোডিন সার্বভৌমকে চরম বললেও শেষ পর্যন্ত কয়েকটি সীমাবদ্ধতার কথা বলেছেন:—

i) সার্বভৌম কর্তৃত্ব স্বাভাবিক আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যা ঐশ্বরিক বিধানের একটি অংশ হিসাবে বিবেচিত হয়। স্বাভাবিক ও ঐশ্বরীয় উচ্চতর আইন মানবীয় আইনের ঊর্দ্ধে বিরাজ করে এবং অপরিবর্তনীয় আচরণের মান প্রতিষ্ঠা করে। সকল রাজাকেই সেগুলি মানতে হয়।

ii) রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বের ভিত্তি হিসাবে সংবিধানিক আইনকে বোডিন শ্রদ্ধা করতেন এবং বলেছেন যে সাংবিধানিক আইন মানতে রাজা বাধ্য। এই তত্ত্ব অনুসারে ফ্রান্সের রাজা সিংহাসনে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন কখনই পরিবর্তন করতে পারেন না।

iii) বোদাঁর মতে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি খুবই পবিত্র এবং এই পবিত্র অধিকারকে মালিকের সম্মতি ছাড়া

সার্বভৌম খর্ব করতে পারে না। অর্থাৎ, প্রজার সম্মতি ছাড়া কর স্থাপনের অধিকার রাজার নেই। তাছাড়া ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পরিবার একত্র যুক্ত। পরিবারই রাষ্ট্রের ভিত্তি। তাই ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ মানে পরিবারের ধ্বংসসাধন এবং রাষ্ট্রেরও ক্ষতি।

iv) সার্বভৌম কর্তৃত্ব আন্তর্জাতিক নিয়ম এবং বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি মানতে বাধ্য।

v) রাষ্ট্র পরিবারের অস্তিত্ব রক্ষা করতে বাধ্য এবং পরিবার রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের আওতার বাইরে।

তাঁর সার্বভৌমিকতা তত্ত্ব নানাভাবে সমালোচিত হয়েছে। প্রথমত, নাগরিকরা কেন রাষ্ট্রের নির্দেশ মানবে,তার যথাযথ উত্তর তাঁর লেখায় নেই।

দ্বিতীয়ত, সার্বভৌমকে সাংবিধানিক আইনের অধীনস্থ করে বোদাঁ তাঁর সময়ের প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। অথচ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি।

তৃতীয়ত, স্বাভাবিক আইনের সঙ্গে সার্বভৌম প্রণীত আইনের সংঘর্ষ দেখা দিলে কোন আইনটি গ্রহণ করা হবে, তার উত্তর তিনি দেননি। তাছাড়াও কোনগুলি স্বাভাবিক আইন তা নির্ণয় করাও কঠিন।

চতুর্থত, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের অলঙ্ঘ্যতার নীতি দ্বারা সার্বভৌমের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের বক্তব্য এবং সার্বভৌমের চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতার তত্ত্ব — একসঙ্গে দুইই মানা যায় না। একটি অন্যটির বিরোধী।

এই সকল সমালোচনা সত্ত্বেও রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে এই তত্ত্বের মৌলিক অবদান অনস্বীকার্য। ষোড়শ শতকে তাঁর মত এত পরিষ্কারভাবে সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব আর কেউ উপস্থাপিত করতে পারেননি। তাঁর থেকে সার্বভৌমিকতার ধারণা গ্রহণ করে হব্‌স তাকে সুসংবদ্ধ করেন ও বৈজ্ঞানিক স্তরে উন্নীত করেন।

৫৬.৪.৩ রাষ্ট্র ও সরকারের রূপ

বোদাঁ রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পরিষ্কারভাবে পার্থক্য করেছেন। তাঁর মতে, সর্বোচ্চ ক্ষমতার ভোগদখলের প্রশ্নটির সাহায্যে রাষ্ট্রের রূপ এবং কোন ব্যবস্থা বা পদ্ধতি অনুসারে এই ক্ষমতা ব্যবহার করা হয়। সেই প্রসঙ্গে সরকার ও তার শ্রেণীবিভাগ আলোচ্য। বোদাঁ তিন ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা বলেছেন — রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্র। যেখানে সার্বভৌম ক্ষমতা একজন ব্যক্তির হাতে সেখানে রাজতান্ত্রিক, যেখানে কিছু ব্যক্তির হাতে সেখানে অভিজাততান্ত্রিক এবং যেখানে বহুব্যক্তির হতে সেখানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিরাজ করে।

রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহারকারীদের সংখ্যা ও পরিচালনার পদ্ধতির ভিত্তিতে সরকারের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যখন কিছু ব্যক্তির মাধ্যমে রাজা শাসন করেন তখন সেখানে অভিজাততান্ত্রিক সরকার দেখা যায়। রাজা রাজকার্যের দা িত্ব বহুলোকের মধ্যে বণ্টন করলে সেই রাজতন্ত্রে দেখা দেয়, গণতান্ত্রিকসরকার। বোদাঁর মতে রোম প্রজাতন্ত্রে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আড়ালে অভিজাততান্ত্রিক সরকার ছিল।

বোদাঁ স্বীকার করেন যে রাজতন্ত্র বা অভিজাততন্ত্রের থেকে তত্ত্বগতভাবে গণতন্ত্র ভাল। কিন্তু কার্যতঃ গণতন্ত্রে দেখা যায় দলাদলি, অনিশ্চয়তা ও প্রশাসনিক অযোগ্যতা। অভিজাততন্ত্রে গুণ ও সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত কিন্তু এই ব্যবস্থায় আনুগত্যের ধারণা দৃঢ় নয়। রাজতন্ত্রে ব্যক্তি শাসন ও নীতিভ্রষ্টতা আছে, তবুও এই শাসনই শ্রেষ্ঠ কারণ এখানে দলাদলি নেই, কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার জন্য দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এখানে সম্ভব, জরুরী অবস্থায় এই ব্যবস্থা কার্যকরী এবং এই ব্যবস্থায় জনগণের আনুগত্য সুদৃঢ় হয়। রাজতন্ত্রের মধ্যে আবার বোদাঁ তাঁর সময়ের ফরাসী রাজতন্ত্রকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করতেন।

বোদাঁ রাজতন্ত্রের তিনটি রূপ নির্দেশ করেছেন — (১) স্বৈরতান্ত্রিক শাসন — এখানে রাজা তাঁর প্রজাদের ক্রীতদাসের মত শাসন করেন। (২) বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র — বংশপরম্পরায় প্রচলিত রাজতন্ত্রকেই বোদাঁ রাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ রূপ বলেছেন। কারণ এখানে প্রজাদের অধিকার ও সম্পত্তি সুরক্ষিত এবং রাজা ঐশ্বরিক ও প্রাকৃতিক আইন মেনে চলেন। (৩) স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র — এখানে রাজা ঈশ্বরের আইন ও প্রাকৃতিক আইনকেলঙ্ঘ লঙ্ঘন করে ইচ্ছামত শাসন করেন। লঙ্ঘন করে ইচ্ছামত শাসন করেন।

৫৬.৪.৪ নাগরিকতার প্রশ্ন

বোদাঁ নাগরিককে রাষ্ট্রীয় সংগঠনের প্রাথমিক উপাদান মনে করেননি। পরিবারের সূত্র ধরেই তিনি নাগরিক ও নাগরিকতার ধারণা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর মতে, পরিবার হল প্রাথমিক স্তর এবং পরিবার থেকেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি। তাই পরিবারই নাগরিকতার কেন্দ্রস্থল। পরিবারের প্রধান পুরুষ বা পিতাকেই তিনি নাগরিক বলেছেন। তিনি গ্রীক পন্ডিত অ্যারিস্টটলের মত রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণকে নাগরিকতা বলেন নি। তাঁর মতে, রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ নয়, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যই নাগরিকের প্রধান লক্ষণ। তিনি বলেছেন যে, পরিবারের প্রধান যখন পরিবারের গন্ডী অতিক্রম করে অন্যান্য পরিবারের প্রধানদের সঙ্গে মিলিত হন এবং নিজের কর্তৃত্বের বাইরে অন্য পরিবারের প্রধানদের সঙ্গে মিলিতভাবে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধীন হন তখন এই পরিবার প্রধানরা নাগরিক সম্প্রদায় ভুক্ত হন। এঁরা সকলেই রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের অধীন ও অনুগত।

বোদাঁ সাম্যের ধারণার সমর্থক ছিলেন না। সম্ভ্রান্ত অভিজাতদের শ্রেষ্ঠত্ব তিনি স্বীকার করেন, পরিবারে পিতাকে শ্রেষ্ঠ বলেন, স্ত্রীদের শাসনাধিকারের তিনি বিরোধী ছিলেন, গৃহকর্মের বাইরে নারীর স্থান স্বীকার করেননি। সাম্যের থেকে যোগ্যতা ও সামর্থ্যকে তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

৫৬.৪.৫ বিপ্লব

বিপ্লবের কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বোদাঁ জ্যোতিষশাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও সংস্কারকে স্বীকার করেছেন আবার সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যও নিয়েছেন। তিনি দু'ধরনের রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের কথা বলেছেন — প্রথমটির ক্ষেত্রে আইন ও প্রতিষ্ঠানগত কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়, কিন্তু সার্বভৌম ক্ষমতা সেখানে পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত নয়। দ্বিতীয়টি হল বিপ্লব, যেখানে সার্বভৌমের স্থান পরিবর্তন হয়। এইভাবে বোদাঁ বিপ্লব ও পরিবর্তনের পার্থক্য করেছেন।

আইনগত বা ধর্মীয় পরিবর্তন বিপ্লব নয়, বিপ্লব হল সেই অবস্থা, যেখানে সর্বোচ্চ ক্ষমতার স্থানবদল ঘটে। রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্র তিন ধরনের শাসনেই বিপ্লব ঘটে। তবে বোদাঁর মতে গণতন্ত্রে বিপ্লবের সম্ভাবনা বেশি, রাজতন্ত্রে কম।

বিপ্লবের কারণ হিসাবে বোদাঁ ঐশ্বরিক, মানবিক ও প্রাকৃতিক — তিন ধরনের প্রভাবের কথা বলেছেন। বোদাঁ বিপ্লবেয় কারণ হিসাবে জ্যোতিষশাস্ত্র বা অজ্ঞাত রহস্যকে স্বীকার করেছেন। আবার রাষ্ট্রের পরিবর্তন বা বি প্লব সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বা পরিস্থিতি দ্বারা সৃষ্ট সে কথাও বলেছেন। তাছাড়াও ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য যেমন জলবায়ু, অক্ষ, দ্রাঘিমা ইত্যাদি যে সরকারী ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে তাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। বোদাঁ গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তি ও বিশ্লেষণী দৃষ্টি দ্বারা বিপ্লবের প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। বোদাঁই প্রথম রাজনীতিতে পরিবেশের প্রভাবের কথা বলেন। তাই অনেকে তাঁকে ভৌগলিক-রাজনীতির প্রথম প্রবক্তা বলেন। ভৌগলিক বৈশিষ্ট অনুযায়ী জাতীয় বৈশিষ্ট্য, শারীরিক শক্তি ও মানসিক ক্ষমতা গড়ে ওঠে —এই মত প্রতিষ্ঠা করেন। বিপ্লবের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যকাল, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, পেরি ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে সার্বভৌমের সম্পর্ক ইত্যাদির প্রসঙ্গ তুলেছেন। বিপ্লব থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য তিনি রাজাকে ধর্মসহিষ্ণুতা অবলম্বন করতে বলেছেন। আবার উপদল ও চক্রগোষ্ঠী থেকেও রাজাকে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। এতৎ সত্ত্বেও বোদাঁ জ্যোতির্বিদের মত রাষ্ট্রের ভাগ্যগণনার চেষ্টা করেছেন এবং কোন গ্রহের প্রকোপ রাষ্ট্রের পক্ষে বিপদজনক, কেমন করে সেই গ্রহের প্রভাবমুক্ত থাকা যায়, এ সংক্রান্ত উপদেশ দিয়েছেন। জ্যোতিষীর মতই রাষ্ট্রের শাসককে কুপ্রভাবমুক্ত হওয়ার জন্য তাবিজ ধারণ করতে বলেন।

৫৬.৪.৬ অন্যান্য বক্তব্য

বোদাঁ সরকারী প্রশাসন নীতি সংক্রান্ত বাস্তব সমস্যা নিয়ে চিন্তা করেছেন। তাঁর মতে সরকারের বিভাগ হল সিনেট ও আধিকারিকরা। রাজাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য ধর্মীয়, পেরি ও সামাজিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের নিয়ে সিনেট গঠিত হয়। আধিকারিকদের মধ্যে যাঁদের কাজ মন্ত্রণাদান তাদের কাজ হল সার্বভৌমের আদেশ কার্যকর করা। তাছাড়াও নৈতিক ও বিচারসংক্রান্ত আধিকারিক হলেন ম্যাজিস্ট্রেট। সার্বভৌম রাজা ঈশ্বরের বিধান মেনে চললে তাঁর আদেশ ম্যাজিস্ট্রেটরা মানতে বাধ্য, নতুবা নন।

বোদাঁ অর্থনৈতিক নীতি প্রসঙ্গেও মতামত দিয়েছেন। সুদের কারবার তিনি পছন্দ করতেন না। তবে বৈধ উপায়ে ব্যবসা মেনে নিয়েছেন। মুদ্রা সংক্রান্ত নীতি ও করধার্যের নীতিও তিনি আলোচনা করেছেন।

রাষ্ট্রীয় চুক্তির মর্যাদার কথা তিনি বলেছেন। চুক্তি করা ও চুক্তি রক্ষা করাকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে কর্তব্যবোধ যে চুক্তির মাধ্যমে জাগরিত হয় তাও নির্দেশ করেছেন। তিনি অন্ধ জাতীয়তাবাদের বদলে আন্তর্জাতিকতাবোধ দ্বারা প্রভাবিত জাতীয়তাবাদের কথা বলেন।

অনুশীলনী — ৩

১। বোডিনের রাষ্ট্র সংক্রান্ত তত্ত্ব আলোচনা কর। (উত্তর ৫০ পংক্তির মধ্যে হবে।)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২। সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে বোডিনের ধারনা ব্যক্ত কর ? (উত্তর ৫০ পংক্তির মধ্যে হবে।)

.....

৩। বোডিনের মতে রাষ্ট্র ও সরকারের রূপগুলি কী কী? (উত্তর ৫০ পংক্তির মধ্যে হবে।)

৪। নাগরিকতা সম্বন্ধে বোডিন কী বলেছেন? (উত্তর ৩০ পংক্তির মধ্যে লিখুন।)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৫। বিপ্লব সম্বন্ধে বোডিনের বক্তব্যগুলি কী কী ? (উত্তর ২০ পংক্তির মধ্যে হবে।)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৫৬.৫ মূল্যায়ন

রাষ্ট্রচিন্তায় বোদাঁর গুরুত্ব প্রসঙ্গে পরস্পর বিরোধী নানা বক্তব্য আছে। বোদাঁর ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, ঐতিহাসিকতা, তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী, বিশ্লেষণমূলক চিন্তা ইত্যাদি যেমন প্রশংসিত হয়েছে, তাঁর চিন্তার অসঙ্গতি, অস্পষ্ট ব্যাখ্যা ও সামঞ্জস্যহীনতা তেমনি সমালোচিত হয়েছে। তাঁর চিন্তায় আছে বিজ্ঞান ও অধিবিদ্যার সহাবস্থান, কঠোরতা ও উদারতার সংযোগ এবং নতুন ও পুরোনোর সংমিশ্রণ।

কিছু সমালোচনা সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে বোডিনের চিন্তা সমকালীন ইউরোপে, বিশেষত ফ্রান্সে ও

ইংল্যান্ডে খুবই প্রভাব বিস্তার করেছিল। পরবর্তীকালে হবস, মন্টেস্কু বা ফিলমারের চিন্তাধারায় তাঁর প্রভাব দেখা যায়। অ্যারিস্টটলের পর বোদাঁই প্রথম রাষ্ট্রতত্ত্বকে বিজ্ঞানের আসনে বসান এবং রাষ্ট্রতত্ত্বের পুনরুদ্ধার করেন। ম্যাকিয়াভেলি একাজে কিছুটা অগ্রসর হলেও পুরোপুরি সফল হতে পারেননি। ম্যাকিয়াভেলি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও গবেষণার গুরুত্ব বুঝেছিলেন এবং রাজনীতিতে তা প্রয়োগও করেন। কিন্তু সরকারী কার্যকলাপের মধ্যে তা সীমিত ছিল। তত্ত্বগত কোন ভিত্তি তিনি দেননি।

একজন দার্শনিকের মত পর্যবেক্ষণের সাহায্যে বোদাঁ সমাজ ও রাষ্ট্রসংক্রান্ত আলোচনা করেছেন। গেটেলের মতে, ইতিহাসের দর্শন রচনার কৃতিত্ব তাঁর। বোদাঁই প্রথম বলেন যে ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণের সাহায্যে রাষ্ট্রতত্ত্ব নির্মাণ করা প্রয়োজন, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যে ইতিহাসের বিকাশ ও গতির ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হয়, একথাও বোডিন প্রথমে বলেন। বিভিন্ন যুগের প্রতিষ্ঠান ও আইনের তুলনামূলক ব্যাখ্যার সাহায্যে রাজনীতিপাঠের কথাও তাঁর অবদান।

অ্যারিস্টটলের মত বোদাঁ বা বোডিন রাষ্ট্রকে প্রাকৃতিক প্রতিষ্ঠান মনে করেন। পরিবার থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তির কথা বলেন এবং রাষ্ট্রের হাতে চরম কর্তৃত্ব দেন। কিন্তু অ্যারিস্টটল যেখানে নৈতিক দিক থেকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের যথার্থ নিরূপণ করেন, বোডিন সেখানে আইনগত ভিত্তির ওপর রাষ্ট্রকে বসান। তাই অ্যারিস্টটল সুন্দর জীবনের নৈতিক আদর্শের কথা বলেন আর বোডিন সার্বভৌমিকতার আইনগত প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন।

বোদাঁ ছিলেন জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক। তাই শৃঙ্খলা ও বিধিবদ্ধতার প্রশ্ন তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ। পলিকিউজ গোষ্ঠীর সক্রিয় সদস্য হিসাবে সমাজশৃঙ্খলা, জাতীয় সংহতি ও ঐক্যপ্রতিষ্ঠার প্রশ্ন নিয়ে তিনি ভাবনা চিন্তা করেছেন। এ প্রসঙ্গেই এসেছে তাঁর সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব, যার গুরুত্ব অবশ্যই অনস্বীকার্য। জাতীয় রাষ্ট্রের অস্তিত্ব যে সার্বভৌমিকতাকে কেন্দ্র করেই , এই প্রত্যয় বোদাঁই প্রথম ব্যক্ত করেন। তাঁর সময় থেকে আজ পর্যন্ত সার্বভৌমিকতাই রাষ্ট্রের অন্যতম উপাদান হিসাবে স্বীকৃত হয়ে আসছে।

নাগরিকের আনুগত্য শুধুমাত্র সার্বভৌমের কাছে, গীর্জা বা পোপের কাছে নয়, এই কথা বলে তিনি মধ্যযুগীয় গীর্জা বা রাষ্ট্রের দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটান। বোদাঁ রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করলেও তাকে স্বৈরতন্ত্রে পরিনত করেননি।

ব্যক্তিকে তিনি নিদিষ্ট অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থার প্রকাশ হিসেবে দেখেছেন। পরিবার, পরিবারের কর্তৃত্ব, নাগরিকতা, জাতীয়তাবোধ, রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব, রাষ্ট্র ও সরকারের পার্থক্য, সরকারের শ্রেণীবিভাগ, বিপ্লব, চুক্তি, আইন, পরিবেশ প্রসঙ্গ, অর্থনীতি ইত্যাদি বিভিন্ন জাগতিক প্রশ্ন এবং সৌরজগৎ, জ্যোতিষবিদ্যা , যাদুবিদ্যা ইত্যাদি অতিজাগতিক প্রশ্নও তাঁর আলোচনায় আছে। তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার পরিধি ছিল খুবই বিস্তৃত।

ষোড়শ শতকে বোডিন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের ভিত্তিতে গঠিত সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্রের

বিকাশকে স্বাগত জানান এবং আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের পথ প্রশস্ত করেন। ষোড়শ শতকের শেষ পর্যায়ে উদীয়মান ব্যবসায়ী শ্রেণী তাদের অগ্রগতির স্বার্থে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিশালী কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রয়োজন বোধ করেছিল, যে কর্তৃত্বের অধীনে তারা নিরাপদে ব্যবসা চালাতে পারে। বোডিন আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠার আগেই জাতীয় রাষ্ট্রের ভিত্তি নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছিলেন এবং জাতীয় রাষ্ট্রের তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণ করেন। তাঁর সার্বভৌমিকতা তত্ত্ব দ্বারা জাতীয় রাষ্ট্রে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে বোডিন ব্যবসায়ীদের শক্তিশালী কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রয়োজন পূর্ণ করেন। সার্বভৌম কর্তৃত্ব কোন আধিভৌতিক শক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়, মানুষ দ্বারা মানুষের স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত বলে সার্বভৌমিকতার মানবিক উৎপত্তির কথা বলেন। তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তির তত্ত্বও বুর্জোয়াদের স্বার্থেই রচিত।

অনুশীলনী — ৪

১। বোদাঁর রাষ্ট্রচিন্তার মূল্যায়ন কর। (উত্তর ৩০ পংক্তির মধ্যে হবে।)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৫৬.৬ সারাংশ

ষোড়শ শতকের ফ্রান্সের এক রাষ্ট্রচিন্তাবিদ বোদাঁ বা বোডিন তাঁর সময়ের ফ্রান্সের ধর্মজনিত ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতা এবং অশান্তির পরিবেশে শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রয়োজন অনুভব করেন। তাঁর সময়ের উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীও নিশ্চিন্তে ব্যবসা চালানোর জন্য শক্তিশালী ধর্মনিরপেক্ষ রাজার প্রয়োজন অনুভব করে। বোডিন তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্ব ও সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব দ্বারা শক্তিশালী রাজনৈতিক কর্তৃত্বের তত্ত্বগত ভিত্তি নির্মাণ করেন। তিনি সরকারের বিভিন্ন রূপ, নাগরিকতা, বিপ্লব, রাজনীতির ওপর পরিবেশের প্রভাব, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করেছেন। তাছাড়াও জ্যোতিষবিদ্যা বা যাদুবিদ্যা নিয়েও তিনি লিখেছেন। তাঁর রাজনৈতিক বক্তব্য ছিল তৎকালীন ফ্রান্সের অশান্তি ও অরাজকতা বন্ধ করা। এজন্য শুধু কলম ধরেই তিনি ক্ষান্ত হননি, সক্রিয়ভাবে পলিকিউজ গোষ্ঠীর সদস্য হিসাবে শান্তিস্থাপনের বাস্তব প্রচেষ্টাও করেছেন।

তাঁর তত্ত্ব সমালোচিত হয়েছে নানাভাবে। তবে রাজনীতির তত্ত্ব নির্মাণ প্রচেষ্টার অভিনবত্ব তাঁকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সমাজের ওপর পরিবেশের প্রভাব স্বীকার করে তিনি রাজনৈতিক সমাজ তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেছেন।

৫৬.৭ অনুশীলনী

১। . বোডিনের সময়ের ফ্রান্সের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন। (উত্তর ৫০ পংক্তির মধ্যে হবে।)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২। বোডিনের রাষ্ট্রচিন্তার বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী ? (উত্তর ৫০ পংক্তির মধ্যে হবে।)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৩। বোডিনের রাষ্ট্রচিন্তার মূল্যায়ন করুন। (উত্তর ৫০ পংক্তির মধ্যে হবে।)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৫৬.৮ উত্তরমালা

অনুশীলনী — ১

১। ৫৬.২ - এর প্রথমাংশ দেখুন

২। ৫৪.২ - এর শেষাংশে আছে

অনুশীলনী — ২

১। ৫৬.৩ - এ দেখুন

অনুশীলনী — ৩

১। ৫৬.৪ ও ৫৬.৪.১ - এ দেখুন

২। ৫৬.৪.২ - এ আছে

৩। ৫৬.৪.৩ - এ দেখুন

৪। ৫৪.৪.৪ - এ আছে

অনুশীলনী — ৪

১। ৫৬.৫ - এ দেখুন

৫৪.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১। G.Gettel, *History of Political Thought*, George Allen and Unwin Ltd., London, Cheaper Edition, 1932, Chap.X.

২। G. H. Sabine, *A History of Political Theory*, Oxford & IBH Publishing Co., Indian Edition, 1961, Ch.20.

৩। A History of Political Theory From Luther to Montesquien, Central Book Deprt, Allahabad,1970, Ch.iii.

৪। Amal Kumar Mukhopadhyay, *Western Political Thought*, K.P. Bagchi & Co., Calcutta, 1980, Ch.4.

৫। সুভাষ সোম, *রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস*, ক্যালকাটা বুক হাউস প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৯৯৫, অধ্যায় ১৩।

৬। দেবাশীষ চক্রবর্তী, *রাষ্ট্রচিন্তার ধারা*, সেন্ট্রাল বুক পাবলিশার্স, কলকাতা,১৯৯০ অধ্যায় ৫,

৭। প্রাণগোবিন্দ দাস, *রাষ্ট্রচিন্তার ইতিবৃত্ত*, সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, কলকাতা১৯৮৬, অধ্যায় ১০,

৮। অমৃতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, *রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস*, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৯৬, অধ্যায় ১২।

একক ৫৭ □ টমাস হব্‌স (১৫৮৮-১৬৭৯)

গঠন

৫৭.০ উদ্দেশ্য

৫৭.১ প্রস্তাবনা

৫৭.২ হবসের সময়ের সামাজিক পরিবেশ

৫৭.৩ হবসের চিন্তার সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি

- ৫৭.৩.১ হবসের চিন্তায় মানব প্রকৃতি
- ৫৭.৩.২ হবস্ বর্ণিত প্রাকৃতিক সমাজ
- ৫৭.৩.৩ সামাজিক চুক্তি
- ৫৭.৩.৪ রাষ্ট্রতত্ত্ব
- ৫৭.৩.৫ সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব
- ৫৭.৩.৬ নাগরিক অধিকার
- ৫৭.৩.৭ রাষ্ট্র সার্বভৌমিকতার ব্যাপ্তি

৫৭.৪ ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ এবং উদারনীতিবাদের প্রশ্নে হবসের অবস্থান

৫৭.৫ রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার ধারণা

৫৭.৬ সাম্য এবং নারীর অবস্থান সম্পর্কে হবসের বক্তব্য

৫৭.৭ হবসের চিন্তার মূল্যায়ন

৫৭.৮ সারাংশ

৫৭.৯ অনুশীলনী

৫৭.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৫৭.০ উদ্দেশ্য

ইওরোপের রাজনৈতিক চিন্তার বিবর্তনে আধুনিক ধারার প্রবর্তনে যাদের ভূমিকা বিশেষ মূল্যবান তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন টমাস হবস। তিনি আধুনিক যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ ও রাজনীতি আলোচনার সুত্রপাত ঘটান। এই এককটি পাঠ করে আমরা জানতে পারব—

- নবজাগরণের পরবর্তী সময়ে ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি ।
- হবসের চিন্তার প্রবণতা।

- মানুষের প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক সমাজ সম্পর্কে তাঁর ভাবনা;
- সামাজিক চুক্তির প্রেক্ষাপট সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য;
- রাষ্ট্রপ্রকৃতি এবং রাষ্ট্র সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে তাঁর অবস্থান;
- নাগরিক অধিকার, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র ও রাষ্ট্র কর্তৃত্বের সীমা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য;
- রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা ও আনুগত্যের প্রশ্নে তাঁর অবস্থান;
- সাম্য ও নারীর অধিকার সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য;
- পরবর্তী প্রজন্ম ও চিন্তা হবস কীভাবে প্রভাবিত করেছেন ইত্যাদি।

৫৭.১ প্রস্তাবনা

প্রত্যেক দার্শনিক ও ব্যক্তিত্বের জীবন পথে ঘটে যাওয়া আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা তাঁর জীবনে স্থায়ী প্রভাব রেখে যায়। ঐ স্থায়ী প্রভাব থেকে জন্ম নেয় তাঁদের বিশ্বাস ও চিন্তা। ইংল্যাণ্ড তথা ইউরোপের প্রখ্যাত দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম টমাস হবসও এই প্রবণতার ব্যতিক্রম নন। হবসের বক্তব্যের মৌলিকত্ব এবং অভিনবত্বের মধ্যে রয়েছে ইংল্যাণ্ডের সমসাময়িক ঘটনাবলীর প্রভাব। তাঁর বক্তব্যের আপাত রূঢ়তা ও কঠোরতা সত্ত্বেও যুক্তির গভীরতাকে আজও অস্বীকার করা যায় না। শান্তি শৃংখলা এবং নিরাপত্তা চেতনাকে কেন্দ্র করে তিনি ইংল্যাণ্ডের অশান্ত অস্থির পরিবেশের অবসান কামনা করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিসত্ত্বা এবং সর্বপরিব্যপ্ত সার্বভৌম শক্তির মধ্যে মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছেন। স্থিতিশীল সমাজ এবং জীবনের পথ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি এরিষ্টটল প্রদর্শিত পথের বিপরীতে চলেছেন এবং বলেছেন যে মানুষ প্রকৃতিগতভাবে সামাজিক নয়, বাস্তব পরিস্থিতির চাপে, আত্মসংরক্ষণের তাগিদে কৃত্রিমভাবে মানুষ রাজনীতি এবং রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে প্রবেশ করেছে। আত্মসংরক্ষণের প্রবৃত্তি মানুষের সহজাত অভিব্যক্তি আর সেই অভিব্যক্তি থেকেই মানুষ কৃত্রিম প্রয়াসে সমাজজীবন ও রাষ্ট্র গড়ে তুলেছে। এই আত্মসংরক্ষণমুখী মানুষ অন্যের প্রতি কী আচরণ করবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এই উপলব্ধি থেকেই হবস প্রাকৃতিক সমাজের নিদারুণ চিত্র অঙ্কন করেছেন। মানুষের স্বাতন্ত্রবোধ এবং অভাববোধ সম্পর্কে হবস সচেতন ছিলেন এবং এই জন্য কর্তৃত্বের প্রসার ঘটাতে তৎপর ছিলেন, তৎপর ছিলেন কর্তৃত্ব ও স্বাতন্ত্রের সমন্বয় ঘটাতে। এই প্রেক্ষাপটে হবসের দর্শন গড়ে উঠেছে। পরবর্তী অংশগুলিতে বিষয়টি প্রাঞ্জলভাবে আলোচিত হবে।

৫৭.২ হবসের সময়ের সামাজিক পরিবেশ

আধুনিক পাশ্চাত্য রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিকাশে যাঁদের ভূমিকাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় তাঁদের মধ্যে টমাস হবস নামটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ব্রিটিশ রাষ্ট্রদার্শনিক রাজনীতি সম্পর্কিত যে বস্তুবাদী বিশ্লেষণধারার প্রবর্তন ঘটান তা সমসাময়িক সময় ও পরবর্তী প্রজন্মের বৌদ্ধিক প্রবণতাকেও

বিশেষভাবে আলোড়িত করেছিল। হবস একই সঙ্গে প্রসিদ্ধি এবং নিন্দার পাত্র ছিলেন কারণ তাঁর তীব্র জোরালো এবং সুবিন্যস্ত বক্তব্য সমসাময়িক ব্রিটিশ ও ইউরোপীয় রাজনীতি ও সমাজচিন্তাকে প্রভাবিত করে। তাঁর অনেক সিদ্ধান্তই নির্মম যা চেতনাকে কশাঘাত করে; চরম সার্বভৌম কর্তৃত্বের স্বপক্ষে তাঁর জোরালো যুক্তি আবার উদীয়মান গণতন্ত্রীদের কাছে নিন্দনীয় হয়ে ওঠে। হবসের সমসাময়িক ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক, সামাজিক প্রেক্ষাপটকে বিশ্লেষণ করলে তার তত্ত্বকে ঘিরে গড়ে ওঠা বিতর্ককে অনুধাবণ করা সম্ভব।

হবসের সময়ে ইংল্যাণ্ডের সমাজ ও রাজনীতি এক চরম অস্থিরতার শিকার হয়েছিল। তিনি Elements of Law ১৬৫০ সালে এবং De Cive ১৬৪২ সালে প্রকাশ করেন। এরও বেশ পরে ১৬৫১ সালে তিনি তার Leviathan গ্রন্থ প্রকাশ করেন যা তাকে প্রসিদ্ধি বা বিতর্কিত পরিচিতি দিয়েছিল। ১৬৪২ থেকে ১৬৪৯ সালের মধ্যে সংঘটিত গৃহযুদ্ধ যা রাজা প্রথম চার্লস এবং পার্লামেন্টের মধ্যে কর্তৃত্বের প্রতিদ্বন্দিতাকে সবার সামনে নিয়ে এসেছিল। এই ঘটনা হবসকে অত্যন্ত সচকিত, করে তুলেছিল কারণ এ ধরণের সংঘাত ইংল্যাণ্ডের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকারক ছিল। এজন্য হবস বলিষ্ঠভাবে চরম ও অপ্রতিদ্বন্দী সার্বভৌম কর্তৃত্বের পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন।

ইংল্যাণ্ডে গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতিতে ১৬৪২ সালে হবস De Cive প্রকাশ করেন এবং বলিষ্ঠভাবে রাজকীয় বিশেষাধিকারকে Royal Prerogative সমর্থন করেন। এর দরুন তিনি Long Parliament - এর বিরাগভাজন হন এবং অন্তরীণ হবার আশংকায় ভীত হয়ে ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করে ফ্রান্সে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফ্রান্সে ঘটনাক্রমে তিনি নির্বাসিত ইংরেজ রাজকুমার Prince of Wales-এর গৃহশিক্ষকতা করেন এবং এই সময়েই তিনি Leviathan প্রকাশ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য পরবর্তী পর্যায়ে এই Prince of Wales-ই দ্বিতীয় চালর্স রূপে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে আরোহন করেন। তবে হবস বেশীদিন ফ্রান্সে থাকতে পারেন নি কারণ তার নাস্তিকতা ইংল্যাণ্ডের ষ্টুয়ার্ট রাজ পরিবারের সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী রাজপরিবারেও অসন্তোষ জাগিয়ে তোলে। দেশান্তরী হয়ে আবার তিনি ইংল্যাণ্ডে ফিরে আসেন ও এখানেই ৯১ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি রেখে যান যেসব রচনা ও গ্রন্থ সেগুলি তাঁর যুগের আকাঙ্ক্ষা ও প্রবণতাগুলিকে প্রতিফলিত করেছে। তাই হবসকে বুঝতে গেলে তাঁর যুগকে ও সেই যুগের প্রবণতাকে বুঝতে হবে।

৫৭.৩ হবসের চিন্তার সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি

হবস তাঁর Leviathan গ্রন্থে শুধুমাত্র শক্তিশালী রাজতন্ত্রের স্বপক্ষেই মত ব্যক্ত করেননি' সেই সঙ্গে ধর্ম সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা এবং রাজনীতির উপর তার প্রভাবও আলোচনা করেছেন। চার্চ বনাম রাষ্ট্রের ক্ষমতার দাবী সম্পর্কিত বিতর্ক যা সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে তীব্রতা অর্জন করেছিল তাকে Leviathan গ্রন্থ ইংল্যাণ্ডে সম্প্রসারিত করে ও সেই সঙ্গে জাতিরাষ্ট্রের বৈধতাকে প্রমাণিত করতে

সচেষ্ট হয়। তবে মানব প্রকৃতি সম্পর্কিত তাঁর নেতিবাচক মানসিকতা বা উগ্র রাজতন্ত্রপন্থী বক্তব্যের জন্য তাঁকে কম অপমান সহ্য করতে হয়নি। তা সত্ত্বেও রাষ্ট্র, রাজনীতি ও কর্তৃত্ব সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য সবদিক দিয়েই বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী যুক্তিবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত।

হবসের রাজনৈতিক চিন্তার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির মূলে রয়েছে আধুনিকতা। হবসই প্রথম চিন্তাবিদ যিনি রাজনৈতিক তত্ত্বকে এক আদ্যান্ত আধুনিক ব্যবস্থামণ্ডিত রূপ দিতে চেয়েছিলেন। প্রকৃতি জগতের ঘটনাক্রম ও মানুষের আচরণের সামাজিক এবং ব্যক্তিগত দিকগুলিকে তিনি যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক সূত্রের দৃঢ় সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। মানুষকে পরিচালিত করে তার মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা আর এই প্রবণতাকে কেন্দ্র করেই হবস তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্বকে গড়ে তুলেছেন। এইদিক দিয়ে বিচার করলে হবসকে তার পূর্বসূরীদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশী আধুনিক বলে স্বীকার করতেই হবে। গ্যালিলিও বস্তুর গতিশীলতা সম্পর্কিত যে তত্ত্ব নির্মাণ করেছিলেন হবস তা গ্রহণ করেন এবং বলেন যে মানুষ এই বস্তুময় জগতের অংশ এবং বস্তুজগতের ন্যায়ই মানুষের জীবন ও চেতনা গতিশীল। তাঁর বিশ্বাস এই গতিশীলতার মধ্যে রয়েছে এক প্রকার ছন্দ বা নিয়ম। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ঐ একই নিয়ম ক্রীয়াশীল। বস্তুময় বিশ্বের অঙ্গ হিসাবে মানুষ পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও গতিশীলতার সূত্রের দ্বারা পরিচালিত হয়। হবসের মূল প্রয়াস ছিল এই গতিশীলতার সুনির্দিষ্ট সূত্রটি খুঁজে বার করা। হবস স্থির নিশ্চিত ছিলেন যে মানুষের অনুভূতি স্থির বা অনড় নয়, তার স্পর্শ ও ঘ্রাণক্ষমতা, তার অনুপ্রেরণা ও ইন্দ্রিয় সবই গতিশীল। মানুষ কী চায় বা কী তার অপছন্দ এ জাতীয় সব বিষয়ই তার অনুভূতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রাকৃতিক জগতের গতিশীলতার সূত্রকে হবস বস্তুজগতে প্রয়োগ করেছেন বলেই তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে মানুষ সততই তার প্রেয় বস্তুকে কামনা করে ও তার ইচ্ছাশক্তিকে জাগ্রত করে। যা কিছু তার কাছে অনভিপ্রেত তা সে কামনা করে না। আবার শুভ বা অশুভ এই পরিচিতি স্থায়ী নয়, কারণ মানুষের অনুভূতি পরিবর্তনশীল এবং এ জন্যই শুভ বা অশুভ এই চিহ্নিত করার বিষয়টি পরিবর্তনশীল পরিবেশে বদলে যায়।

৫৭.৩.১ হবসের চিন্তায় মানব প্রকৃতি

সুখের অন্বেষণে ব্যাপৃত মানুষ তাই আমৃত্যু সাফল্যের পিছনে দৌড়ায়। এজন্য হবস বর্ণিত মানবচরিত্র আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর, ক্ষমতালিপ্সু। সব মানুষই পরস্পর প্রতিযোগী, সকলেই সকলের শত্রু—একে অপরের সুখে ভাগ বসাতে আগ্রহী। কিন্তু একই সঙ্গে মানুষ ভাবের আদান-প্রদানে সমর্থ বলে সে সামাজিক প্রাণীও বটে। সমাজে বিরাজমান যুদ্ধাবস্থায় মানুষ নিরাপত্তা চায়, চায় মুক্তির আস্বাদ। প্রাকৃতিক সমাজের এই নির্মম বাস্তবতা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা সামাজিক মানসিকতার পরিচায়ক, যে মানসিকতা থেকে চুক্তির ধারণা সৃষ্টি হয়েছে।

৫৭.৩.২ হবস বর্ণিত প্রাকৃতিক সমাজ

হবসের বর্ণনায় যে প্রাকৃতিক সমাজের চিত্র ফুটে উঠেছে তা গভীর হতাশা জাগিয়ে তোলে। এ্যারিষ্টটল বা

বোঁদা যে অর্থে মানুষকে সামাজিক প্রাণী বলে মনে করতেন হবস সেই অর্থ গ্রহণ না করে বাস্তববাদী দৃষ্টিকোণ (Materialistic viewpoint) থেকে উপলব্ধি করেন যে প্রাকৃতিক সমাজে মানুষ স্বাভাবিক অধিকার ভোগ করলেও বলপ্রয়োগের অনিয়ন্ত্রিত প্রবণতায় প্রতিনিয়ত মৃত্যুভয়ে আতঙ্কিত ছিল। তিনি এই প্রাকৃতিক সমাজে মানুষের জীবনে তিনটি প্রবণতার কথা বলেছেন। প্রথমত মানুষের মধ্যে রয়েছে এক লুণ্ঠনের প্রবৃত্তি যা প্রাকৃতিক সমাজে শক্তিমানকে দুর্বলের সম্পত্তি গ্রাসে উৎসাহিত করত। এই প্রবৃত্তিরই অনুষঙ্গ হল দ্বিতীয় প্রবণতা, অর্থাৎ, ভোগদখলী মানসিকতা — লুণ্ঠিত বস্তুর উপর নিজ অধিকার কায়েম করা। তৃতীয়ত প্রবণতা হল গৌরবের প্রতি অদম্য আকাঙ্খা ও সেই সঙ্গে অপরের স্তুতি পাওয়া, হিংসা উদ্রেক করার প্রবল ইচ্ছা। যেহেতু প্রাকৃতিক সমাজে এগুলি মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা তাই এই সমাজে জীবন কদর্য হতে বাধ্য। প্রাকৃতিক সমাজের এই চিত্রণ পরবর্তী প্রজন্মের চিন্তাবিদদের খোরাক যুগিয়েছে। তাঁর বক্তব্য অব্যর্থভাবে লক ও রুশোকে প্ররোচিত করেছিল। মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে হবসের নিষ্করুণ বর্ণনার অবশ্য কোনও ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ নেই। বোঁদা এবং গ্রোটিয়াস উভয়েই বলেছেন যে প্রাকৃতিক সমাজের প্রধান বুনিয়াদ ছিল নৈতিকতার বিধান। হবস একথা স্বীকার করেন নি বরং আইন, অর্থাৎ, বিধান বলতে তিনি উর্দ্বতন কোন মানবীয় নির্দেশকে বুঝিয়েছেন যে নির্দেশের ভিত্তি হল মানুষের সুবিধার ধারণা। তাঁর মতে প্রাকৃতিক সমাজে কোন উর্দ্বতন কর্তৃত্ব না থাকায় কোন আইনও ছিল না। হবস নৈতিক বিধানের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রসঙ্গে স্পষ্টতই দ্বিধাগ্রস্ত, কারণ প্রাকৃতিক সমাজে নৈরাজ্যের কথা উল্লেখ করবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলেছেন যে প্রাকৃতিক সমাজে পনেরটি নৈতিক বিধান প্রচলিত ছিল যার প্রথমটিতেই মানুষকে শান্তিপ্রেমী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এইভাবেই প্রাকৃতিক সমাজের চিত্রণে হবস স্ববিরোধী মত ব্যক্ত করেছেন।

৫৭.৩.৩ সামাজিক চুক্তি

হবস প্রাকৃতিক সমাজকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা আলোচনা করার পর তার বর্ণিত সামাজিক চুক্তি মতবাদ সম্পর্কে কিছু প্রাসঙ্গিক মন্তব্য করা প্রয়োজন। আত্মসংরক্ষণে স্বাভাবিকভাবে আগ্রহী মানুষ প্রাকৃতিক সমাজের এই অনিশ্চয়তা দূর করবার জন্য পরস্পরের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং চুক্তির মাধ্যমে স্বশাসনের অধিকার কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের হস্তে অর্পণ করে। এই চুক্তি শাসক ও শাসিতের মধ্যে স্বাক্ষরিত নয় বরং সব মানুষ পরস্পর মিলিত হয়ে এই চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। সার্বভৌম শক্তি এই চুক্তির অংশীদার নয়, পরিবর্তে চুক্তি দ্বারা সৃষ্টি একটি সত্তা। এই চুক্তি স্বাক্ষরকারী মানুষের মধ্যে কোন গোষ্ঠী চেতনা কাজ করেনি বলেই হবস মনে করতেন, কারণ এই চুক্তি স্বাক্ষরকারী মানুষ ছিল স্বাভাবিক ব্যক্তি মানুষ। এই মানুষ তাই সার্বভৌমের উর্দ্ধে স্থাপিত ছিল না। আদিম স্তর থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত মানুষ সামাজিক গুণাবলী অর্জন করার প্রচেষ্টায় সমানভাবে লিপ্ত, কারণ এই গুণাবলী যুদ্ধ ও নৈরাজ্যের ভীতি থেকে মানুষকে মুক্ত করে। এই মানসিকতাই সামাজিক চুক্তির প্রেক্ষাপট রচনা করেছিল। সপ্তদশ শতকের ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধ জনিত অরাজকতার মধ্যেই রাষ্ট্রিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের স্বপক্ষে তিনি যে জোরালো সমর্থন ব্যক্ত করেছিলেন তা সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থেই রাষ্ট্রিক ভূমিকাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল। হবসের কথায় সামাজিক চুক্তি Jus Naturale

অর্থাৎ, স্বাধীনতার রাজ্য থেকে Lex Naturalis অর্থাৎ, আইনের রাজ্যে বা যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নিয়মের রাজ্যে মানুষকে পৌঁছে দেয়।

৫৭.৩.৪ রাষ্ট্রতত্ত্ব

বহু মানুষের একক সত্তায় মিশে যাওয়ার এই সংযুক্তির মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে রাষ্ট্র বা কমনওয়েলথ, যাকে হবস বলেছেন Leviathan বা "রাষ্ট্রদানব"। এই রাষ্ট্রদানবের যে রূপ হবস নির্দেশ করেছেন তার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল— রাষ্ট্র বহু মানুষের সম্মিলিত প্রয়াসে স্বার্থত্যাগ দ্বারা সৃষ্ট; এর ফলে রাষ্ট্রে একক ব্যক্তিত্বের উদ্ভব ঘটে, যা রাষ্ট্রকে Leviathan বা রাষ্ট্রদানবে পরিণত করেছে। এর ব্যাপক ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব অবাধ, যা সমস্ত আইন ও নিয়ন্ত্রণের উর্দ্ধে এবং এর কোন ভাগ বাঁটোয়ারা সম্ভব নয়। প্রকৃতির রাজ্যের অবাধ স্বাধীনতা মানুষ রাষ্ট্রিক সমাজে রাষ্ট্রের হস্তে অর্পণ করে এবং বিনিময়ে পায় জীবন ও সম্পত্তির স্বাধীনতা। সুতরাং হবসের বর্ণনায় রাষ্ট্র মানুষের অর্জিত প্রতিষ্ঠান। এই অর্জিত প্রতিষ্ঠানের কাছে নিঃশর্ত আনুগত্য অর্পণ করে মানুষ সামাজিক জীবন-যাপনে সমর্থ হয়। যে একক ব্যক্তি এই রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠানকে পরিচালিত করেন তিনি হলেন সার্বভৌম যার কর্তৃত্বের ভিত্তি মানুষের স্বতস্ফূর্ত আনুগত্য। এইভাবে হবসের কাছে রাষ্ট্র মানুষের সমাজ জীবনের সাংগঠনিক রূপ হিসেবে আবির্ভূত হয়।

৫৭.৩.৫ সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব

হবসের রাষ্ট্র সম্পর্কিত তত্ত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রয়েছে তার সার্বভৌমিকতা সম্পর্কিত তত্ত্ব। রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টিই সার্বভৌম যার কাজে মানুষ নিজের স্বার্থরক্ষাতেই আনুগত্য ব্যক্ত করে। হবসের মতে সার্বভৌমের সাহায্যে আইন ও নৈতিকতা উভয়েরই প্রতিষ্ঠা ঘটে যা সার্বভৌমকে আইন ও নৈতিকতার ধারক ও বাহকে পরিণত করে। এই সর্বভৌমের ইতিবাচক দিক হল এই যে, এটি মানুষকে ভয়াবহ আদিম অবস্থা থেকে উদ্ধার করে সভ্য জীনযাপনের পথে পরিচালিত করবার নিয়ম ও ব্যবস্থা গড়ে দেয়। প্রাকৃতিক রাজ্যে মানুষের যথেচ্ছাচারিতার স্বাধীনতা ছিল কিন্তু সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি করে স্বাভাবিক আইন যা মানুষকে যথেচ্ছাচারিতা থেকে মুক্ত করে সমাজজীবনের মধ্য দিয়ে প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগে সমর্থ করে। একই সঙ্গে সার্বভৌমিকতা নৈতিকতারও প্রবর্তন করেন। প্রাকৃতিক সমাজে যথেচ্ছাচারিতা ছিল বলে ন্যায় অন্যায় বোধ ছিল না। কিন্তু যে মূহুর্তে মানুষ রাষ্ট্রিক সমাজ গঠন করে সার্বভৌমের প্রতি আনুগত্য ব্যক্ত করতে শিখল সে মূহুর্তেই নৈতিকতা বোধ জাগ্রত হবার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হল। এই নৈতিকতাবোধ চুক্তির প্রতি আনুগত্য প্রকাশে এবং সমাজজীবনে অভ্যস্ত হতে মানুষকে সাহায্য করেছিল। সার্বভৌমিকতার চরম সত্তা এবং তার নৈতিকতাবোধ সম্পর্কে হবস যা বলেছেন তা পরবর্তীকালে সার্বভৌমিকতার আইনগত ধারণার ভিত্তিকে শক্তিশালী করে তুলতে সাহায্য করেছিল। হবসের মতে দুভাবে সার্বভৌম শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়— (ক) শক্তি প্রয়োগের দ্বারা, ভয় দেখিয়ে উচ্চতম শক্তির বশীভূত করা এবং (খ) নিজ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে স্ব ইচ্ছায় উচ্চতর শক্তির কাছে ক্ষমতা বা অধিকার অর্পণ করা। প্রথমটি অর্জিত এবং দ্বিতীয়টি প্রতিষ্ঠানগত সার্বভৌম। হবসের সার্বভৌমিকতা সম্পর্কিত

এই সব বক্তব্যের মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক প্রেক্ষপট নিহিত রয়েছে হবসের সময়কার ব্রিটেনের ইতিহাসে বাস্তবতার মধ্যে, যেখানে গৃহযুদ্ধের ভীতি ও নৈরাজ্যের পরিবেশ সাধারণ মানুষের সঙ্গে হবসকেও এক শক্তিশালী কর্তৃপক্ষের আবশ্যিকতা সম্পর্কে অবহিত করে তুলেছিল। হবস স্বাভাবিকভাবেই শক্তিশালী রাজতন্ত্রের পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। হবস যে রাষ্ট্রতত্ত্বের কথা বলেছেন তা আপেক্ষিক, কারণ এই প্রসঙ্গেই তিনি নাগরিক অধিকার, রাজনৈতিক আনুগত্য ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক রাজনৈতিক বিষয়গুলির অবতারণা করেছেন। এইভাবে হবস এক স্বয়ংসম্পূর্ণ রাজনৈতিক দর্শন সৃষ্টি করেছেন।

৫৭.৩.৬ নাগরিক অধিকার

নাগরিক অধিকার (Civil Rights) ও আনুগত্যের (alligience) প্রশ্নে হবসের অবস্থান অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি অবাধ নাগরিক অধিকার বা স্বাধীনতাকে মেনে নিতে পারেন নি। কারণ এই আগেও বলা হয়েছে যে সার্বভৌমের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা বা নিজেকে রাষ্ট্রের কাছে সমর্পণ করার মধ্যেই মানুষের আসল স্বাধীনতা আছে বলে হবস মনে করতেন। সামাজিক চুক্তির সাহায্যে মানুষের নিয়মের রাজ্য তৈরী করেছে আর সেই রাজ্যেই মানুষ অর্জন করে প্রকৃত স্বাধীনতা। নিরাপত্তা ও শান্তির পরিবেশেই সৃষ্টি হয় এই স্বাধীনতা। হবস প্রাকৃতিক আইনের ভিত্তিতেই সামাজিক জীবনে স্বাধীনতা ও অধিকার সৃষ্টি করবার কথা বলেছেন। সার্বভৌমের সঙ্গে, মানুষের সৃষ্ট কর্তৃত্বের সঙ্গে অধিকারের সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমেই স্বাধীনতার দৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হয়। হবস মানুষকে চুক্তি ভঙ্গ করবার অধিকার দেন নি। আত্মরক্ষার অধিকার ছাড়া সব অধিকার সার্বভৌমকে অর্পণ করবার ফলে মানুষের চুক্তিভঙ্গের অধিকার নেই। হবস চুক্তিভঙ্গের অধিকার থেকে মানুষকে সচেতনভাবেই বঞ্চিত করেছেন, কারণ তার আশঙ্কা ছিল চুক্তিভঙ্গ করলে প্রাকৃতিক অবস্থার ভয়াবহ অরাজক পরিস্থিতি পুনরায় সৃষ্টি হবে। সার্বভৌম প্রজার কাছে দায়বদ্ধ কিনা সে প্রশ্নের মধ্যে প্রবেশ না করে হবস প্রজাবর্গ চুক্তির শর্ত পালন করছে কিনা সে বিষয়ের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। হবস সার্বভৌম কর্তৃপক্ষকে চুক্তির উর্দ্ধে স্থাপন করেছেন এবং চুক্তির অংশ না হওয়ায় সাবভৌম চুক্তির কাছে অর্থাৎ চুক্তি স্বাক্ষরকারী প্রজাদের কাছে কোনভাবেই দায়বদ্ধ নয়। হবসের এই যুক্তি নাগরিক অধিকারের প্রশ্নে সার্বভৌমের ইচ্ছাকেই চরমত্ব প্রদান করেছে।

তবে হবসকে সর্বতোভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতার বিরোধিতার দায়ে অভিযুক্ত করলেও এরূপ সমালোচনার বাস্তব ভিত্তি সম্পর্কে সন্দেহ থেকেই যায়। হবস ব্যক্তিগতভাবে প্রজার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন যে মানুষের স্বাধীনতাবোধ তার যুক্তিবোধ দ্বারা পরিচালিত। সুতরাং হবসের মতে সেই স্বাধীনতাই শ্রেয় স্বাধীনতা যা মানুষকে তার সামাজিক দায়িত্বপালনের পথে উদ্বুদ্ধ করে। আইনের নিয়ন্ত্রণপাশ থেকে মুক্ত হয়ে প্রাকৃতিক ব্যবস্থার স্বাধীনতার ভোগ করলেই স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হয় না, যে কারণে সার্বভৌমের নিয়ন্ত্রণের অধীন হওয়ার মাধ্যমেই স্বাধীনতা ভোগের পরিবেশ গড়ে ওঠে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা সুরক্ষিত হয়। এরূপ রাষ্ট্রের মধ্যেই প্রজার বা নাগরিকের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত হয়। রাষ্ট্রের বাইরে মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকতে পারে না। এই সব যুক্তির সাহায্যে হবস এক শক্তিশালী রাষ্ট্র (Leviathan) ও সমাজ গঠনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন, কারণ তৎকালীন ইংল্যাণ্ডের অরাজক পরিস্থিতি সত্যি সত্যিই ব্যক্তিস্বাধীনতা ভোগের উপযোগী

ছিল না। শক্তিশালী সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধীন ঐক্যবদ্ধ সমাজেই অধিকারভোগের প্রেক্ষাপট রচিত হতে পারে, এই ছিল হবসের দৃঢ় প্রত্যয়।

যখন সমাজের সব ব্যক্তি সমাজাতীয় একগুচ্ছ আইন মান্য করে তখন সমাজের সদস্যবর্গের মধ্যে সমতার বাতাবরণ গড়ে ওঠে। এই অবস্থায় কেউ কারও চেয়ে বেশী অধিকার ভোগ করে না। ফলে সার্বভৌম কর আরোপণে বা ন্যায়ের আদর্শ অনুসরণে সকলের প্রতি সমান আচরণ করে থাকেন। ন্যায়ের আদর্শ বলতে হবস সুস্পষ্টভাবে সকলের প্রতি সমতাপূর্ণ আচরণ এবং সমানাধিকারের পরিবেশ সৃষ্টির কথা বলেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্বপালনের মধ্যেও ন্যায়ের আদর্শ উপস্থিত, কারণ নির্ধারিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালিত না হলে সামাজিক বৈষম্যের পরিবেশ গড়ে ওঠে। হবস ন্যায়কে সদাচার (Fairness) এবং একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে যেরূপ আচরণ প্রত্যাশা করে সেরূপ আচরণকে প্রতিপালনের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন। মানুষ যখন একবার সার্বভৌম শক্তি সৃষ্টি করে তখন তার উপর সকল ক্ষমতা অর্পিত হয়। হবস এই সার্বভৌম শক্তিকে লেভিয়াথান অর্থাৎ "Mortal God" বা পার্থিব জীবনের ঈশ্বর বলে গণ্য করেন।

৫৭.৩.৭ রাষ্ট্র সার্বভৌমিকতার ব্যাপ্তি

সামাজিক চুক্তির ধারণা হবসকে পৌর সমাজ (Civil Society) ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের (Political Authority) অগ্রাধিকারের বিষয়টির বৈধতা প্রতিপন্ন করতে সাহায্য করেছে, যে কারণে হবসের সামাজিক চুক্তির মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিপ্রায় সুস্পষ্ট। একথা আরও সত্য এ জন্য যে হবস ইংল্যাণ্ডের নৈরাজ্যজনক সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সর্বময়তার দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চুক্তির ধারণার তুলনায় ভাল আর কোন অবলম্বন খুঁজে পান নি। ব্যক্তিকে আনুগত্য জ্ঞাপনে বাধ্য করে বা ব্যক্তির স্বইচ্ছার ভিত্তিতে একটি তৃতীয় পক্ষের কাছে সকল স্বাভাবিক স্বাধীনতা হস্তান্তরিত করে রাজনৈতিক জীবনে দায়বদ্ধতা (Obligation) প্রতিষ্ঠিত হয়। চুক্তিবাদীতার সারবত্তা এখানেই নিহিত। রাজকর্তৃত্বের প্রতি মানুষের দায়বদ্ধতা তখনই সুনিশ্চিত হয় চুক্তির স্থায়ী চরিত্র যখন প্রতিভাত হয়। ব্যক্তি যখন তার সার্বভৌমিকতা স্বেচ্ছায় সীমায়িত করে পৌর সমাজ গঠন করে তখন চুক্তির স্থায়ী চরিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সামাজিক চুক্তি দ্বারা বিধিবদ্ধ যে পৌর সমাজের (Civil Society) ছবি হবস অঙ্কন করেছেন তাতে আসলে লাভবান হলেন কিন্তু তৃতীয় পক্ষ, অর্থাৎ, রাজা—রাজা চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী না হয়েও কমনওয়েলথের সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত। কমনওয়েলথের সার্বভৌম ক্ষমতার চরম প্রকৃতির তারতম্য না ঘটিয়েও সার্বভৌম ক্ষমতা একজনের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকবে না কয়েকজনের মধ্যে বণ্টিত হবে এই বিতর্কে হবস বাহ্যত গণতন্ত্র বা অভিজাততন্ত্রের তুলনায় রাজতন্ত্রকে পছন্দ করেছেন। এর কারণ তিনি কতিপয় ব্যক্তি বা অনেকের স্বেচ্ছাচারের তুলনায় একজনের স্বেচ্ছাচারকে মেনে নিতে প্রস্তুত। এর ফলে কোন এক সময় রাজা এবং প্রজাবর্গের মধ্যে স্বার্থের সমন্বয় ঘটা সম্ভব এবং শাসনব্যবস্থা ব্যক্তি স্বার্থের সংঘাত, উচ্চাকাঙ্খা বা জটিলতা থেকে মুক্ত হবে বলে হবস প্রত্যয় করেছেন। এই যুক্তির নিরিখে বিচার করলে হবসকে একত্ববাদের আদি রূপকার বলে চিহ্নিত করলে অত্যুক্তি হবে না। হবসের এই বক্তব্যের মধ্যেই অবিভাজ্য, অসীম, অবিভক্ত ও স্থায়ী সার্বভৌম শক্তির

সমর্থনের দিকটি প্রকাশিত হয়েছে। সামাজিক চুক্তি একই সঙ্গে রাষ্ট্র এবং সরকার সৃষ্টি করেছে। ফলে চরম রাষ্ট্র ক্ষমতাকে সমর্থন কার্যত চরম রাজতন্ত্রের সমর্থনে পরিণত হয়েছে যা হবস সচেতন ভাবেই করেছেন। তবে রাজার এই চরম ক্ষমতা ঐশ্বরিক সূত্রে প্রাপ্ত নয়, কারণ হবস বিশ্বাস করতেন রাজার সব ক্ষমতার উৎস সামাজিক চুক্তি। সামাজিক চুক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করলেও হবস চুক্তির ধারণাকে তার যৌক্তিক পরিণতির দিকে নিয়ে যাননি, কারণ জনগণ কর্তৃক চুক্তির মূল্যায়ন বা তার পুনর্নবীকরণ জাতীয় কোন ধারণাই হবসের চিন্তা কাঠামোয় স্থান পায় নি। সার্বভৌম শক্তিকে হবস "Dominium" এই বিশেষণে ভূষিত করেছেন এবং De Cive গ্রন্থে তিনি এই শক্তিকেই বৈধ আইন প্রণয়নের অধিকারী বলে চিহ্নিত করেছেন। সার্বভৌমের ক্ষমতা বা তার কর্তৃত্বের সীমা চিহ্নিত করবার ক্ষেত্রে কোনরূপ অস্পষ্টতা থাকাকে তিনি কাঙ্খিত বলে মনে করতেন না। সার্বভৌম শক্তি সকল আইনের উৎস, ব্যাখ্যাকর্তা ও এমনকি প্রাকৃতিক আইনেরও ব্যাখ্যাকারী। যেহেতু সার্বভৌম শক্তি নিজেই আইনের উৎস সেইহেতু সে নিজে কোন আইনের অধীন নয়। তবে আইনগুলি যতক্ষণ সার্বভৌমের স্বার্থের অনুকূল, ততক্ষণ সার্বভৌম সেগুলিকে সচেতনভাবে অস্বীকার করে না। আইন সম্পর্কিত হবসের এই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি পরবর্তীকালে বেন্থাম ও জন অস্টিনের বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে। বাহ্যতই হবসের সার্বভৌমিকতা সম্পর্কিত তত্ত্ব অস্টিনের সার্বভৌমিকতা সম্পর্কিত তত্ত্বের প্রেক্ষাপট রচনা করেছিল।

হবসের প্রাসঙ্গিকতা বিচারে একথা বলা যেতে পারে যে তিনি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিশেষত, চার্চ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রমূখকে রাজনৈতিক সংগঠন অর্থাৎ রাষ্ট্রের অধীনস্থ করে সমাজজীবনে শৃংখলা ও স্থিতিশীলতা আনতে চেয়েছিলেন। রক্তের সম্পর্ক, ধর্ম বা অন্য কোন প্রাক-রাজনৈতিক চেতনা নির্ভর সমাজজীবনকে হবস আদৌ গুরুত্ব দেননি। ফলে আইনের উৎসরূপে প্রথা, প্রতিষ্ঠান, নৈতিকতাবোধ ইত্যাদিকে গুরুত্ব দেননি। এই যুক্তি থেকেই তাঁর সিদ্ধান্ত —আইনের উৎস সামাজিক প্রতিষ্ঠান নয়, সার্বভৌমের নির্দেশ। রাজনৈতিক শৃংখলার স্বার্থেই তিনি সার্বভৌম কর্তৃত্বের বিভাজনের বিরোধিতা করেছেন। কর্তৃত্ব ঐক্যবদ্ধ হলেই অর্থপূর্ণ, অন্যথায় অর্থহীন। এইভাবেই হবস এক সুনির্দিষ্ট, সুশৃংখল স্থায়ী রাজনৈতিক শক্তি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্বপক্ষে তাত্ত্বিক বুনিয়াদ রচনা করেছেন।

৫৭.৪ ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ এবং উদারনীতিবাদের প্রশ্নে হবসের অবস্থান

হবসের রাজনৈতিক দর্শনের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ (Individualism) এবং সর্বাত্মক ভাবধারার (Totalitarian Idea) সমন্বয় ঘটেছে। হবসের তত্ত্বের ভিত্তিমূলে রয়েছে উদারনৈতিক চেতনা, কারণ তার মতে সমাজ ও রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে স্বাধীন এবং সমান ব্যক্তিবর্গের মিলিত যৌথ স্বার্থপ্রসূত ইচ্ছার দ্বারা। রাষ্টের ভিত্তি হল মানুষের সম্মতি — এই ধারণার মূলেই রয়েছে উদারনৈতিক চেতনা। আবার একই সঙ্গে এই রাষ্ট্রকে সর্বশক্তিমান করে তোলার মধ্যে দিয়ে হবসের সর্বাত্মক মানসিকতাও প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি গণসম্মতির পুনর্নবীকরণের কোন সংস্থান রাখেন নি। সার্বভৌম কর্তৃত্ব শক্তিশালী পৌর সমাজ গড়ে তোলার জন্য অসীম ক্ষমতা ভোগে সক্ষম তবে তিনি নিজে যদি বিরোধিতার সুযোগ প্রদান না করেন তবে কেউই তার বিরোধিতায় সক্ষম হবেন না। তবে এ ক্ষেত্রে হবসের সদর্থক অবদান হল

এই যে, তিনি সার্বভৌম ক্ষমতাকে অধিদৈবিক, অতিপ্রাকৃত চরিত্র থেকে মুক্ত করে মানুষের সচেতনতা ও রাজনৈতিক ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। হবসের এই মনোভাবকে লক আরও বলিষ্ঠ রূপ প্রদান করেছেন ও গণসম্মতির তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

হবসের চিত্রিত ব্যক্তিসত্ত্বা হল আত্মসচেতন আত্মস্বার্থ সম্বলিত ও প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী। এইরূপ ব্যক্তি সমষ্টিই শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে তুলতে সক্ষম। তিনি ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের স্বাতন্ত্র, বিশেষত, চিন্তাগত ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতার দাবীকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এর ফলে ব্যক্তিসত্ত্বার রাষ্ট্রে বিলীন হবার সম্ভাবনা হ্রাস পায়। যদি ব্যক্তিসত্ত্বাই আহত হয় তবে রাষ্ট্রের অস্তিত্বের যৌক্তিকতাই লুপ্ত হবে বলে তিনি প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সমাজ হল এক সমবায়িক প্রয়াস যা ব্যক্তি আত্মস্বার্থেই সৃষ্টি করেছে। রাজনীতি, অর্থনীতি এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে হবস এক নিষ্ঠাবান ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদীরূপে নিজের পরিচয়কে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। লেভায়াথান একই সঙ্গে যুদ্ধের তরবারী ও ন্যায়ের দণ্ড হাতে নিয়ে তার পরিপার্শ্বের মধ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধির কাণ্ডারী — এই ভাবেই হবস লেভায়াথানকে মানুষের সামাজিক জীবনের নৈতিকতা বোধের কেন্দ্রবিন্দু ও মানবিক ক্ষমতার শ্রেষ্ঠ প্রতিরূপ করে তুলেছেন। হবসের এই মানসিকতা তাঁকে এক শৃংখলাবদ্ধ শক্তিশালী সামাজিক জীবন ও ব্যক্তিসত্ত্বার উপাসক করে তুলেছে।

হবসের রাষ্ট্রদর্শনে যে শুধু সর্বাত্মক রাষ্ট্রশক্তির জয়গান গাওয়া হয়েছে তাই নয়, হবস তার দর্শনে স্বাধীনতার ধারণারও ব্যাখ্যা দান করেছেন। তিনি স্বাধীনতাকে ব্যক্তির জীবনের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের অভীপ্সা রূপে চিহ্নিত করেছেন। এর অর্থ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধীনে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীনতাকে ব্যক্তির অভিরুচি অনুসারে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। আইন যা অনুমোদন করে এবং যেক্ষেত্রে আইন নীরব তাই স্বাধীনতা। অর্থাৎ একপ্রকার বল প্রয়োগের সম্ভাবনার অনুপস্থিতি বা বিধিনিষেধের অনুপস্থিতি জনিত অবস্থাই হল স্বাধীনতা। ব্যক্তি বিশ্বাস, বিবেক বা চেতনাবোধ এসবই লেভায়াথানের হস্তক্ষেপের উর্দ্ধে। শুধুমাত্র জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে লেভায়াথান ব্যক্তিকে নির্দেশ দিতে পারে। হবসই ব্যক্তিগত ও গণক্ষেত্রের মধ্যে পার্থক্য জ্ঞাপন করতে শুরু করেন যা পরে লকের দর্শণে আরও বলিষ্ঠরূপ ধারণ করে, যা সীমাবদ্ধ রাষ্ট্রের ধারণার মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয়। হবস যে লেভায়াথানকে অবাধ ক্ষমতাশালী রূপে দেখতে চাননি তার প্রমাণ ব্যক্তি সম্পত্তি সংরক্ষণের পক্ষে তার জোরদার যুক্তি। সার্বভৌম শক্তি চরম হলেও তা ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকার ও অন্যান্য অর্থনৈতিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। আবার একই সঙ্গে দুঃস্থ এবং অসহায়কে সার্বভৌম আর্থিক সহায়তা প্রদান করুক এ ছিল হবসের কাছে কাম্য। সার্বভৌমকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতাশালী করেও হবস ব্যক্তির আত্মসংরক্ষণের অধিকারকে স্বীকার করেছেন। প্রকৃতিদত্ত জীবনের অধিকার থেকে সার্বভৌম মানুষকে বঞ্চিত করতে পারে না। ব্যক্তির অচ্ছেদ্য এই অধিকার লঙ্ঘিত হলে ব্যক্তি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচারণে সক্ষম। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ সার্বভৌমের অসম্পূর্ণতাকে প্রকাশিত করে এবং নূতন সার্বভৌমের আবির্ভাবের পথ প্রশস্ত হয়। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণে

মানুষ যাতে সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত না হয় তা নিশ্চিত করবার জন্য এই বিষয়ের সঙ্গে হবস কেবলমাত্র ব্যক্তির আত্মসংরক্ষণের বিষয়টিকে যুক্ত করেছেন।

৫৭.৫ রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার ধারণা

হবস মানুষের রাজনৈতিক আনুগত্যের (Political obligation) ক্ষেত্রে অনেকগুলি কারণের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, হবস সার্বভৌমের আদেশ মান্য করবার বাধ্যবাধকতার বিষয়টি উল্লেখ করেন, কারণ এই আদেশ অমান্য করবার অর্থ শাস্তিভোগ করা। দ্বিতীয়ত, তিনি সামাজিক চুক্তি মান্য করবার নৈতিক দায়িত্বের কথা বলেছেন যা সকলের মত ব্যক্তি বিশেষকেও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে বাধ্য করে। তৃতীয়ত, একটি রাজনৈতিক মাত্রা, অর্থাৎ, সার্বভৌম, মানুষের স্বাভাবিক ও বিধিবদ্ধ কর্তৃত্বসম্পন্ন প্রতিনিধি—এই চেতনা সার্বভৌমকে নাগরিকদের তরফে কর্তৃত্বসম্পন্ন করে তোলে। ফলে এই কর্তৃত্বের প্রতি নাগরিকদের দায়বদ্ধতা থেকেই যায়। চতুর্থত, হবস রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার স্বপক্ষে এক ধর্মীয় যুক্তি পেশ করেছেন। তার মতে পৌর আইন (Civil Laws) প্রাকৃতিক আইনের (Law of Nature) অঙ্গীভূত; ফলে মানুষকে উভয় আইনের প্রতিই আনুগত্য ব্যক্ত করতে হবে। লিও ষ্ট্রস এক্ষেত্রে হবসের বাধ্যবাধকতার ধারণাকে ক্ষমতাও কর্তৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। মাইকেল ওকশটও মনে করেন যে ব্যক্তির রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতাকে হবস শুধুমাত্র ব্যক্তিস্বার্থ সংরক্ষণের নিরিখে ব্যাখ্যা করেন নি। বরং রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা হবসের কাছে একই সঙ্গে দৈহিক, যৌক্তিক ও নৈতিক বাধ্যবাধকতার সমন্বয়। পৌরসমাজ নিজেই ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের এক সমন্বয় এবং এর প্রত্যেক অংশের নিজস্ব বাধ্যবাধকতা রয়েছে। হবস মনে করতেন রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা প্রাকৃতিক আইনের ধ্রুপদী ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। হবস পরিত্রাণ (Salvation) এবং আনুগত্যকে এক করে ফেলেছেন এবং আনুগত্যকে নৈতিকতার মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পিটকিনের ন্যায় সাম্প্রতিক হবস বিশেষজ্ঞ বলেন হবস বাধ্যবাধকতার ধারণার দ্বারা বিদ্রোহ, অরাজকতা ও গৃহযুদ্ধজনিত অবস্থার মোকাবিলা করতে সচেষ্ট ছিলেন এবং ব্যক্তির আত্মস্বার্থ সংরক্ষণেই যে হবস সচেষ্ট ছিলেন সেটি প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

৫৭.৬ সাম্য এবং নারীর অবস্থান সম্পর্কে হবসের বক্তব্য

হবস মানুষের মধ্যে সাম্যের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, কারণ তার মতে প্রকৃতির আইনে বৈষম্যের কোন উপস্থিতি নেই। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাম্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁর যুক্তি হল, সমাজের সকল কর্তৃত্বই সম্মতির (consent) উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং নারীজাতি যেহেতু সব অর্থেই পুরুষের সমান সেহেতু তাঁর পুরুষ প্রদত্ত সুরক্ষার দরকার নেই। প্রাকৃতিক সমাজে সন্তানের জন্মদাতৃ একই সঙ্গে মা এবং শিশুর প্রভু। শুধুমাত্র রাষ্ট্রকর্তৃত্ব যদি কোন কারণে শিশুর মাতাকে আটক করে তবেই মাতা শিশুর উপর কর্তৃত্ব হারাবে, তবে এক্ষেত্রে মা তার

অনুপস্থিতিতে শিশুর উপর অধিকার তার পছন্দের কোন মানুষের উপর অর্পণ করতে পারে। নারীর তথাকথিত অধীনতার ধারণাকে হবস মানুষের কৃত্রিম সৃষ্টি বলে মনে করতেন। সম্পত্তির উত্তরাধিকারী রূপে নারীর তুলনায় পুরুষকে অগ্রাধিকার দেবার কারণ পুরুষ অধিক শ্রমশক্তির অধিকারী ও বিপদের মোকাবিলায় সমর্থ। প্রাকৃতিক সমাজে মায়ের প্রাধান্য স্বীকৃতি পেত কারণ তার গর্ভস্থ শিশুর পিতাকে তা ঘোষণা করবার অধিকার একমাত্র মা-ই ভোগ করত। হবস রাষ্ট্রের ন্যায় পরিবারকেও একটি কৃত্রিম প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য করেছেন এবং যৌক্তিকতার আলোকে পরিবারের প্রয়োজনীয়তাকে বিশ্লেষণ করেছেন। "Civil Person" বা পৌর ব্যক্তিত্ব থেকেই পরিবারের উদ্ভব এবং এক্ষেত্রে বিবাহ বা পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের ইচ্ছাকে হবস বিশেষ গুরুত্ব দেন নি। আবেগ নয় পৌর ব্যক্তিত্বের যৌক্তিকতাবোধের মধ্যেই পরিবারের উৎস সন্ধান করতে হবে। পারিবারিক জীবনে হবস নারী ও পুরুষের যৌথ কর্তৃত্ব ও অধিকারের উপর জোর না দিয়ে কিন্তু পুরুষের কর্তৃত্বকেই স্বীকার করে নিয়েছেন এবং পিতৃতন্ত্রকে সমর্থন করেছেন। স্বাধীন নাগরিকরূপে স্ত্রী বা মাতা পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার ভোগে যৌক্তিক দিক দিয়ে সমর্থ হলেও পৌর সমাজের যে গঠনতন্ত্র হবস উল্লেখ করেছেন তাতে নারী সমানাধিকার ভোগে সমর্থ নয়। তবে সপ্তদশ শতকের ইওরোপীয় সামাজিক বাস্তবতায় হবস নৈতিক দিক দিয়ে নারী ও পুরুষের সাম্যের কথা বলে যথেষ্ট বৈপ্লবিক চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। তথাপি পিতৃতন্ত্রকে তিনি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন নি, কারণ তার কমনওয়েলথের স্রষ্টা কেবলমাত্র পিতারাই। তবে হবসের রাজনৈতিক চিন্তা মধ্য সপ্তদশ শতাব্দীর পিতৃতান্ত্রিকতা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল, কারণ এই পিতৃতান্ত্রিকতা পরিবার কেন্দ্রিক পিতৃত্ব থেকে আবির্ভূত হয়নি।

৫৭.৭ হবসের চিন্তার মূল্যায়ন

রাষ্ট্রতত্ত্বের ধারাবিবর্তনের পথে Leviathan এক অনন্য সৃষ্টি; এই গ্রন্থের স্বচ্ছতা ও বক্তব্যের ঋজুতা সার্বভৌম, মানব প্রকৃতি, আইন রাজনৈতিক আনুগত্য ইত্যাদি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরী করেছে। তিনি অ্যারিষ্টটলীয় মতবাদ ও সিসেরোর মানবতাবাদকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে ষোড়শ শতাব্দীর উগ্রচিন্তাবিদ মন্টেগনের চিন্তাকে গ্রহণ করেছেন। নিছক ভাল বলে পৃথিবীতে কিছু থাকতে পারে না কারণ যখন বিশেষ মূহুর্তে মানুষকে যা কিছু খুশী করে তাই ভাল আর তাকে যা অখুশী করে তাই খারাপ। এই মানব প্রকৃতি বর্ণনা কেবলমাত্র হবসের পক্ষেই সম্ভব কারণ এভাবেই তিনি তাঁর চিন্তাকে নৈতিকতার অনুশাসন থেকে মুক্ত করেছেন ও সবকিছুর উপরে আত্মসংরক্ষণকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এই মানসিক গঠন থেকেই হবস্ বলেছিলেন যে, রাষ্ট্র মানুষের সুবিধার্থে সৃষ্ট এক সংগঠন এবং এর প্রতি আনুগত্য মানুষের স্বার্থের প্রয়োজনে নিঃশর্ত। আনুগত্যহীনতার তুলনায় আনুগত্য প্রকাশ ছিল তাঁর কাছে অভিপ্রেত। সর্বশক্তিমান প্রতিষ্ঠান রূপে রাষ্ট্র তাই ঐশ্বরিক, প্রাকৃতিক আইন সহ সকল প্রকার বিধির চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকর্তা। হবসের এই মতবাদকেই পরে বেন্থাম ও অষ্টিন ব্যবহার করেছেন। হবস রাষ্ট্রকে বিবিধ স্বার্থের সমন্বয়কারী হিসাবে দেখেছেন। এই সূত্রকেই বেন্থামের ন্যায় উপযোগিতাবাদীরা পরবর্তীকালে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। হবস যে সর্বশক্তিমান রাষ্ট্র কল্পনা করেছিলেন তা

অবশ্যই দানবীয় প্রকৃতির নয়। এই রাষ্ট্রকে নিরাপত্তা দিতে হয়, দিতে হয় শান্তি ও শৃংখলা এবং আত্মমহিমা প্রচারে সে ব্যগ্র নয়। মানুষের বিবিধ কর্মকাণ্ড রয়েছে যার অনেকগুলিই অরাজনৈতিক, যেখানে হবস রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপকে আদৌ কাম্য মনে করেন নি। হবসের অনেক সমালোচক মনে করেছেন যে সরকারের উপর সমাজের নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের আবশ্যিকতা হবস উপলব্ধি করেন নি। লসন ও হোয়াইটহলের ন্যায় সাম্প্রতিক হবস বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন যে শাসকদের উপর আইনের বাধ্যবাধকতা থাকা আবশ্যিক। অন্যথায় তাদের স্বৈরাচারী হয়ে ওঠা সম্ভব। ক্ল্যারেনডন এবং হোয়াইটহল আরও বলেন যে বাস্তব রাজনীতি সম্পর্কে হবসের কোন ধারণা ছিল না এবং সরকার সম্পর্কে তাঁর ধারণাও কৃত্রিম। হবসের অনেক সমালোচক তাঁর প্রাকৃতিক সমাজ বর্ণনার রীতিকে সমর্থন করেন নি। ব্যক্তি যদি এতটাই অসামাজিক হয় তাহলে কীভাবে সমাজবদ্ধ হবার তাগিদ অনুভব করল সে বিষয়ে হবস স্পষ্ট মত ব্যক্ত না করায় পৌর সমাজ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যের ভিত্তি তত্ত্বগতভাবে দূর্বল বলে সমালোচকগণ মনে করেছেন।

তথাপি হবস রাজনৈতিক দর্শনের ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টিভঙ্গীর দিশারী। তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের প্রতীক এবং আধুনিক মানসিকতার প্রতিনিধি। তাঁর যুক্তির সারকথা হল এই যে, কোন প্রকার শাসন ও কর্তৃপক্ষ ব্যতীত সমাজজীবন নৈরাজ্যপূর্ণ হয়ে উঠবে। এই জন্য হবস কর্তৃত্বহীনতার নৈরাজ্যময় অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়েই প্রাকৃতিক সমাজের রূপকল্প তৈরী করেছেন। এতে হবসের অবাস্তব মানসিকতার পরিবর্তে বাস্তববাদী মানসিকতাই প্রকাশ পেয়েছে। হবসের মতে রাজনীতি হল নিরাপত্তা, কর্তৃত্ব ও স্বাধীনতার মধ্যে চিরন্তন দ্বন্দ্বেরই প্রকাশ। ১৯৮৭ সালে হেলিসিংকিতে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এই মত ব্যক্ত হয়েছে যে বিশ্বরাষ্ট্রের সম্ভাবনা আজও সুদূরপরাহত এবং মানুষ যতদিন আত্মমর্যাদা রক্ষায় তৎপর থাকবে ততদিন জাতিরাষ্ট্র তার বৈধতা সংরক্ষণ করতে সমর্থ হবে। এই সিদ্ধান্ত হবসের বক্তব্যের সারবত্তাকেই প্রমাণ করে। নূতন সহস্রাব্দের সূচনারম্ভে হবসের চিন্তার তাৎপর্যকে অনুধাবন করা আজ তাই বিশেষ প্রয়োজনীয়।

৫৭.৮ সারাংশ

এই এককটিতে টমাস হবসের রাষ্ট্রদর্শনের প্রেক্ষাপট এবং মূল বিষয়গুলি সংক্ষেপে বিবৃত হল এখানে বর্ণনা করা হল কীভাবে মানুষ প্রাকৃতিক সমাজ ও প্রাকৃতিক আইনের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে কৃত্রিম সমাজজীবন ও কর্তৃত্ব গড়ে তুলল। মানুষ কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য ব্যক্ত করেও কীভাবে তার সত্ত্বাকে সংরক্ষিত করল তাও এই এককটি থেকে জানা যাবে, জানা যাবে হবসের চিন্তা এখনও কেন প্রাসঙ্গিক।

৫৭.৯ অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

(১) হবসের সমসাময়িক ইংল্যাণ্ডের অবস্থা বর্ণনা করুন।

২) হবস মানব প্রকৃতিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ?

(৩) প্রাকৃতিক সমাজকে হবস কীভাবে চিত্রিত করেছেন ?

(৪) সামাজিক চুক্তি ও রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কে হবসের বক্তব্য বিশ্লেষণ করুন।

(৫) হবস সার্বভৌমিকতার বিষয়টি কীভাবে বর্ণনা করেছেন ?

(৬) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র ও অধিকার সম্পর্কে হবসের বক্তব্য বিশ্লেষণ করুন।

(৭) রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার বিষয়টি হবস কোন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

(১) হবস রচিত প্রধান দর্শনগ্রন্থগুলির নাম কী ?

(২) হবস কেন শক্তিশালী রাজতন্ত্রকে অভিপ্রেত মনে করেছিলেন ?

(৩) হবস কোন অর্থে আধুনিক ?

(৪) হবসের "Leviathan" বা রাষ্ট্রদানবের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি কী ?

(৫) হবস কি ব্যক্তি স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন ?

(৬) সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কে হবসের বক্তব্য কী ?

৫৭.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১। Wolin, S. : Politics and Vision — *Continuity and Innovation in Western Political Thought — Boston, Little Brown (1960).*

২। Wolin, S. : *Hobbes and the Epic Tradition of Political Theory — Los Angeles University of California, (1970).*

৩। Strauss, L. : *The Political Philosophy of Hobbes — Its basis and genesis, Oxford, Clarendon Press (1936).*

৪। Plamenaz, J. : *Man & Society, 2 vols, London Longman (1963).*

৫। Mukhopadhayay Amal Kumar — *Western Political Thought, Calcutta. K.P. Bagchi (1980).*

৬। Mukherjee Subrata and Ramaswamy Sushila — *A History of Political Thought — New Delhi, Prentice Hall of India, (1999).*

৭। দেবাশিস চক্রবর্তী — *ম্যাকিয়াভেলি থেকে রুশো। কলকাতা, সেন্ট্রাল বুক পাবলিশার্স, (১৯৯০)।*

একক ৫৮ □ জন লক্ (১৬৩২-১৭০৪)

গঠন

৫৮.০ উদ্দেশ্য

৫৮.১ প্রস্তাবনা

৫৮.২ প্রারম্ভিক মন্তব্য— লকের অবস্থান

৫৮.২.১ লকের দর্শনের সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি

৫৮.৩ লকের জীবন ও রচনার ক্রমপঞ্জী

৫৮.৪ লকের রাজনৈতিক চিন্তার সম্যক পরিচিতি

৫৮.৪.১ গৌরবময় বিপ্লবের তাত্ত্বিক রূপকার রূপে লক

৫৮.৪.২ সার্বভৌমের ক্ষমতার উৎস প্রসঙ্গে লকের বক্তব্য

৫৮.৪.৩ প্রাকৃতিক সমাজের বর্ণনা

৫৮.৪.৪ পৌরসমাজ গঠনের উদ্দেশ্য

৫৮.৪.৫ লক ও সীমাবদ্ধ রাষ্ট্রের তত্ত্ব

৫৮.৪.৬ সরকার পরিবর্তনের শর্ত — গণসম্মতি

৫৮.৪.৭ রাষ্ট্রবিরোধিতার অধিকার

৫৮.৪.৮ লকের গণতান্ত্রিক বহুত্ববাদী মানসিকতা

৫৮.৫ লকের দর্শনের তাৎপর্য

৫৮.৬ স্বাভাবিক অধিকার ও সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কিত তত্ত্ব।

৫৮.৭ মূল্যায়ন

৫৮.৮ সারাংশ

৫৮.৯ অনুশীলনী

৫৮.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৫৮.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি উদারনীতিবাদের প্রধানতম জনক জন লকের দর্শণের রূপরেখাকে ঘিরে গড়ে তোলা হয়েছে। ইংল্যাণ্ডে ষড়যন্ত্র রাজনৈতিক কারণে পীড়ন, সরকারী চরদের কর্মব্যস্ততার পরিবেশে যখন ব্যক্তিসত্তা এবং স্বাধীনতা দারুণভাবে বিঘ্নিত তেমনই এক পরিবেশে জন লক তার চরমপন্থী (Radical)

বক্তব্য নিয়ে এগিয়ে আসেন। এই এককটি পাঠ করে আমরা জানব —

- লক কীভাবে সমসাময়িক ঘটনা ও ব্যক্তিত্বদের 'দ্বারা' প্রভাবিত হয়েছেন;
- লকের জীবনের গতিপথ ও রচনা;
- গৌরবময় বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে লকের চিন্তা;
- সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস, প্রাকৃতিক সমাজ ও পৌর সমাজ প্রসঙ্গে লকের বক্তব্য;
- লকের বর্ণনায় রাষ্ট্রক্ষমতার ব্যাপ্তি;
- সরকার পরিবর্তন ও রাষ্ট্রবিরোধিতার শর্ত সম্পর্কে লকের মত
- স্বাভাবিক অধিকার এবং সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে লকের মত, এবং
- লকের অবদান সম্পর্কে একটি মূল্যায়ন।

৫৮.১ প্রস্তাবনা

আধুনিক উদারনৈতিক রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তি প্রথম রচনা করেছিলেন জন লক। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে তিনি প্রথম মধ্যযুগের প্রতিকূলতা থেকে ব্যক্তিসত্ত্বাকে মুক্ত করে ঐ সত্ত্বাকে নৈতিক প্রেক্ষাপটে (moral sphere) প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন। লক ছিলেন ইওরোপীয় মনস্তত্ত্বের নিপুণ প্রতিনিধি, কারণ মানুষের অন্তর্নিহিত ন্যায় পরায়ণতা ও নৈতিকতাবোধ সম্পর্কে তিনি প্রথমাবধি আস্থাবান ছিলেন। তাই লক চেয়েছিলেন মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে সকল বাধাকে অপসারিত করতে। নিজের নৈতিক দায়িত্বকে চিহ্নিত করে মানুষ সুনাগরিক হয়ে উঠুক, বিবেকের অনুশাসন মেনে চলুক, রাষ্ট্রের অবৈধ হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত হয়ে ব্যক্তি তার স্বাভাবিক অধিকার ভোগ করে জীবনকে পূর্ণতর করে তুলুক এ সবই ছিল লকের আন্তরিক ইচ্ছা। এই ইচ্ছার পরিপ্রেক্ষিতে তার রচিত Two Treatises কর্তৃত্ববাদ ও স্বৈরতন্ত্রের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। এই দিক দিয়ে বিচার করলে লকের তাত্ত্বিক অবস্থান হবসের বিপরীতে, কারণ লকের বর্ণিত রাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতা চরম নয়, বরং তা গণসম্মতির শতধীন। তাই শুধুমাত্র ইংল্যাণ্ডেই নয় ইওরোপে গণতন্ত্র এবং উদারনীতিবাদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির মূলে রয়েছেন লক যিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আশা, সম্পদ ও স্বপ্নের প্রতীক লকের দর্শনের অনুরণন আজ পশ্চিমের শিল্পোন্নত গণতন্ত্রগুলির সংবিধানে প্রতিফলিত। কীভাবে, কোন প্রেক্ষাপটে লক কী ভেবেছেন তা পরবর্তী অংশগুলিতে আলোচিত হল।

৫৮.২ প্রারম্ভিক মন্তব্য—লকের অবস্থান

উদারনীতিবাদী রাজনৈতিক ও দার্শনিক তত্ত্বের বিকাশের সূচনা হয়েছিল ইংরেজ উদারনীতিবাদী জন লকের চিন্তা থেকে। মার্ক্সের সমাজচিন্তার পূর্বেই যেমন অনেকে সমাজতান্ত্রিক ভাবনা ব্যক্ত করেছিলেন সেই অর্থে লকের পূর্বে কেউ কিন্তু উদারনৈতিক ভাবনা ব্যক্ত করেননি। লকের প্রসিদ্ধি

শুধুমাত্র তাঁর ভাবনার স্বচ্ছতার জন্যই নয়, লক চিরস্মরণীয় কারণ তিনি প্রকৃতই উপলব্ধি করেন যে দর্শনচিন্তা মানুষের উত্তম জীবন যাপনের আকাংক্ষাকে বাস্তবায়িত করবার প্রয়াসকে প্রভাবিত করতে সমর্থ। লকের বক্তব্য, তাঁর সমাজ ও রাজনৈতিক দর্শন অনেক সময় মনস্তত্ত্ব ও যৌক্তিকতার বিচারে ত্রুটিপূর্ণ হলেও তিনি ইওরোপীয় মন ও তার সংবেদনশীলতাকে যেভাবে চিনেছিলেন এভাবে আর কেউ চিনেছিলেন বলে রাজনৈতিক ভাষ্যকারেরা মনে করেন না। উদারনীতিবাদের উৎস ও প্রকৃতির সবিস্তার আলোচনা, তার রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের উন্মোচন লকের চিরস্মরণীয় কীর্তি। চিন্তার যে প্রসারিত চিন্তাগত দিগন্ত লকের তত্ত্বে উন্মোচিত হয়েছে তার মধ্যে সংবিধানতন্ত্র থেকে শুরু করে স্থিতিশীলতা, স্বাধীনতা, সম্মতি, সম্পত্তি ও সহনশীলতার ধারণা সপ্রশংস স্বচ্ছতায় বিশ্লেষিত হয়েছে। লকের কাছে এই বিষয়গুলি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এসব ধারণাই ইওরোপে গণতন্ত্রকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছিল। লক যে গণতন্ত্রের স্বপক্ষে এই ঐতিহাসিক ভাবনার তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট রচনা করেছিলেন এ বিষয়ে কোন তাত্ত্বিকই সন্দেহ প্রকাশ করেন নি। তবে এই সব ধারণার অর্থ ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ব্যপক মত পার্থক্যের অবকাশ রয়েছে।

৫৮.২.১ লকের দর্পনের সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি

লক সম্পর্কে যে গতানুগতিক মন্তব্য বা ব্যাখ্যাসমূহ প্রদান করা হয় তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধারা গ্রহণ করেছেন ল্যাসলে, ম্যাকফারসন, অ্যাসক্র্যাফ্‌ট প্রমুখ তাত্ত্বিকরা। ল্যাসলে জোরালো যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যে লক রক্ষণশীল হুইগ দর্শনকে বা ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের গৌরবময় বিপ্লবের কোনটিকেই বৈধ প্রমাণিত করতে তৎপর ছিলেন না। আবার ম্যাকফারসন লককে বুর্জোয়া সমাজের তত্ত্বকার বলে গণ্য করেছেন। অন্যদিকে অ্যাসক্রফট লকের প্রথাবিরোধী মানসিকতা ও বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণকে তার বৈপ্লবিক প্রগতিশীল মানসিকতার প্রতীক বলে গণ্য করেছেন। এভাবে লককে ব্যাখ্যা করায় বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী উভয় পক্ষই অসুবিধার মুখে পড়েছেন। বামপন্থী এবং মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিকরা সর্বদা লককে বুর্জোয়া সমাজের তাত্ত্বিক প্রতিনিধি বলে থাকেন। আবার দক্ষিণপন্থীদের পক্ষে গৌরবময় বিপ্লবের এক বৈপ্লবিক দিক রয়েছে এই মত গ্রহণ করা কষ্টকর। কারণ এরা সবাই গৌরবময় বিপ্লবকে প্রগতিশীল বিকাশ ও বিবর্তনের এক স্বাভাবিক পর্ব বলে চিহ্নিত করেছেন।

১৬৮৮ সালটি ইংল্যাণ্ডের সংস্কার যা উদারনৈতিক সমাজ সংস্কার প্রক্রিয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ এবং তা ইংল্যাণ্ডে গণতান্ত্রিকীকরণ প্রক্রিয়ার সূত্রপাত করলেও লকের চিন্তার প্রভাব শুধুমাত্র এই ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। লকের সংবিধানতান্ত্রিকতা, সহনশীলতা, স্বাভাবিক অধিকার সম্পর্কিত তত্ত্ব, সীমাবদ্ধ সম্মতিভিত্তিক আইন নির্দেশিত কর্তৃত্বের ধারণা, বহুত্ববাদী সমাজ গঠনের অভিলাষ, সম্পত্তির অধিকারের ধারণা — এ সবই বৃহত্তর ইওরোপ ও আমেরিকায় অনুরূপ গণতান্ত্রিক প্রবণতার সূত্রপাত করে। ফরাসী বিপ্লবই হোক বা মার্কিন স্বাধীনতা যুদ্ধই হোক, এমনকি মার্কিন সংবিধানের ভিত্তিতেও লকের দর্শনের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। আমেরিকা মহাদেশের আবিষ্কার ও বিকাশ লকের দর্শনকেই প্রতিফলিত করে, কারণ লক একবার বলেছিলেন যে বিশ্বসমাজের প্রথম অবস্থা আর আমেরিকায় ইউরোপীও উপনিবেশ গড়ে ওঠার প্রথম অবস্থার প্রকৃতি একই

ধরনের ছিল। সহনশীলতা, সম্মতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সরকার, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে স্বাধীনতা প্রকৃতির স্বপক্ষে যে পরিবেশ তৈরী হয়েছিল তার ফলস্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আবিষ্কৃত হয়। উদারনীতিবাদের সাহায্যে যে প্রাচুর্যপূর্ণ জীবনের কথা ভাবা হয় তার বাস্তবায়ন ঘটে ঐ ঐতিহাসিক ঘটনার দ্বারা। আমেরিকার আবিষ্কার, নিউ ইয়র্ক বন্দরের প্রবেশদ্বারে "ষ্ট্যাচু অব লিবার্টি" নির্মাণ এবং লকের স্বাধীনতার তত্ত্ব এ সবের মধ্যে কোথাও যেন মিল খুজে পাওয়া যায়; এসবের মধ্যেই রয়েছে সম্পদ লিপ্সা, স্বাধীনতা এবং ভোগবাদের সংকেত।

সাধারণভাবে লককে অষ্টাদশ শতাব্দীর "Enlightenment"—এর বৌদ্ধিক গুরু বলা হয়। তার উত্তরসূরী রুশো এবং ভলতেয়ারও লকের দর্শনে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। আধুনিক অভিজ্ঞতাবাদী হিউম, বার্কলে, জন ষ্টুয়ার্ট মিল, রাসেল প্রমূখের ন্যায় তাঁকেও অভিজ্ঞতাবাদের প্রধান পুরোহিত বলা হয়। অন্যদিকে আবার মেরী অ্যাসটেল, ক্যাথারিণ টটার ককবার্ণ, মেরী উলষ্টোনক্র্যাফ্ট প্রভৃতি নারীবাদের আদি প্রবক্তাগণ লকের যুক্তিবাদ, পিতৃতন্ত্রবাদ বিরোধিতা এবং চরম সার্বভৌমিকতার ধারণার সোচ্চার বিরোধিতাকে নারীবাদী দর্শনের ভিত্তি রচনায় ব্যবহার করেছিলেন। লকের শ্রমের মূল্য তত্ত্ব ধনতন্ত্রবাদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিল। আশ্চর্য্য হলেও ঐ শ্রমের মূল্য তত্ত্বকেই আবার মার্ক্স ধণতন্ত্রবাদের বিরোধিতার কাজে ব্যবহার করেছিলেন। সুতরাং অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন তাত্ত্বিক তর্কবিতর্কের মূল উৎসস্থল হলেন জন লক, যিনি একাধারে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ, উপযোগবাদ এবং ধনতন্ত্রের তত্ত্বকার। লকের বেশীর ভাগ রচনা এমনকি "Two Treatises of Government ও স্বনামে প্রকাশ করেন নি। ১৭০৪ সালে তার উইলে তিনি এই গ্রন্থদি রচনার কথা স্বীকার করেন। Two Treatises" এর রচনা কাল সম্পর্কে যথেষ্ঠ বিতর্ক আছে। ১৬৮৮ সালের দুবছর পরে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ঐ বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে সীমিত রাজতন্ত্র এবং সংসদীয় সার্বভৌমত্বের সূচনা হয় যা পরবর্তীকালে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে পরিণতি লাভ করে। সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার বা এজাতীয় ধারণা বিংশ শতাব্দীর উদ্ভুত হলেও গৌরবময় বিপ্লব ও লকের Two Treatises গণতন্ত্রের বিকাশের পথে গুরুত্বপূর্ণ দিকচিহ্ন স্বরূপ। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করে ব্যক্তি স্বাধীনতার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করার স্বপক্ষে লকের বক্তব্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তবে কেনডাল ও সমমনস্ক চিন্তাবিদরা লককে সমষ্টিবাদী বলে গণ্য করেন, লক সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুসারে সংঘের পরিচালন সমীচীন বলে মনে করতেন।

৫৮.৩ লকের জীবন ও রচনার ক্রমপঞ্জী

লকের তত্ত্বের বৃহত্তর প্রেক্ষাপট আলোচনার পর লকের জীবন ও রচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ইংল্যান্ডে সমারসেটের এক গ্রামে পিউরিটান এবং ভূস্বামী এক পরিবারে লকের জন্ম হয় ১৬৩২ সালে। গৃহযুদ্ধের বছরগুলিতে তিনি সংসদ এবং হুইগদলের সমর্থনে সোচ্চার ছিলেন। বাল্যকালে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য না থাকলেও পরবর্তী জীবনে গবেষকরূপে জীবন অতিবাহিত করবার যথেষ্ট পাথেয় তিনি উপার্জন করেন। ক্রাইস্টচার্চ কলেজে তার দীর্ঘ ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয় এবং অধ্যাপনা জীবনেরও সূত্রপাত হয়। রসায়ন এবং মেডিসিন বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণাতে তিনি যুক্ত হন। অ্যারিষ্টটল

ছাড়া আর কোন রাজনৈতিক চিন্তাবিদের এত বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহ ছিল না। প্রকৃতি ও বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন রহস্য ভেদ করবার ক্ষেত্রে লক দেকার্ত ও গ্যাসেণ্ডির দ্বারা প্রভাবিত হন।

১৬৬৫ সালের পর লকের বৌদ্ধিক জীবনে দ্বিতীয় পর্বটি আসে। তাঁকে কূটনীতিবিদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয় এবং তিনি প্রথমবারের জন্য লর্ড অ্যানথনি অ্যাসলে কুপারের, অর্থাৎ, আর্ল অফ শ্যাফটসবেরীর সংস্পর্শে আসেন। অ্যাসলে কুপার ছিলেন রাজা দ্বিতীয় চার্লসের দরবারের এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। এঁর সংস্পর্শে এসে লকের চিন্তাজগতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এই সময় তাঁর একটি রচনা A Letter from Person of Quality to his Friend in the Country সরকারের ক্রোধের কারণ হয়। ইতিমধ্যে তাঁর প্রিয় সঙ্গী আর্ল-এর মৃত্যু হয়। ১৬৭৫ সালে তিনি ফ্রান্সে চলে যান এবং প্যারিসে বিদ্বৎজনের সংস্পর্শে আসেন। এর ফলে তার চিন্তাস্রোত স্বচ্ছতর হয়ে উঠেছিল। অতঃপর ১৬৭৯ সালে লক আবার লণ্ডনে ফিরে আসেন। আর্ল লককে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিয়েছিলেন যার উপর ভিত্তি করে অভ্যন্তরীণ বাজার এবং বৈদেশিক বাজারে বাণিজ্যে রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে লকের এক স্পষ্ট মত গড়ে উঠেছিল। এ সময়েই তিনি বলেছিলেন সমাজের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত করাই রাষ্ট্রের কর্তব্য। আর্ল-এর প্রভাবে লক শিখেছিলেন বিরোধী মতকে সহ্য করবার ধৈর্য্য এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার গুরুত্ব। মোটকথা আর্ল লকের চিন্তা অনুভূতি ও দর্শনের ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করেন এবং লকের চিন্তাধারাকে আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে সাহায্য করেন।

লকের ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত সংবেদনশীল ছিলেন এবং গোপনীয়তা পছন্দ করতেন। অত্যন্ত সংগোপনে লক তাঁর Two Treatises গ্রন্থ রচনা করেন। শুধু তাই নয় তার সমগ্র লেখালেখির কাজ বা অন্যান্য কাজ গোপনীয়তার সঙ্গেই করতেন। ১৬৮০ সালে ইংল্যাণ্ডে রাজনীতির অনিশ্চয়তা, যে কোন প্রকার বিরোধিতা সম্পর্কে ষ্টুয়ার্ট রাজপরিবারের সংবেদনশীলতার কারণে তাঁকে ১৬৮৩ সালে হল্যাণ্ডে পালিয়ে যেতে হয়। অ্যালগারনন সিডনীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার ঘটনা লকের ন্যায় র‍্যাডিকালদের প্রতি সরাসরি সতর্কবার্তা ছিল। এবং বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে লক রাজপরিবারের সরাসরি রোষানলে পড়তে চাননি। ১৬৮৮ সালের গৌরবময় বিপ্লবের সাফল্যের পরই লক জন পরিচিতি লাভ করেন। ইংল্যাণ্ডে ফিরেও আসেন। পরবর্তী জীবনে তিনি ব্রিটেনের ঔপনিবেশিকতার নীতির বিরোধিতা করেন। গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, মুদ্রণ যন্ত্রের স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার, সম্মতি ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রভৃতি ধারণার প্রচারক লক ছিলেন উদারনীতিবাদ ও Enlightenment-এর সার্থক প্রবক্তা।

৫৮.৪ লকের রাজনৈতিক চিন্তার সম্যক পরিচিতি

৫৮.৪.১ গৌরবময় বিপ্লবের তাত্ত্বিক রূপকার রূপে লক

জন লকের সবচেয়ে বিখ্যাত রচনা Two Treatises রচিত হয় ইংরেজ রাজসিংহাসনের বিরুদ্ধে এক প্রবল জনরোষ এবং বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে। অবশ্য এ বিষয়ে লক সুস্পষ্টভাবে কিছু না বললেও গ্রন্থটির বিষয়বস্তুই

লকের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে দেয়। লকের উদ্দেশ্য ছিল ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে উইলিয়ামের আরোহনের পথকে নিরঙ্কুশ করা। এই আরোহনের এক প্রতিকী তাৎপর্য্য ছিল — বিশ্ববাসী এবং ইংল্যাণ্ডের অধিবাসীদের কাছে প্রমাণ করে দেওয়া যে ইংল্যাণ্ডবাসী প্রকৃতিগতভাবে স্বাভাবিক অধিকার ভোগে প্রণোদিত এবং এই অধিকারের সুরক্ষায় তাঁদের দৃঢ় শপথ ইংল্যাণ্ডকে দাসত্ব এবং ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছে — লকের এই বক্তব্য তাঁকে গৌরবময় বিপ্লবের সার্থক তাত্ত্বিক রূপকার করে তুলেছে। মরিস ক্র্যাণ্টন থেকে শুরু করে প্ল্যামেনাৎস, সাবাইন টনি প্রমূখ সকল লকবিশেষজ্ঞ এইরূপ মতই ব্যক্ত করেছেন যে Two Treatises রচিত হয় গৌরবময় বিপ্লবকে বৈধতা প্রদান করার উদ্দেশ্যেই।

তবে অতি সম্প্রতি ল্যাসলে এই পরিচিত ব্যাখ্যা থেকে সরে এক স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তাঁর বক্তব্য — গৌরবময় বিপ্লবের অনেক আগেই অর্থাৎ ১৬৭৯-১৬৮১ সালেই লক সম্ভবত এই গ্রন্থের বেশীরভাগ অংশ লিখেছিলেন। কিন্তু ল্যাসলের এই মত বেশীরভাগ ঐতিহাসিক স্বীকার করেন না, গৌরবময় বিপ্লবের উদ্দেশ্যের সমর্থনের উদ্দেশে প্রতক্ষ্যভাবে এই গ্রন্থ রচিত না হলেও "হুইগ রক্ষণশীলতা"-র আধার রূপে এই গ্রন্থকে গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। "Two Treatises" বিপ্লবের দাবী করেনি বরং বিপ্লবকে যৌক্তিক প্রমাণ করতে বিশেষ ব্যগ্র ছিল। ক্র্যাণ্টন বলেন যে ঐ গ্রন্থের মূল অংশ বিপ্লবের ১০ বছর আগেই রচিত হয় এবং এর উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবের জন্য গৃহীত পদক্ষেপের জন্য জনসমর্থন তৈরী করা। গৌরবময় বিপ্লবের সমগ্র ঘটনা পরম্পরার কেন্দ্রবিন্দুতে আর্ল অফ শ্যাফট্সবেরী অবস্থান করেছেন। এও হওয়া সম্ভব যে লক তার গুরু প্রতীম শ্যাফট্সবেরীর চিন্তাই সুসংহত ভাবে প্রকাশ করেছিলেন, কারণ লক শ্যাফটস্বেরীর ভাবনাকে সম্পূর্ণভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। ১৬৫৯ সাল পর্যন্ত লক রাজতন্ত্রকে সমর্থন করতেন এবং দক্ষিণপন্থার অনুগামী ছিলেন ও Restoration কে সমর্থন করেছেন। ১৬৬৪ পর্যন্ত হবস্‌ের Leviathan-এর প্রভাব ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট।১৬৬৬ সালে Earl-এর প্রভাবে আসবার পর Locke-এর নিজস্ব চিন্তাধারা স্থিতিশীল হয়েছিল। শ্যাফট্সবেরীর প্রভাবেই লকের লেখনী ও চিন্তা হুইগ দলের রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জন সম্পর্কিত প্রচারের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল। লক বাস্তবে হুইগ দলের মতের চেয়ে বেশী কট্টরপন্থী ছিলেন। হুইগ দলের সুরে গলা মিলিয়ে তিনি রাজনৈতিক ক্ষমতাকে এক প্রকার Trust বা বিশ্বাস বলে গণ্য করেছেন। তবে হুইগ দল জনগণ বলতে সংসদকে গণ্য করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও লক সমগ্র সমাজকেই বুঝিয়েছেন।

বস্তুত সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ড ছিল এক তীব্র আবর্তময় সময়ে যা ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক এবং সাংবিধানিক বিবর্তনকে একটি নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করেছিল। এ সময়কালটিকে চারটি পর্বে ভাগ করা যায়— (ক) প্রথম জেমস-এর রাজ্যাভিষেকের সময় থেকে ১৬৪১-এর গৃহযুদ্ধের সময়কাল; (খ) ১৬৪২ সালে থেকে ১৬৬০ সময়কাল যখন অলিভার ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে এক কমনওয়েলথ গড়ে উঠেছিল; ১৬৬০ সালে দ্বিতীয় চার্লস-এর সিংহাসন গ্রহণ অর্থাৎ, রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা বা Restoration-এর সময় থেকে ১৬৭৯-১৬৮১ পর্বে Exclusion Crisis-এর মধ্যবর্তী সময় ; (ঘ) ১৬৮৮ সালে গৌরবময় বিপ্লবের ঘটনা। এই সকল ঘটনাপঞ্জীর কেন্দ্রীয় প্রশ্ন ছিল একটি — চরম রাজতন্ত্র কতটা শ্রেয় বা প্রাসঙ্গিক; পার্লামেন্টের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে রাজার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত করবার আবশ্যিকতা। এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে হুইগ দলের রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পর্কিত ধারণা এবং পার্লামেন্টের ভূমিকার মূল্যায়ন ছিল লকের চিন্তাধারায়

রাজনৈতিক সামাজিক প্রেক্ষাপট। ঈশ্বরপ্রদত্ত রাজক্ষমতার তত্ত্ব, উত্তরাধিকার, প্রজাতন্ত্র এই সকল ধারণাকে ঘিরে বিতর্ক, অস্থিরতার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র, স্থিতিশীলতা, গণসম্মতি প্রভৃতি বিষয়গুলি সামনে চলে এসেছিল এবং রাষ্ট্রবিরোধিতার বৈধতাকে স্বীকার করে নিয়েছিল। রাজা দ্বিতীয় চার্লস প্রায় বিস্মৃত ফিলমারের Patriarcha, অর্থাৎ, রাজার স্বাভাবিক ক্ষমতার তত্ত্বকে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগতভাবে পুনরুজ্জীবিত করেন। লকের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ফিলমারের তত্ত্বের অসারত্ব প্রমাণ করা।

৫৮.৪.২ সার্বভৌমের ক্ষমতার উৎস প্রসঙ্গে লকের বক্তব্য

লকের First Treatise ছিল ফিলমারের তত্ত্বের সমালোচনা এবং Second Treatise ছিল পৌর সরকারের লক্ষ্য এবং ক্ষমতার সীমা সম্পর্কে বিশ্লেষণ। সাধারণভাবে বলা হয় হবসই ছিলেন লকের প্রতিপক্ষ। আসলে হবস নন ফিলমারই লকের প্রধান প্রতিপক্ষ। তবে একথাও ঠিক যে হবসের চরম সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পর্কিত তত্ত্বকে পরিচালিত করাও লকের উদ্দেশ্য ছিল না। লক তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে সে যুগে প্রচলিত সামাজিক চুক্তির ধারণাকেই ব্যবহার করেছেন এবং বলেছেন যে বৈধ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব উৎপন্ন হয় জনগণের সম্মতির ভিত্তিতে। যদি জনগণের স্বাভাবিক স্বাধীনতা বা অধিকার বিঘ্নিত হয় বা সঙ্কুচিত হয় তখন জনগণ এই সম্মতি প্রত্যাহার করে নিতে পারে। Two Treatises স্বাধীনতা, সম্মতি ও সম্পত্তিকে বৈধ রাজনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তি বলে বর্ণনা করেছে। রাজনৈতিক ক্ষমতা এক বিশ্বাস যা রচনা করে সমগ্র পৌর সমাজ, এই সমাজই ঐ ক্ষমতার লক্ষ্য ও প্রকৃতি নির্ধারণ করে দেয়।

রাজনৈতিক ক্ষমতা এক বিশেষ প্রকার ক্ষমতা যার উৎস আলোচনা করতে গিয়ে লক প্রাকৃতিক সমাজের বর্ণনা দিয়েছেন যেখানে মানুষ রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োজন অনুভব করে নি, কারণ প্রাকৃতিক সমাজে পূর্ণ সাম্য স্বাধীনতার পরিবেশ বর্তমান ছিল। ব্যক্তি রাজনৈতিক দিক দিয়ে পূর্ণ ও স্বাধীনতা ভোগ করত। এমনকি রাজনৈতিক সমাজ গঠিত হবার পরও ব্যক্তি তার জীবনের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের স্বাতন্ত্রকে অক্ষুন্ন রেখে ব্যক্তিগত অভিলাষ ও সঙ্কল্পকে বাস্তবায়িত করবার পথকে উন্মুক্ত রাখতে সমর্থ হয়। রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে এবং "Private" ও "Public"-এর মধ্যে এই পৃথকীকরণ লকের তত্ত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। রাষ্ট্র ও সমাজ এবং ব্যক্তিগত ও গণস্বার্থের মধ্যে এই পার্থক্য করা লকের সময় থেকে আজ পর্যন্ত পাশ্চাত্য দর্শনের মুখ্য বৈশিষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। লক ফিলমারের রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পর্কিত বাইবেল ভিত্তিক ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং বলেছেন ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সম্পর্কের এক নৈতিক দিক রয়েছে যা বর্ণনা করতে গিয়ে আবার লক ফিলমারের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। মানুষের স্রষ্টা ঈশ্বরের কর্তব্য হল তার সৃষ্টির সত্তা সংরক্ষণে অগ্রসর হওয়া যার উপর প্রাকৃতিক সমাজের নৈতিকতা অবস্থান করে। প্রাক-রাজনৈতিক স্তরে এটি ছিল মানুষের জীবনধারার মুখ্য নির্ণায়ক। রাজনৈতিক ক্ষমতা সৃষ্টি হয় কেবলমাত্র সেই রাষ্ট্রে যেখানে মানুষ প্রাকৃতিক সমাজের স্বাধীনতা যা সে প্রাকৃতিক আইনের ঘেরাটোপে ভোগ করতো তা পৌর সমাজে ভোগে সমর্থ হয়। এভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতার বৈধতাকে তিনি একটি শর্তের অধীন করেছেন যার মাপকাঠিতে ক্ষমতার যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়। ঈশ্বর যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা অপচয়ের জন্য নয় ; মানুষের ভোগেই তার সার্থকতা; এমন কি মানুষের জীবনও ঈশ্বরের সৃষ্টিকে মানুষ

নিজের ইচ্ছানুযায়ী ধ্বংস করতে পারে না। ঈশ্বরের কাছে সব জীবনই সমান। লকের এই মতবাদ ধনতন্ত্রবাদ এবং বাজার অর্থনীতির চালিকা রূপে প্রাকৃতিক সম্পদের লুণ্ঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৫৮.৪.৩ প্রাকৃতিক সমাজের বর্ণনা

তবে প্রাকৃতিক সমাজের (State of Nature) চিত্রনে হবস যে হতাশার পরিচয় দিয়েছেন লক সে জাতীয় হতাশার পরিচয় দেন নি। লকের প্রাকৃতিক সমাজ যথেচ্ছাচারের প্রাকৃতিক সমাজ নয়, কারণ ব্যক্তি প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। এই প্রাকৃতিক আইন থেকেই ব্যক্তি তার স্বাভাবিক অধিকার অর্জন করে, যে স্বাভাবিক অধিকারগুলির মধ্যে মৌলিক হল জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার। মানুষের অন্তর্নিহিত যুক্তিবোধই মানুষকে প্রাকৃতিক আইন সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছে যার দরুণ মানুষ তার স্বাভাবিক অধিকার সংরক্ষণেও তৎপর হয়েছে। লক শুধু স্বাভাবিক অধিকারের কথাই বলেননি। সেই সঙ্গে স্বাভাবিক কর্তব্য পালনের উপরও জোর দিয়েছেন। স্বাধীনতার অর্থ লকের কাছে যথেচ্ছাচারের সুযোগ নয়, বরং প্রাকৃতিক আইন কর্তৃক আরোপিত সীমার মধ্যে থেকে কর্তব্য পালনেই স্বাধীনতা সার্থক হয়। স্বাধীনতার অর্থ শৃংখলা এবং ঐ শৃংখলা কেবলমাত্র আইনের দ্বারাই অর্জন করা সম্ভব। আইনই মানুষকে অন্যের একদেশদর্শীতার হাত থেকে রক্ষা করে। স্বাভাবিক অধিকার রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ প্রবণতা থেকে ব্যক্তিকে রক্ষা করে এবং যখন এই রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত হয় তখন ব্যক্তির স্বাভাবিক অধিকার সুরক্ষিত থাকে।

লক ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্রকে মৌলিক মানবাধিকার বলে গণ্য করেছেন। প্রাকৃতিক সমাজে কেউই অন্যের উপর বল প্রয়োগ করতে বা অন্যকে প্রভাবিত করতে বা এ জাতীয় অধিকার ভোগ করতে পারতো না। সকলেই সমান ভাবে এই প্রাকৃতিক স্বাধীনতা ভোগে সমর্থ ছিল। প্রাকৃতিক আইন বিষয়টিকে লক নিজেও ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে যে এ হল যুক্তিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত কিছু বিধি। অধিকার ও কর্তব্য পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ এবং তা প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা সৃষ্ট। সুতরাং এই অধিকার লঙ্ঘিত হলে অন্যেই দায়ী থাকবে এবং সেজন্য ঐ অধিকার ভঙ্গকারীকে শাস্তি পেতে হয়। যদিও লক ব্যক্তির আত্মপীড়নকে সমর্থন করেন নি বা আত্মহত্যার বিরোধিতা করেছেন তবুও শাস্তিদানের অধিকারকে স্বীকার করে নিয়েছেন এমনকি মৃত্যুদণ্ডকেও স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে আত্মহত্যা বা খুনের অধিকারকে লক কোন অবস্থাতেই স্বীকার করেন নি।

৫৮.৪.৪ পৌরসমাজ গঠনের উদ্দেশ্য

পৌরসমাজ গঠনের আবশ্যিক পূর্বশর্ত হল স্বাধীনতার ক্ষেত্রকে সুরক্ষিত ও প্রসারিত করা। প্রাকৃতিক সমাজের প্রকৃতি বর্ণনায় লক ঐ সমাজকে স্বাধীনতা ও সাম্যের প্রতীক বলেছেন কিন্তু এই সমাজে স্বাধীনতা ও সাম্যের কোন স্থায়ীত্ব ছিল না, কারণ মানুষের লোভ এবং ক্ষতিকারক মানসিকতা এই সাম্য ও স্বাধীনতার পরিবেশকে সততই বিপদগ্রস্ত করে রাখত। এই সমাজের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অসম্পূর্নতার কথা লক উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, প্রতিষ্ঠিত বিধিবদ্ধ ও পরিচিত আইনের অনুপস্থিতি; দ্বিতীয়ত, পরিচিত ও নিরপেক্ষ বিচারকের অনুপস্থিতি, এবং তৃতীয়ত, ন্যায়সংগত সিদ্ধান্তসমূহ বলবৎকারী প্রশাসনিক ক্ষমতার অনুপস্থিতি। এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা প্রাকৃতিক

সমাজকে এক অসম্পূর্ণতা প্রদান করেছিল এবং এই জাতীয় মতামত দ্বারা লক সমাজজীবনে কর্তৃত্বের গুরুত্ব বোঝাতে চেয়েছিলেন। যখন মানুষ সচেতনভাবে স্বাভাবিক আইনসমূহ মেনে চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তখনই কর্তৃত্ব সৃষ্টির পরিবেশ রচিত হয়েছিল, যার নিরপেক্ষ কর্তৃত্বসম্পন্ন সিদ্ধান্ত সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করতে পারে।

যে বিশ্বাস ও শর্তের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সৃষ্টি হয় সেই বিশ্বাস বা শর্ত ভঙ্গ করা হলে প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষমতা জনসমবায়ের আছে — লকের এই ধারণা সম্মতিতত্ত্বের বীজস্বরূপ এবং এখানেই রয়েছে হবসের সঙ্গে লকের পার্থক্য। হবসের যুক্তির বিশ্বাসযোগ্যতাই লকের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ যেখানে মানুষই পরস্পরকে বিশ্বাস করে না সেখানে কীভাবে সর্বশক্তিমান সার্বভৌমকে তাদের যৌথ স্বার্থ সংরক্ষণের দায়িত্বভার অর্পন করবে ? উপরন্তু ঐ সার্বভৌম শক্তিমানের বলপ্রয়োগ বা সহিংসতার বিরুদ্ধে কোন রক্ষাকবচ থাকবে না লক এই সম্ভাবনা সম্পর্কেও সংশয়ী।

চুক্তির মাধ্যমে মানুষ নিজেদের সংখ্যা গরিষ্ঠের শাসনে প্রতিষ্ঠিত করে এবং পৌরসমাজ গঠন করে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের সূচনা করে। তারা চুক্তির মাধ্যমে কেবলমাত্র তাদের আংশিক ক্ষমতা হস্তান্তর করে অর্থাৎ তিনটি স্বাভাবিক অধিকার — জীবন, সম্পত্তি ও স্বাধীনতার অধিকার চুক্তি দ্বারা সংস্থাপিত কর্তৃত্বের হাতে অর্পন করে। একবার যখন পৌর সমাজ গঠিত হয় এবং ব্যক্তি বিধিবদ্ধ সরকার গঠন করে তখন তার রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। এই গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে গৃহীত সব সিদ্ধান্তই সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত। আইন প্রণয়নের জন্য একটি কর্তৃত্বের অবস্থিতি সত্ত্বেও চূড়ান্ত ক্ষমতা গোষ্ঠীর কাছেই থাকে, যার পবিত্র কর্তব্য হল সমাজের স্থিতিকে রক্ষা করা। গোষ্ঠী যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত হওয়ায় তার সর্বজনীনতা বা গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্নের অবকাশ নেই। এই সর্বজনীনতা আইনের বলযোগ্যতার দ্যোতক — এই ধারণাটি লককে এই সিদ্ধান্তের পথে নিয়ে গেছে যে আইনসভার পাশাপাশি একটি শাসনবিভাগ থাকবে যার নির্দ্ধারিত কর্তব্য হবে প্রণীত আইনকে বলবৎ করা। সাধারণত একক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত শাসনবিভাগকেই লক শ্রেয় মনে করেছেন, যার বিচারবিভাগীয় ক্ষমতাও থাকা উচিত। লক শাসনবিভাগের বিশেষাধিকারের কথা স্বীকার করেছেন, তবে সঙ্গে সঙ্গে একথা বলেছেন যে শাসনবিভাগ আইন বিভাগের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে। আইনসভা ও শাসনবিভাগের স্বাতন্ত্রের কথা বলে লক মঁতেস্কুর ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের ধারণার পূর্বসংকেত দিয়ে গেছেন। সরকারের এক তৃতীয় বিভাগ হল যুক্তরাষ্ট্রীয় বিভাগ, যার দায়িত্ব হল চুক্তি সম্পাদন করা ও বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনা করা।

৫৮.৪.৫ লক ও সীমাবদ্ধ রাষ্ট্রের তত্ত্ব

লকের রাষ্ট্রতত্ত্ব একদিক দিয়ে সীমাবদ্ধ রাষ্ট্রের (Limited State) তত্ত্ব, কারণ অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি দেখেছেন যে সর্বাত্মক রাজনৈতিক ক্ষমতা অভিপ্রেত নয়। লক উত্তম রাষ্ট্রেরও পরিচয় দিয়েছেন — উত্তম রাষ্ট্র সেই রাষ্ট্র যা জনগণের স্বার্থে সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্রের জন্য জনগণ নয় — লকের এই বক্তব্যের বিপরীত মত প্রকাশ করেছেন পরবর্তী সময়ে জার্মান ভাববাদীরা। লকের রাষ্ট্রতত্ত্ব সম্মতিভিত্তিক যা ক্ষমতা সংবিধান দ্বারা বিধিবদ্ধ যা ব্যক্তি ও স্বৈরীক্ষমতার শাসনের পরিবর্তে আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত করে। এভাবেই সর্বাত্মক ক্ষমতাকে সীমায়িত করা

সম্ভব। একদিকে প্রাকৃতিক আইন এবং অন্যদিকে ব্যক্তি অধিকারের অমোঘতা রাষ্ট্র ক্ষমতাকে সীমায়িত করে। লকই প্রথম বলেছেন যে রাষ্ট্র কর্তৃত্ব যে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তা একান্তভাবেই রাজনৈতিক। রাজনৈতিক প্রকৃতির নয় এরূপ কোন ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। এমনকি জনকল্যাণ বা নিরাপত্তার কারণেও রাষ্ট্র অতিরিক্ত ক্ষমতার দাবী করতে পারবে না। যেকোন ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত ক্ষমতা জনগণের উপর ন্যস্ত এবং সরকার প্রতিষ্ঠা বা সরকারকে বরখাস্ত করার ক্ষমতা জনগণেরই। সুতরাং জনগণ সরকার বরখাস্ত করলেই প্রাকৃতিক সমাজে ফিরে যাওয়া নয়, যদিও হবস এ জাতীয় মতই প্রকাশ করেছেন। জনগণ সরকারের কার্যধারা মূল্যায়ন করার বা তাদের স্বাভাবিক অধিকার সংরক্ষণের পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী। প্রতিটি বিষয়ে ঐক্যমত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়, কারণ এই ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাকৃতিক সমাজে ফিরে যেতে হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত বা ইচ্ছার সঙ্গে ব্যক্তির ঐক্যমত্য সৃষ্টি না হলেও ব্যক্তি আত্মস্বার্থেই সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছাকে গ্রহণ করবে। ব্যক্তি আইন প্রণয়নের ক্ষমতা হস্তান্তর করলেও প্রণীত আইন স্বাভাবিক অধিকার বা প্রাকৃতিক আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ কিনা তা বিচার করবার শেষ অধিকার জনগণের উপরই ন্যস্ত। এই বক্তব্যের দ্বারা লক অন্যায় রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রতিরোধের স্বপক্ষে যুক্তির অবতারণা করেছেন।

First Treatise-এ এই বক্তব্য উপস্থাপিত করবার পর লক Second Treatise-এ আইনানুগ সরকারের ভিত্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। স্বাধীন মানুষ নিজেদের মধ্যে স্বাধীনভাবে চুক্তি সম্পাদন করে স্বেচ্ছায় সরকারের কাছে প্রশাসনিক ও আইনগত ক্ষমতা অর্পণ করে এক কর্তৃপক্ষের কাছে। মানুষ কেনই বা স্বেচ্ছায় পৌরসমাজ গঠন করল এবং কেনই বা সরকার গঠন করল লক তার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে প্রাকৃতিক সমাজের দিকে ফিরে তাকিয়েছেন। প্রাকৃতিক সমাজ সম্পর্কে লকের ধারণা হবসের ন্যায় হতাশাব্যঞ্জক নয়। কারণ, লক প্রাকৃতিক সমাজকে প্রকৃত স্বাধীনতা ও সাম্যের আধার বলেছেন। নিষ্ঠাবান খৃষ্টান হিসাবে তিনি মনে করতেন ঈশ্বর সবাইকে স্বাধীন ও সমানভাবে সৃষ্টি করেছেন। ব্যক্তিবর্গ সমান ভাবেই প্রাকৃতিক আইনের অধীন। প্রত্যেকেই একই সঙ্গে আইন বলবৎকারী এবং আইন লঙ্ঘন করলে শাস্তিদানে অধিকারী। সাধারণ আইন প্রণয়নকারী, বলবৎকারী ও বিচারকারী সংস্থার অভাবে আইনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল। সামাজিক প্রকৃতিসম্পন্ন মানুষ এর থেকে মুক্তি অর্জনের জন্য রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সৃষ্টির তাগিদ অনুভব করেছিল। হবস বর্ণিত প্রাকৃতিক সমাজ যেমন মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধের প্রতীক, লক বর্ণিত প্রাকৃতিক সমাজ ঈশ্বরের রাজ্যের স্বতস্ফূর্ততার ঐতিহ্যকে বহন করে, যেখানে প্রতিটি মানুষের স্বাভাবিক স্বাধীনতা ও অধিকার বর্তমান। হবস বর্ণিত প্রাকৃতিক সমাজের কদর্যতা এজন্য এখানে অনুপস্থিত। লক দেকার্তের ন্যায়ই আশাবাদী, কারণ তার প্রত্যয় যে মানুষ সত্যের পথের অনুগামী। মানুষ প্রকৃতিগতভাবে স্বাধীন, রাজনৈতিকভাবে সমান, কারণ ঈশ্বর এভাবেই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এই মানুষই স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক আইনের বলবৎকরণের ক্ষমতার অধিকারী, যা জনসমাজের সম্মতির ভিত্তিতেই ব্যবহৃত হয়। জনসম্মতির এই বিষয়টি লকের চুক্তির ধারণার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। একদিকে রয়েছে সুনির্দিষ্ট সম্মতি এবং অন্যদিকে রয়েছে অনুমিত সম্মতি। অনুমিত সম্মতির যথাযোগ্য সম্মতি প্রদান করা বা তার বাধ্যবাধকতা

কতদূর তা পরিমাপ করবার ক্ষেত্রে কিছু ধারণাগত সমস্যা রয়েছে। তবে সরকারী কর্তৃত্বকে মান্য করবার বাধ্যবাধকতার মূলে লক আরোপিত শর্ত হল যে শান্তি, নিরাপত্তা ও জনকল্যাণ বিধানে সেটি সমর্থ কিনা তা দেখা। সবচেয়ে বড় কথা ব্যক্তি প্রাকৃতিক সমাজে যে ক্ষমতা ভোগ করত তার চেয়ে বেশী ক্ষমতা কোন অবস্থাতেই রাষ্ট্রকে প্রদান করবে না। ফলে রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগকারী ক্ষমতা কখনই ব্যক্তিসত্তার তুলনায় বেশী গুরুত্বপূর্ণ নয়, যার দরুণ লকের চিত্রিত ব্যক্তি কখনই শর্তহীন আনুগত্য প্রকাশে বাধ্য নয়। লক এইভাবে রাষ্ট্রবিরোধিতার অধিকার এবং আনুগত্যের প্রশ্নকে এক ভারসাম্যপূর্ণ ধারণায় রূপান্তরিত করেছেন, যেখানে ভারসাম্যের কেন্দ্রবিন্দু হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র এবং ব্যক্তির স্বাভাবিক অধিকারের অমোঘতা। চুক্তির পরিধির সীমিত পরিসরও এই ভারসাম্য রক্ষায় সহায়ক। চুক্তি ততক্ষণই কার্যকরী, যতক্ষণ তা জীবন, সম্পত্তি ও স্বাধীনতা রক্ষায় সহায়ক। হবসের চুক্তি যেখানে অমোঘ ও চূড়ান্ত, লকের চুক্তি সেখানে শর্ত নির্ভর।

৫৮.৪.৬ সরকার পরিবর্তনের শর্ত — গণসম্মতি

স্বাভাবিকভাবেই লকের চুক্তি যেহেতু অমোঘ ও চূড়ান্ত নয় তাই এগুলি সবই সম্ভব। লক এক্ষেত্রে পাঁচটি পরিস্থিতির কথা বলেছেন। এগুলি হল —

(ক) আইনের প্রাধান্যের পরিবর্তে যখন শাসক ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নিজ স্বৈরী ইচ্ছা সমাজের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়;

(খ) যে লক্ষ্য বা সাধারণ অভিপ্রায়কে সামনে রেখে আইনসভা গঠিত হয় তাকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে বা যথাসময়ে মিলিত হওয়ার ক্ষেত্রে শাসক যদি বাধা সৃষ্টি করে;

(গ) যখন সাধারণ মানুষের ইচ্ছা বা স্বার্থের বিপক্ষে গিয়ে আইনসভা নির্বাচন ও নির্বাচন পদ্ধতির অনভিপ্রেত পরিবর্তন সাধনে শাসক একদেশদর্শী হয়ে অগ্রসর হয় ;

(ঘ) যখন শাসক বা আইনসভা স্বাধীন জনসমাজের উপর বিদেশী শক্তির প্রভুত্ব কায়েম করে ;

(ঙ) যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতা রয়েছে তারা যদি প্রচলিত বা পূর্বেকার প্রণীত আইনকে উপেক্ষা করে এবং তার ফলে যদি ঐ আইন বলবৎকরণে অসুবিধা হয়।

এই পাঁচটি কারণ এককভাবে বা সম্মিলিতভাবে বর্তমান থাকলে রাষ্ট্রের বিরোধিতা করা সম্ভব বলে লক মন্তব্য করেছেন। তার মতের যথার্থতা প্রমাণের জন্য প্রতিটি রাষ্ট্রকে সম্মতির উপর নির্ভর করতে হয়। তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে সংখ্যালঘু সামগ্রিক স্বার্থে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকে ও শাসনকে গ্রহণ করবে। প্রাথমিকভাবে লব্ধ এবং ধারাবাহিকতাসম্পন্ন সম্মতি, ক্ষমতা ও অধিকারের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করতে পারে। একটি সরকার যদি সাধারণ আইনানুগ ভাবে দায়িত্ব পালন করে এবং ব্যক্তিগত আদেশ ও ইচ্ছা দ্বারা প্রভাবিত না হয় তবে সেক্ষেত্রে সরকার কখনই স্বৈরাচারী হয়ে উঠবে না। সকল ব্যক্তি একই প্রকার আইনের অধীনস্থ হবে ফলে মৌলিক স্বাধীনতা ও সাম্যের পরিবেশ সম্মতিভিত্তিক রাষ্ট্রের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। শুধুমাত্র অন্যায়ভাবে সৃষ্ট ও সম্মতির দ্বারা

বিধিবদ্ধ ভাবে স্থাপিত নয় এমন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করা সম্ভব। তবে এইরূপ বলপ্রয়োগ অবশ্যই সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা ব্যবহার্য্য, কারণ লক একক ব্যক্তি বা ক্ষুদ্রগোষ্ঠীকে এই বলপ্রয়োগের ক্ষমতা ব্যবহারে অনুমতি দেননি।

৫৮.৪.৭ রাষ্ট্রবিরোধিতার অধিকার

লকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে পরিগণিত প্রাকৃতিক নিয়ম রাষ্ট্রের আইনের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হওয়ার বিষয়টি আধুনিক গণতন্ত্রের ভিত্তি বলে পরিগণিত হয়। লকের তত্ত্ব কর্তৃত্বের স্বচ্ছতার উপর জোর দেয় এবং সেই সঙ্গে ক্ষমতার প্রয়োগে দায়বদ্ধতার উপরও গুরুত্ব আরোপ করে যাতে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ প্রতিহত হয়। অন্যায়কারী স্বৈরীমানসিকতাসম্পন্ন রাষ্ট্র কর্তৃত্বকে প্রতিহত করার কথা বললেও লক এই ক্ষমতাকে ও বিপ্লবের প্রায়োগিক দিককে সুচিন্তিতভাবে ব্যবহার করার কথা বলেছেন। এই পথকে তিনি তিক্ত প্রতিবেষক বলেছেন, যা প্রাত্যহিক প্রয়োগের অনুকূল নয়। যখন মনে হবে বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে উত্তম সমাজব্যবস্থা অর্জন করা সম্ভব তখনই এই পথের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। সামান্য অপটুত্ব বা বিশৃংখলার কারণে রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বিরোধিতা করা অনুচিত। এই জাতীয় মত ব্যক্ত করে লক বলেছেন যে সম্মতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র এবং নাগরিকদের রাষ্ট্রবিরোধিতার অধিকার মিলিতভাবে বিদ্রোহ বা অরাজকতার পরিবেশকে প্রতিহত করতে পারে। মানুষ যদি সবসময় কর্তৃত্বের মূল্যায়ন করতে পারে তবে কর্তৃত্ব লৌকিক চরিত্র অর্জন করে। হবস চুক্তিবাদী ছিলেন, কিন্তু শেষে রাজনৈতিক স্বৈরাচারের স্বপক্ষে মত দিয়েছিলেন। সেই দিক দিয়ে বিচার করলে লক ছিলেন যথার্থই চুক্তিবাদী। স্বচ্ছতা ও মুক্ত অবাধ সংযোগসূত্র সমাজকে বিপ্লবের অস্থিরতা থেকে মুক্ত রাখতে পারে। লক নৈরাজ্যের সমর্থক ছিলেন না, সমর্থক ছিলেন পৌর সমাজের অধীনে পরিচ্ছন্ন জীবনের।

৫৮.৪.৮ লকের গণতান্ত্রিক বহুত্ববাদী মানসিকতা

লক ধর্মীয় সহনশীলতা (toteration) ও বহুত্ববাদের (Pluralism) সমর্থক ছিলেন। Letter নামক রচনায় তিনি পৌর আধিকারিককে জীবন, স্বাধীনতা এবং নিজদেহ ও মনের উপর সার্বভৌম অধিকারের সুরক্ষায় ব্রতী হতে বলেছেন। ঐ আধিকারিক জননিরাপত্তা, শান্তি ও সুস্থিতির জন্য ধর্মীয় আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ভোগ করবেন। এই পৌর আধিকারিককে তিনি Civil Magistrate বলে গণ্য করেছেন। এই Magistrate-এর বক্তব্যকে অবশ্য তিনি বিশ্বাসীর বিশ্বাসের উর্দ্ধে স্থাপন করেন নি। Magistrate দেখেন যে রাষ্ট্র এবং ব্যক্তির কল্যাণ ব্যাতীত অন্য কোন কারণে ব্যক্তিজীবনে প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা উচিত নয়। মানুষের পরিত্রাণ বা স্বর্গীয় আশীর্বাদ পাওয়া বা না পাওয়ার দায়ভার তার নিজের। কোন ধর্মীয় কারণে পীড়ন বা অত্যাচারকে লক স্বীকার করেন নি। জোর করে স্বীকারোক্তি আদায়ও সম্ভব নয়। ধর্মীয় ক্ষেত্রে সহনশীলতা এবং ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও সেই সঙ্গে নাস্তিকদের মধ্যে লক প্রথমোক্ত মতের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। ১৬৭৯ সাল থেকে ১৬৮৫ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সে যেভাবে "হিউগেনট' দের উপর অত্যাচার চলেছে লক তার প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ করেছেন। লক কিন্তু তা সত্ত্বেও ধর্মীয় কারণে রাষ্ট্রকে প্রতিরোধ করবার কথা প্রতক্ষ্যভাবে বলেননি—শুধু যেকোন প্রকার নিপীড়নের বিরুদ্ধাচরণের কথা বলেছেন।

৫৮.৫ লকের দর্শনের তাৎপর্য

লকের রাজনৈতিক দর্শন মূলত রাষ্ট্রবিরোধিতার তত্ত্বের স্বপক্ষে জোরালো সমর্থনের প্রতীক। রাজনৈতিক আনুগত্য, যা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে বৈধতা দান করে, এবং রাষ্ট্রবিরোধিতার মধ্যে কোন কারণে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হলে লক পরিস্কারভাবে রাষ্ট্রবিরোধিতার পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর এই মতের উপরেই লকের দর্শনের সমগ্র পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে। লকের রাষ্ট্রতত্ত্ব, সার্বভৌমিকতা সম্পর্কিত তত্ত্ব, অধিকার তত্ত্ব এবং ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কিত ধারণারও কেন্দ্রীয় উপজীব্য বিষয় রাষ্ট্র বিরোধিতার ধারণা। এই একই উদ্দেশ্যকে অবলম্বণ করে তিনি বলেছেন যে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব জনসম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। তার মতে যে কোনও কর্তৃত্ব — রাজনৈতিক বা পিতামাতার কর্তৃত্ব, এক Trust বা বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত যা মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকেই অর্জন করেছে। তাই মানুষের নিজের জীবনকে ধ্বংস করার কোনও অধিকার নেই, কারণ তা ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত। লকের এই মত খৃষ্টীয় মতাদর্শের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ, কারণ ঐ মতাদর্শে বলা হয় যে কেবলমাত্র মানবীয় শাসক কর্তৃক নাগরিক বা বিদেশী শত্রুর প্রাণসংহার তখনই বৈধ, যদি তা নাগরিকদের জন্য অনিষ্টকর পরিবেশ তৈরী করে। লকের এই মতের মধ্যে জাতিরাষ্ট্রের সংকেত রয়েছে এবং এটি উদীয়মান ধনতন্ত্রবাদের পক্ষে বিকাশের অনুকূল রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। লকের এই অভীপ্সা গৌরবময় বিপ্লবের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছিল। ফিলমার যেখানে শাসকের অধিকারকে ঈশ্বরপ্রদত্ত বলে গণ্য করেছিলেন, লক তার বিপরীতে নাগরিকদের আনুগত্য প্রকাশের কর্তব্য এবং শাসকের শাসনের অধিকারের মধ্যে পার্থক্য করেন। বেশীর ভাগ সমাজে নাগরিকদের কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের বিষয়টি গুরুত্ব পায়, কারণ এই আনুগত্যের সঙ্গে শান্তি এবং পূর্ণ নাগরিক জীবনযাপনের প্রশ্ন জড়িত। যখন এই শান্তি ও পূর্ণতার সম্ভাবনা উজ্জ্বল, তখনই কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ হয়ে দাঁড়ায় এক পবিত্র কর্তব্য। কর্তৃত্বের কোন কাজ এই সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করলে পৌরসমাজ বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং সেক্ষেত্রে আনুগত্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা থাকে না। বরং ঐ কর্তৃত্বকে প্রতিহত করা হয়ে ওঠে পবিত্র কর্তব্য। এভাবে ফিলমারের বিরোধিতা করতে গিয়ে লক শাসককে পৌর সমাজের অছি বা Trustee করে তুলেছেন। লকের এই মতবাদ ইংল্যাণ্ড তথা ইওরোপে সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের তাত্ত্বিক বুনিয়াদ রচনা করে।

৫৮.৬ স্বাভাবিক অধিকার ও সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কিত তত্ত্ব

লকের রাজনৈতিক- দর্শনের অন্যতম কেন্দ্রীয় বিষয় হল তাঁর স্বাভাবিক অধিকার (Natural Rights) এবং সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কিত ধারণা। গ্রোটিয়াস এবং পুফেনডর্ফ-এর পথ অনুসরণ করে লক বলেন যে মানবিক যুক্তি এবং শাস্ত্র অনুসারে এই গ্রহ এবং তার সম্পদের মালিক ঈশ্বর। কিন্তু ঈশ্বর এসবের উপর মানুষের সমান ভোগ দখলের অধিকার স্বীকার করেছেন। ফিলমার যেভাবে গ্রোটিয়াসের ব্যক্তিগত অধিকার তত্ত্বের সমালোচনা করেছেন লক তার প্রত্যুত্তর দিতে চেয়েছেন। ফিলমার

বলেছেন যে ঈশ্বর পৃথিবী ও সম্পদ ভোগ দখলের অধিকার আদম এবং তার উত্তরাধিকারীদের উপর অর্পণ করেছেন — এই যুক্তি লক স্বীকার করেননি। এছাড়া লকের মত হল, মানুষের শ্রম ঠিক করে দেবে কোন সম্পত্তি ব্যক্তিগত অধিকারে রয়েছে আর কোন সম্পত্তি সাধারণের অধিকারে রয়েছে। মানুষের শ্রমশক্তি হল তার ব্যক্তিগত অধিকারে স্থাপিত এবং যখন প্রাকৃতিক সম্পদ বা একখণ্ড জমিতে ঐ ব্যক্তিগত শ্রম মিশ্রিত হয় তখন ঐ সম্পদের উপর তার মালিকানা সত্তা জন্মায় এবং ভোগ দখলী স্বত্ত অর্জন করে। লকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ পৃথিবীতে কী উৎপন্ন করছে বা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কী রেখে যাচ্ছে সেগুলি। ঈশ্বর পৃথিবীর সম্পদ মানুষকে দিয়েছেন এই জন্য যে মানুষ যেন পৃথিবীকে আরও বাসযোগ্য করে তুলতে পারে। এজন্য মানুষের উদ্যোগকে লক গুরুত্ব দিয়েছেন, কারণ মানুষের ঔদ্যোগিক ক্ষমতা ও যুক্তিবোধ এই অর্জিত সম্পদের কল্যাণে মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধতর করে তুলবে। এখানেও লকের বক্তব্যে অছির বিষয় এসেছে। প্রাকৃতিক সম্পদ আত্মসাৎ, ধ্বংস বা লুঠতরাজ লকের তত্ত্বে স্বীকৃতি পায়নি। পিউরিটান নীতিবোধ লকের সম্পত্তি তত্ত্বে প্রবলভাবে উপস্থিত।

প্রাকৃতিক সমাজে মানুষ কেবলমাত্র নিজের প্রয়োজনটুকু মেটাবার উপযোগী সম্পদের উপর অধিকার কায়েম করেছিল এবং বাকি সম্পদের উপর অন্যের অবাধ ও সমান অধিকার ছিল। একজন মানুষ নিজশ্রম ও নিজ হাতে যতটা শ্রম করতে পারে ঠিক ততটাই তার ব্যক্তিগত মালিকানার অধীন। শ্রম শুধু সম্পত্তি সৃষ্টি করে না, সেই সঙ্গে সৃষ্টি করে সম্পত্তির মূল্য। প্রাকৃতিক সম্পদে মানুষের শ্রম যুক্ত হলে সৃষ্টি হয় সমৃদ্ধি। লকের মতে আমেরিকা প্রাচুর্যের দেশ হলেও সপ্তদশ শতকের ব্রিটেনের সুবিধাগুলি আমেরিকায় ছিল না। লক বিশ্বাস করতেন যে অভাব কোন সমস্যা নয়, কারণ প্রত্যেকের তৃপ্তির জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ পৃথিবীতে রয়েছে। মানুষের সীমাহীন লোভই সব সমস্যার কারণ। প্রাকৃতিক সমাজে সম্পত্তি নিয়ে এই সমস্যা ছিল না, কারণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত তৈরী করার কোন তাগিদ মানুষের ছিল না। প্রাকৃতিক আইন দ্বারা লব্ধ সম্পত্তির উপর স্বাভাবিক অধিকার পৌর সমাজ গঠনের আগেই মানুষ সুনিশ্চিতভাবে ভোগ করত। কিন্তু উদ্বৃত্তই তৈরী করল নানা ধরনের জটিলতা, উদ্ভূত হল বিনিময়ের মাধ্যম রূপে মুদ্রাব্যবস্থার এবং মজুতদারীর, যা কিনা সৃষ্টি করেছিল সমাজে ব্যপক ধন বৈষম্য এবং অসাম্যের। তাই পৌর সমাজ গঠনের আগেই ছিল গতিশীল অর্থনীতি, যেখানে সরকারের উদ্ভব অনেক পরের ঘটনা। লক তাই মুনাফাবাজির বিরোধিতা করেছেন। সম্পত্তি সম্পর্কিত লকের তত্ত্ব সরকারের কর্তব্য সম্পর্কে আলোকপাত করে। সরকারের কর্তব্য হল মানুষের জীবন ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করা। কমনওয়েলথ, অর্থাৎ রাজনৈতিক সমাজে কর্তৃপক্ষ যদি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়, তবে সম্পত্তির ও অন্যান্য অধিকার সুরক্ষিত থাকে। লক সম্পত্তির সঙ্গে রাজনৈতিক ব্যবস্থার তুলনায় সামাজিক প্রক্রিয়ার যোগসূত্র বেশী করে লক্ষ্য করেছেন। কারণ, তার মতে সম্পত্তির একটি সামাজিক চরিত্র রয়েছে যা লককে সীমিত রাষ্ট্রের ধারণা পোপের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে যেটি ব্যক্তির স্বাধীনতার দিগন্তকে প্রসারিত করে। যেহেতু সম্পত্তিসহ অন্যান্য স্বাধীনতা ব্যক্তির নিজ প্রয়াস ও শ্রম দ্বারা লব্ধ তাই সীমিত রাষ্ট্রই এগুলির শ্রেষ্ঠ সুরক্ষা। ব্যক্তির সম্মতি ব্যতীত রাষ্ট্র ব্যক্তির সম্পত্তির

হরণ করতে পারবে না। চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে সরকার প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য বা শর্ত হল ব্যক্তির স্বাধীনতা ও সম্পত্তির পরিধিকে সুরক্ষিত করা এবং বিধিবদ্ধ আইনগত চরিত্র প্রদান করা।

ম্যাকফারসনের মতে লক যে যুক্তিজালের সাহায্যে তাঁর সম্পত্তি সম্পর্কিত ধারণাকে ব্যক্ত করেছেন তা লককে বুর্জোয়া জীবন দর্শনের তত্ত্বকার করে তুলেছে, কারণ তিনি কার্যত সম্পত্তির মালিক শ্রেণীর বিশেষাধিকারে স্বপক্ষেই কথা বলেছেন। তাঁর তত্ত্বে শ্রম প্রদান এবং শ্রমদ্বারা লব্ধ বস্তুর বণ্টনের প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্যের স্বপক্ষেই মত ব্যক্ত হয়েছে। লক অধিকারভোগের ক্ষেত্রে শ্রেণীগত বৈষম্যকে স্বীকার করেছেন। স্বীকার করেছেন শ্রেণী ভিত্তিক যুক্তির পার্থক্যকে এবং পারিশ্রমিকের পার্থক্যকে। এইভাবে বাজারকেন্দ্রিক ধনতান্ত্রিক সমাজের নৈতিকতার সোচ্চার প্রবক্তা হয়ে উঠেছিলেন লক। প্রাকৃতিক সমাজে সাম্যের ধারণায় বিশ্বাসী লক এভাবেই ভিন্ন অধিকারসহ দুটি শ্রেণী বিশিষ্ট সম্পত্তির অধিকারী এবং সম্পত্তির অধিকার লাভে বঞ্চিত — সমাজের স্বপক্ষে তার চিন্তা ব্যক্ত করেছিলেন।

সম্প্রতি অবশ্য ম্যাকফারনের যুক্তিকে অনেক পণ্ডিতই গ্রহণ করতে চাননি। উড বলেন যে ম্যাকফারসন ইতিহাসকে বিকৃত করেছেন, কারণ লকের তত্ত্বে শিল্প পুঁজিবাদের পরিবর্তে কৃষি পুঁজিবাদের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত হয়েছে, এই কারণে লক জমির সঙ্গে শ্রম মিশ্রণের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এটাই স্বাভাবিক কারণ সপ্তদশ শতকের ইংল্যাণ্ডে কৃষি ছিল অর্থনীতির মূল ভিত্তি এবং স্বাভাবিক কারণেই জমির মালিকানা সম্পদ, সামাজিক মর্যাদা ও ক্ষমতার মূল প্রতীক ছিল। বাণিজ্য বা শিল্পপুঁজি তখনও ছিল একেবারে ভ্রূণাবস্থায়। বাজারভিত্তিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ একেবারে সীমিত পরিধির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। ইংল্যাণ্ডে যখন Enclosure Movement শুরু হয় তখনই লক কেবলমাত্র অধিক উৎপাদনশীলতার স্বার্থে শ্রম এবং শিল্পের গুরুত্বের কথা বলেছিলেন। কারণ ঐ আন্দোলন মালিকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অধিগ্রহণের নীতির বিরোধিতা করে। এছাড়া ইবেনষ্টেইন ম্যাকফারসনের এই মতকে স্বীকার করেননি যে, লক মজুরী দাসত্বের নীতিকে তাঁর সম্পত্তি তত্ত্বের মধ্যে দিয়ে সমর্থন করেছেন। ইবেনষ্টেইনের মতে, লক সম্পত্তির ধারণাটিকে অনেক ব্যাপক ও প্রসারিত অর্থে ব্যবহার করেছিলেন যার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল অন্যকে দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করা নয়, বরং তাকে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্তি দেওয়া। লকের মধ্যে প্রথমদিককার উদারনীতিবাদীদের সম্পত্তি সম্পর্কিত নৈতিক মূল্যবোধের স্পর্শ লক্ষ্য করা যায়। বিয়ানের মতে, লক বুর্জোয়া শ্রেণী কর্তৃক অবদমিত শ্রমিক শ্রেণী — এই লক্ষণ বহনকারী রাজনৈতিক সমাজ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন বলে ম্যাকফারসন যে অভিযোগ করেছেন তার কোন যথার্থতা নেই। বরং বিধিবদ্ধ সংবিধান দ্বারা সংস্থাপিত রাজনৈতিক সমাজ গঠন করলে সমাজবদ্ধ সকলের যৌথ স্বার্থ চরিতার্থ হবে লক এই মতই ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। জন বলেন যে সামাজিক জীবনে ন্যায় প্রতিষ্ঠাই ছিল লকের প্রধান উদ্দেশ্য। এই ন্যায়ের স্বার্থে একাধারে সম্পত্তির মালিকানা এবং অন্যদিকে ঈশ্বরের ইচ্ছারূপে প্রাকৃতিক আইনকে মান্য করার গুরুত্বের কথা বলেছেন। টুলির মতে, লক সম্পত্তির ধারণার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক জীবনে ন্যায় প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। কারণ লকের সম্পত্তি তত্ত্বকে ঘিরে অনেক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে, যেমন কীভাবে শ্রমজাত পণ্যের ন্যায়সংগত

বণ্টন হবে, শ্রমকে কীভাবে বণ্টন করা হবে বা কোনরূপ শোষণ ছাড়া শ্রমকে সংগঠিত করা যায় কিনা ইত্যাদি। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দার্শনিকরা এই প্রশ্নগুলিকে নিয়েই পরবর্তীকালের দর্শনভাবনাকে পরিচালিত করেছেন।

৫৮.৭ মূল্যায়ন

রাজনৈতিক দর্শনের ইতিহাসে জন লক এক অত্যন্ত বিতর্কিত এবং প্রভাবশালী নাম। দর্শনচিন্তার রীতি, প্রাকৃতিক আইন, অর্থনীতি রাষ্ট্রতত্ত্ব, শিক্ষা, ধর্মীয় সহনশীলতা ধর্মতত্ত্বসহ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর রচনা যে তরঙ্গ তৈরী সৃষ্টি করেছিল তা এ্যারিষ্টটলের প্রভাবের সঙ্গেই তুলনীয়। তার রচনা Enlightenment এবং আধুনিক যুগের যুগদর্শন। লকের চিন্তাগত ঐতিহ্যের সুযোগ্য উত্তরসূরী হলেন হিউম ও বেন্থাম এমন কি মার্ক্স ও লকের চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হন। লকের সম্পত্তি তত্ত্ব সর্বাধিক সমালোচিত হয়েছে, তবে লকের বেশীর ভাগ সমালোচক এই তত্ত্বের অন্তর্নিহিত উদারনৈতিক বক্তব্যকে উপলব্ধি করতে পারেন নি। লকের সংবিধানিকতার প্রতি আস্থা, সম্পত্তিতত্ত্ব, সহনশীলতার আদর্শ এ সবই আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্বের ভিত্তি। Civil Society বা পৌর সমাজের ধারণার স্রষ্টা হলেন লক। সুবিধা এবং চুক্তি এ দুটি ধারণা পরস্পর যুক্ত। লক মূলত সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর আকাংখা, আশংকা ও মনোবাসনার কথা বলেছেন। লক কতটা বৈপ্লবিক ছিলেন তা বোঝাবার জন্যে বার্কের কথা বলতে হয়, কারণ লকের মৃত্যুর একশ বছর পরেও বার্ক গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বের আদর্শকে গ্রহণ করতে পারেন নি। লকের তত্ত্ব চারটি মৌলিক সমস্যাকে স্পর্শ করেছিল — (ক) রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রকৃতি; (খ) ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে সম্পর্কের জটিলতা; (গ) বাণিজ্যবাদের বিকাশের প্রথম পর্বে সরকারের কার্যধারার প্রকৃতি; (ঘ) ধর্মীয় ও রাজনৈতিক তত্ত্বের যথাযোগ্য রূপ। লকের তত্ত্ব রাজনৈতিক এবং বৌদ্ধিক প্রবণতার ক্ষেত্রে মৌলিক প্রকৃতিগত পরিবর্তনের প্রতীক। প্রতীকী অর্থে ব্যক্তিকে আনুগত্যের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন লক, প্রতিষ্ঠিত করেছেন ব্যক্তির সার্বভৌমত্ব, যার সুরক্ষার শর্তে সরকারী ক্ষমতার বৈধতা লব্ধ হয়। এভাবেই লক উদারনৈতিক গণতন্ত্রের স্বপক্ষে তাত্ত্বিক বুনিয়াদ প্রস্তুত করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে একটি জনপ্রিয় ধারণা হল এই যে, মার্কিন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী সমাজ ও রাজনীতি লকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের প্রতিচ্ছায়ায় গড়ে উঠেছে ইংল্যান্ডের সামাজিক পট পরিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তাঁর আবির্ভাব যেখানে শুধুমাত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ নয়, মানুষের শ্রেষ্টত্ব অর্জন ও পূর্ণতালাভের পথও নির্দেশ করেছিল। ন্যায়বিচার, সাহসিকতা, আত্মত্যাগ পরিশ্রমী প্রকৃতি ও সততা এ সবের জয়গান করেছেন লক। প্রকৃতির প্রাচুর্যকে সদ্ব্যবহার করে জীবনকে সমৃদ্ধ করার বাণী প্রচার করেছেন লক। লক যে বৌদ্ধিক কাঠামো নির্মাণ করেছিলেন তা পরবর্তী কালের ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদী তাত্ত্বিক থেকে শুরু করে তাঁদের বিরোধী সাম্যবাদী ও ফ্যাসীবাদী দার্শনিকদেরও প্রভাবিত করেছিল। লকের মতকে গ্রহণ করা হবে না তাকে প্রত্যাখান করা হবে এই প্রশ্নকে উপজীব্য করেই পরবর্তী চার শতাধিক বছরের রাজনৈতিক চিন্তা ও মতাদর্শ আবর্তিত হয়েছে।

৫৮.৮ সারাংশ

এই এককটি পাঠ করে আমরা লকের উদারনৈতিক চিন্তাধারার বহুমাত্রিক প্রকাশভঙ্গিকে উপলব্ধি করতে পারলাম। লক এক নূতন ভাবনার প্রথম সোচ্চার প্রবক্তা যিনি ব্যক্তিসত্তা, স্বাভাবিক অধিকার এবং স্বাতন্ত্রের উর্দ্ধে কোন কিছুকেই স্থান দিতে চান নি। সেই দিক দিয়ে লককে উদারনৈতিক মানুষ ও গণতন্ত্রের প্রবক্তা বলা অত্যুক্তি হবে না।

৫৮.৯ অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন :

(১) লককে গৌরবময় বিপ্লবের তাত্ত্বিক রূপকার বলা কতদূর যুক্তিযুক্ত ?

(২) প্রাকৃতিক সমাজ এবং সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস প্রসঙ্গে লকের বক্তব্য বিশ্লেষণ করুন।

(৩) সীমাবদ্ধ রাষ্ট্র সম্পর্কে লকের মত আলোচনা করুন।

(৪) রাষ্ট্রবিরোধিতা ও সরকার পরিবর্তন সম্পর্কে লকের মত কী ?

(৫) স্বাভাবিক অধিকার ও সম্পত্তির অধিকারকে লক কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ঃ

(১) কোন তাৎক্ষণিক ঘটনা লকের চিন্তাজগতকে আলোড়িত করেছিল ?

(২) লককে কেন 'Enlightenment'-এর বৌদ্ধিক গুরু বলা হয় ?

(৩) লকের বর্ণিত প্রাকৃতিক সমাজ এবং হবস বর্ণিত প্রাকৃতিক সমাজের মধ্যে মূল পার্থক্য কী ?

(৪) লক কখন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণকে সঙ্গত বলেছেন ?

৫৮.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১। Ashcraft : *R. Revolutionary Politics and Locke's to Treatises of Government London, Allen & Urwin (1986).*

২। Berki, R. N. : *The History of Political Thought ; A Short Introduction London, Sent (1977).*

৩। Berlin, Siv I. : *Four Concepts of Liberty, Oxford, Oxford University Press (1969).*

৪। Bunn, J. *The Political Thought of John Locke Cambridge University Press, Cambridge (1968).*

৫। Plamenat z, *J. Man & Society, 2vols. Lendu, Longman (1963).*

৬। Mukherjee Subrata and Ramaswamy Sushila — *A History of Political Thought.*

৭। Mukhopadhyay Amal Kumar — *New Delhi Prentice Hall of India (1999). Western Political Thought. Plato to Marx Calcutta, K.P. Bagchi, (1980).*

৮। চক্রবর্তী দেবাশিস — *রাষ্ট্রচিন্তার ধারা; ম্যাকিয়াভেলি থেকে রুশো। কলকাতা, সেন্ট্রাল বুক পাবলিশার্স (১৯৯০)।*

একক ৫৯ □ শার্ল লুই মঁন্তেস্কু (১৬৮৯-১৭৭৫)

গঠন

৫৯.০ উদ্দেশ্য

৫৯.১ প্রস্তাবনা

৫৯.২ প্রারম্ভিক পরিচিতি

৫৯.৩ মঁন্তেস্কুর চিন্তার রাজনৈতিক সামাজিক প্রেক্ষাপট

৫৯.৪ মঁন্তেস্কুর রাজনৈতিক দর্শন

৫৯.৪.১ আইন সম্পর্কিত ধারণা

৫৯.৪.২ প্রাকৃতিক সমাজ ও আইন

৫৯.৪.৩ সমাজ বিকাশ ও আইনের বিবর্তন

৫৯.৪.৪ সাংবিধানিক আইনের ধারণা

৫৯.৪.৫ সরকারের প্রকারভেদ

৫৯.৪.৬ সরকারের প্রকারভেদের বাস্তব মূল্যায়ন

৫৯.৫ স্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারণা

৫৯.৬ মন্তেস্কু ও ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণের ধারণা

৫৯.৬.১ ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল্যায়ন

৫৯.৭ দাসপ্রথা ও ধর্মীয় পীড়ন সম্পর্কিত ধারণা

৫৯.৮ অধিকার তত্ত্বের মূল্যায়ন

৫৯.৯ রাষ্ট্রদর্শনের বিকাশে মঁন্তেস্কু-এর অবদান

৫৯.১০ উদারনীতিবাদের বিকাশে তাঁর অবদান

৫৯.১১ সারাংশ

৫৯.১২ অনুশীলনী

৫৯.১৩ গ্রন্থপঞ্জী

৫৯.০ উদ্দেশ্য

আধুনিক ইওরোপীয় উদারনীতিবাদ এবং মানবতাবাদী চিন্তাধারার বিকাশের ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব হলেন মঁন্তেস্কু। মঁন্তেস্কু-এর চিন্তা তার রচনা এবং প্রভাব সম্পর্কে পাঠককে পরিচিত করাই এই এককটির উদ্দেশ্য। পাঠক এই এককটি পাঠ করে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানিক রূপটি কীভাবে

বিকশিত হয়েছে সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করবেন। এই এককটির উদ্দেশ্য —

- পাঠককে মঁতেস্কু-এর জীবন এবং রচনা সম্পর্কে অবহিত করা।
- তাঁর চিন্তার প্রেক্ষাপটকে জানা।
- আইনের বিবর্তন এবং প্রকারভেদকে জানা।
- সাংবিধানিক আইন ও সরকারের প্রকারভেদকে জানা।
- স্বাধীনতার ধারণা সম্পর্কে তাঁর অবস্থানের বিশ্লেষণ।
- ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল্যায়ন।
- দাস প্রথা, ধর্মীয় কারণে পীড়ন এবং অধিকার সম্পর্কে তাঁর অবস্থানের মূল্যায়ন।
- রাজনৈতিক দর্শনের ধারাপথের বিবর্তনে তার অবদান।

৫৯.১ প্রস্তাবনা

শুধুমাত্র তাঁর সমসাময়িক ফরাসী চেতনাকেই নয় সমগ্র পরবর্তী প্রজন্মের চিন্তাবিদদের মনোজগৎকে আলোড়িত করেছিলেন মঁতেস্কু, কারণ সমাজ, মানবপ্রকৃতি, আইনের স্বরূপ, ক্ষমতার প্রকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি দার্শনিক বক্তব্যমাত্রই নয়, পেশ করেছিলেন নির্ভেজাল বাস্তববাদী মতামত যার প্রাসঙ্গিকতা আজও অম্লান। ফরাসী জ্ঞানচর্চার সার্থক প্রতীক মঁতেস্কু। তিনি শুধু তাঁর সময়ের প্রবণতাকেই উপলব্ধি করেননি, সেই সঙ্গে উপলব্ধি করেছেন মানুষের প্রবৃত্তির গতিপ্রকৃতিকে। তাঁর চিন্তাধারা স্বাভাবতই তাঁকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল পারীর সাঁলোন এবং বুদ্ধিজীবি মণ্ডলীর কাছে। তিনি তখনকার মূল্যবোধ এবং প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ে যেভাবে পরিহাস করেছিলেন তাতেই তাঁর চিন্তার গভীরতার বিচ্ছুরণ ঘটেছিল। যৌক্তিকতা ভিত্তিক রাজনীতি সম্পর্কে দীর্ঘ ফরাসী বৌদ্ধিক অচেতনতার বাধাকে তিনি প্রথম অপসারিত করতে সফল হন। ষোড়শ শতকের শেষভাগে বুরবোঁ রাজবংশ ক্ষমতাসীন হবার পর একমাত্র মঁতেস্কু-এর বৌদ্ধিক উৎকর্ষই ইওরোপকে আলোড়িত করতে পেরেছিল। এই জন্য রাজনৈতিক দর্শনের পাঠক পাঠিকাদের কাছে মঁতেস্কু আজও অবশ্য পাঠ্য।

৫৯.২ প্রারম্ভিক পরিচিতি

ইংল্যাণ্ড এবং ইওরোপের রাজনৈতিক চিন্তার বিবর্তনে বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের অবদান আলোচনা করতে গেলে মঁতেস্কুর নাম অনিবার্যভাবে এসে পড়বে। তাঁর জীবন ছিল শান্ত নিস্তরঙ্গ, কারণ তাঁর সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয়েছিল জ্ঞানচর্চার স্বার্থে, যেখানে না ছিল রুশোর ন্যায় কোন রোমান্টিক জীবনাদর্শ না ছিল কোন রোমাঞ্চকর লক্ষ্য। মেধা, বৌদ্ধিক উৎকর্ষ এবং সহনশীল গণতান্ত্রিক সমাজ

গঠন এসবই ছিল মঁন্তেস্কুর লক্ষ্য। ফ্রান্সের এক অভিজাত পরিবারে জন্মের সুবাদে তিনি তখনকার প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে অল্পবয়সেই সংযুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। বোরদ্যঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আইন বিষয়ে উচ্চশিক্ষাও লাভ করেছিলেন। এরপর তিনি আইনজীবী রূপে কর্মজীবনে প্রবেশ করেছিলেন। বোরদ্যঁর পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্টের পদ ১২ বছর অধিকার করে থাকলেও তাঁর মন প্রাণ সমর্পিত ছিল সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রতি। ১৭২১ সালে তাঁর বিখ্যাত রচনা 'The Persian Letters' প্রকাশিত হয়। তিনি এটি ছদ্মনামে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে তৎকালীন ফরাসী সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে সুক্ষভাবে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। ক্রমে বোরদ্যঁর পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার পালন তাঁর পক্ষে অসুবিধাজনক হয়ে পড়ায় তিনি ঐ দায়িত্বভার ত্যাগ করে প্যারিসে চলে আসেন এবং সাহিত্য ও সামাজিক বিষয়াদির সঙ্গে পূর্ণ সময়ের জন্য যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৭২৫ সালে তিনি French Academy-র সদস্য নির্বাচিত হন কিন্তু যেহেতু তিনি প্যারিসের স্থায়ী নাগরিক ছিলেন না সেইহেতু তার নির্বাচন বাতিল হয়ে যায়। পরে তিনি প্যারিসের স্থায়ী নাগরিক হওয়ায় ১৭২৮ সালে পুনরায় Academy তে নির্বাচিত হন। এরপর তিনি সমগ্র ইওরোপ সফর করেন এবং অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, জার্মানী এবং ইংল্যাণ্ডের মানুষ এবং প্রতিষ্ঠানকে তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। বিশেষত তিনি ইংল্যাণ্ডের প্রতি অধিক আকর্ষণবোধ করেছিলেন এবং সেখানকার বিদ্বৎসমাজের সঙ্গে মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হন।

মঁন্তেস্কুর ইংল্যাণ্ডের প্রতি আকর্ষণবোধ করার কারণ তিনি ঐ দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর কার্যকলাপে মুগ্ধ হয়েছিলেন, যা পরবর্তীকালে মঁন্তেস্কুর রাজনৈতিক বক্তব্যের বিবর্তনে সাহায্য করেছে। ইংল্যাণ্ডে কিছুদিন বসবাস করে তিনি স্বদেশে ১৭৩৪ সালে Considerations on the Greatness and Decline of Rome প্রকাশ করেন, কারণ তাঁর তত্ত্বনির্মাণের ক্ষেত্রে রোমের ইতিহাস ছিল এক সুবিধাজনক সূচনাস্থল। তবে বুদ্ধিমত্তা ও পরিহাসপ্রিয়তার নিরিখে Persian Letters ছিল অনেক বেশী উজ্জ্বল। মঁন্তেস্কুর মত ছিল নিজ সীমাবদ্ধতার সংশোধনকারী ক্ষমতার নিরিখে রোম, কার্থেজ, এথেন্স এবং ইতালীর নগর রাষ্ট্রগুলি ছিল নিতান্তই অক্ষম। সে তুলনায় ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি অনেক বেশী আত্মঅন্বেষণ এবং ত্রুটি সংশোধনে সমর্থ। এই উপলব্ধি থেকে ১৭৪৮ সালে মঁন্তেস্কু তাঁর Spirit of the Laws গ্রন্থ প্রকাশ করেন যা মঁন্তেস্কুর বুদ্ধিমত্তার শ্রেষ্ঠ দর্পন। এই গ্রন্থেই মঁন্তেস্কু প্রথম বলেন যে রাজনৈতিক গবেষণা বা পর্যালোচনার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিকোণের অনুসরণ বিশেষ প্রয়োজন। এই উদ্দেশে তিনি ধর্মতত্ত্ব, যুক্তিবাদ অথবা অংকশাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ না করে একেবারে স্বকীয় পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। সুতরাং মঁন্তেস্কু রাজনৈতিক তত্ত্ব সৃজনের জন্যে যতটা না প্রসিদ্ধ তারচেয়ে অনেক বেশী প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক এবং সামাজিক গবেষণার পদ্ধতি নির্মাণকারী রূপে। The Spirit of the Laws গ্রন্থটি ছিল উচ্চ প্রশংসিত এবং মঁন্তেস্কুর বক্তব্যের সার্থক দর্পন। এই গ্রন্থের সমুদয় বক্তব্য তিনি নিজে পরীক্ষা করেছেন এবং এর প্রয়োগযোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন। চেষ্টার ম্যাক্সের ন্যায় ভাষ্যকার তাই এই গ্রন্থকে উদ্ধৃতির যোগ্য বলে গণ্য করেছেন। তৎকালীন রাষ্ট্রনায়ক এবং শাসকদের কাছে গ্রন্থটি ছিল রাজনীতির ব্যবহারিক বাইবেলের সমতুল্য। কিন্তু মঁন্তেস্কু প্যারিসে বসে এই স্তুতিতে

বিভ্রান্ত হননি এবং জ্ঞানান্বেষণ থেকে বিচ্যুত হন নি। ১৭৫৫ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী তিনি ফ্রান্সের লা ব্রেদে নামে এক স্থানে দেহরক্ষা করেন।

৫৯.৩ মঁন্তেস্কুর চিন্তার রাজনৈতিক সামাজিক প্রেক্ষাপট

মঁন্তেস্কুর সময় ছিল রাজনৈতিক দর্শনের বিকাশের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। সপ্তদশ শতকে যে দৃষ্টিভঙ্গী ও ভাবধারার বীজ বপন করা হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে তা পূর্ণতা অর্জন করে। ইতিমধ্যেই ১৬৮৮ সালের গৌরবময় বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে সংসদীয় প্রাধান্য ব্রিটিশ রাজনীতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আবার ফ্রান্সে রাজতন্ত্র তার চরম ক্ষমতার ভোগের পথে সব বাধাকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিল। চর্তুদশ লুই-এর ৫৪ বছরের ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণাধীন প্রশাসনিক কাঠামো ছিল তদানীন্তন ইওরোপে চরম রাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। ফরাসী জনগণ ইংলিস চ্যানেলের অপর প্রান্তে ইংল্যাণ্ডের অধিবাসীদের তুলনায় ছিল অসুখী, কারণ তাদের রাজনৈতিক জীবন তাদের মধ্যে হতাশার জন্ম দিয়েছিল। চতুর্দশ লুই-এর হাতে কেন্দ্রীভূত চরম ক্ষমতা এক শ্বাসরোধকারী পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। তিনি সুকৌশলে অভিজাত বর্গের সংখ্যা বৃদ্ধি করে তাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি হ্রাস করেছিলেন। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের তুলনায় ফ্রান্সে ধর্মযাজক এবং অভিজাতবর্গের সুযোগসুবিধা ও বিশেষাধিকার ছিল বেশী, ধর্মীয় সহনশীলতা ছিল কম এবং মধ্যবিত্ত ছিল অধিক নিয়ন্ত্রিত। ক্রমবর্ধমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদাগত বৈষম্য ও পার্থক্য সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি করেছিল যা ইংল্যান্ডে ছিল অনুপস্থিত। এর ফলে করাসী রাষ্ট্রচিন্তার মধ্যে ক্রমবর্ধমান আবেগপ্রবণতা স্পষ্ট হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফরাসী রাষ্ট্রচিন্তা যথেষ্ট মধ্যপন্থী ছিল, তবে সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই ধারা ক্রমশ উগ্র হয়ে উঠে। ফরাসী স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বক্তব্যের পথিকৃৎ ছিলেন চার্লস লুই দ্য সেকণ্ডাত্ যাঁর বক্তব্যের বিজ্ঞানভিত্তিক চরিত্র ছিল বিশেষভাবে উজ্জ্বল। ফ্রান্সের বিদ্যমান হতাশাবোধের মধ্যেও তিনি চুক্তিবাদের বিরোধিতা করে সামাজিক আপেক্ষিকতার যুক্তি পেশ করেছিলেন। তিনিই প্রথম সরকারকে সমাজের বৃহত্তর প্রেক্ষাপট এবং বস্তুগত প্রেক্ষাপটে বিচার করেছিলেন। এর ফলে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে তুলনা করা সম্ভবপর হয়। এই সকল ঘটনা ও চিন্তাপ্রবাহ মঁন্তেস্কুকে স্বাধীনতা, সহনশীলতা ও ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণের ভক্ত করে তোলে। একথা বলা যেতে পারে যে মঁন্তেস্কুর উপর লকের উদারনৈতিক চিন্তার প্রভাব ছিল বিশেষ স্পষ্ট। তার রচিত তিনটি গ্রন্থ "The Persian Letters, Reflections on the Causes of the Greatness and the Decadence of the Romans" এবং The Spirit of the Laws তার মন এবং যুক্তিবোধের প্রতীক। এবার মঁন্তেস্কুর দর্শনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

৫৯.৪ মঁন্তেস্কুর রাজনৈতিক দর্শন

৫৯.৪.১ আইন সম্পর্কিত ধারণা

মঁন্তেস্কুর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ রচনা Spirit of the Laws এই নামের মধ্যে দিয়েই বুঝিয়েছেন যে তার

কাছে আইনের গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ আইনের স্বরূপ উপলব্ধি করার মধ্যেই সমগ্র সমাজের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। শিক্ষা, ফরাসী রাজতন্ত্রের ইতিহাস, অর্থনীতি, জলহাওয়া সহ ভৌগলিক বাস্তবতা, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে শুরু করে ব্রিটেনের সংসদীয় গণতন্ত্র এবং এ ধরনের অনেক বিষয়ের মধ্যে যোগসূত্র সংস্থাপনের উপাদানই হল আইনব্যবস্থা। এ বিষয়টি সম্যকভাবে উপলব্ধি করা আবশ্যক। একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে Spirit of the Laws গ্রন্থটি আধুনিক আইনবিদ্যার ক্ষেত্রে আকর গ্রন্থ স্বরূপ। সাধারণ এবং সর্বজনীন তাৎপর্যের নিরিখে বলা যায় যে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করে আইন বস্তুজগতকে একটি সমন্বয়পূর্ণ রূপ দিয়ে থাকে। বিশ্বের সকল বস্তু ও সকল প্রাণের নিজস্ব আইন রয়েছে। এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে দুটি বস্তু বা প্রাণের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করে আইন। মঁতেস্কুর মতে সম্পর্ক (Relation) এবং আইন (Law) এই শব্দ দুটি পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক, কারণ সমগ্র বিশ্বব্যবস্থায় যে সামঞ্জস্যতা বিদ্যমান তাকে উপলব্ধি করতে হলে আইনকে জানতে বা বুঝতে হয়। এই সামঞ্জস্যতা নিছক কোন দুর্ঘটনা নয়, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল বিষয়ের মধ্যে অচ্ছেদ্য যোগসূত্র রচনা করে আইন। এই ধারণা থেকেই মঁতেস্কু মানব সমাজে আইনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এক নিশ্চয়তাবোধে উপস্থিত হয়েছেন। দৃশ্যমান বস্তুজগত যেরূপ অনিবার্যভাবে আইনের অধীন অনুরূপভাবে ঐ জগতের অঙ্গ রূপে মানুষও আইনের দ্বারা অনুশাসিত। তবে মানুষ যেহেতু বুদ্ধিমান প্রাণী সেইহেতু সে ঈশ্বরদ্বারা সংস্থাপিত আইনে হস্তক্ষেপ করে সেগুলিকে মানুষের প্রতিষ্ঠানের উপযোগী করে তুলেছে। মানুষ মঁতেস্কুর মতে পাঁচটি উপাদানের সমন্বয় এবং বস্তুলিপ্সা, স্বার্থপরতা, মূঢ়তা এবং ভ্রান্তির শিকার। সুতরাং মানুষের সমাজে এবং জীবনে আইনের প্রয়োজনীয়তা আরো বেশী, কারণ এগুলি মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। আবেগ এবং অসহিষ্ণুতা থেকে মানুষ প্রায়ই ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। এই জন্য মানুষকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়া, নৈতিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ করাই আইনের লক্ষ্য এবং Spirit of the Laws এই উদ্দেশ্যেই রচিত। ধর্মীয় বিধি নিয়ম হল ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট আইন যা মানুষকে দায়বদ্ধ আচরণে প্রস্তুত করে। আর আইন প্রণয়নকারী পৌর ও রাজনৈতিক আইন প্রণয়ন করেন যা মানুষকে তার কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে দেয়।

৫৯.৪.২ প্রাকৃতিক সমাজ ও আইন

আলোচনাকে আরও সম্প্রসারিত করার জন্য মঁতেস্কু বলেন যে এই সব আইনের স্বরূপ উপলব্ধি করার জন্য সমাজ তৈরী হবার আগে মানুষ কেমন ছিল তা বিচার করতে হবে। ঐ পর্যায়ে প্রকৃতি দ্বারা গঠিত আইন বলবৎ ছিল। এই পর্যায়ে মানুষ ছিল ভীত এবং ম্রিয়মান এবং অক্ষমতাবোধে আচ্ছন্ন, আগ্রাসী মানসিকতাবর্জিত প্রাণী। মঁতেস্কু হবসের প্রাকৃতিক সমাজ সম্পর্কিত বক্তব্যকে স্বীকার করেন নি, কারণ হবস প্রাকৃতিক সমাজকে সকলের সঙ্গে সকলের যুদ্ধাবস্থা সম্পর্কিত এক পর্যায় বলেছিলেন। মঁতেস্কু বলেন সমাজব্যবস্থার উদ্ভবের মধ্যে দিয়েই যুদ্ধাবস্থার সৃষ্টি হয়, কারণ মানুষ বল প্রয়োগে সমর্থ হয়েছিল এই পর্বেই। সুতরাং প্রথম প্রাকৃতিক নিয়ম ছিল শান্তির বাণী। এর পরই প্রয়োজনীয় বলে মনে হয় বিকাশের আবশ্যিকতা—সামাজিক আদান প্রদানের

ক্ষেত্রকে প্রসারিত করবার প্রয়োজনীয়তা। স্ত্রীপুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণজনিত পরিস্থিতি থেকে সৃষ্টি হয় আইনের আবশ্যিকতা। সভ্যমানুষ এবং বন্য মানুষের মধ্যে পার্থক্য করার আবশ্যিকতা থেকেও উদ্ভূত হয় আইনের আবশ্যিকতা।

৫৯.৪.৩ সমাজ বিকাশ আইনের বিবর্তন

হবস এবং লক যাকে মানব প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক সমাজের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি রূপে গণ্য করেছেন তার বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়েই সামাজিক চুক্তি এবং সরকারের ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল। মঁতেস্কু কিন্তু এই পথ অনুসরণ করেন নি, কারণ রাজনৈতিক সমাজটিকেই তিনি স্বাভাবিক অর্থাৎ প্রাকৃতিক বলে মনে করেছেন। সমাজজীবনে প্রবেশ করেই মানুষ তার দুর্বলতার চেতনাবোধকে কাটিয়ে ওঠে, সাম্যভিত্তিক সামাজিক পরিবেশের অবসান ঘটে এবং যুদ্ধাবস্থার সূত্রপাত হয়। বিভিন্ন সামাজিক কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংঘাত শুরু হয়। ব্যক্তি সামাজিক সুবিধাগুলি করায়ত্ত করতে প্রয়াসী হয় এবং তার প্রভাবেই সামাজিক জীবন দ্বন্দ্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে ইতিবাচক আইনের উদ্ভব ঘটে —প্রথমে শান্তি স্থাপনের জন্য প্রথম প্রাকৃতিক আইন, জাতিসমূহের মধ্যে সম্পর্ক পরিচালনার জন্য দ্বিতীয় প্রাকৃতিক আইন অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক আইন, শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্পর্ক পরিচালনার জন্যে তৃতীয় প্রাকৃতিক আইন অর্থাৎ, রাজনৈতিক আইন এবং নাগরিকদের মধ্যে সম্পর্ক পরিচালনার জন্য চতুর্থ আইন অর্থাৎ পৌর আইন।

৫৯.৪.৪ সাংবিধানিক আইনের ধারণা

এই সকল আইন ব্যতীত আরও এক প্রকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইনের কথা মঁতেস্কু গুরুত্ব সহকারে বিচার করেছেন— যেগুলিকে তিনি পৌর সংবিধান রূপে চিহ্নিত করেছেন। মঁতেস্কুর এই ধারণার মূলে রয়েছে সাংবিধানিক আইন সম্পর্কিত সচেতনতা যা ছাড়া কোন রাষ্ট্রের কিরূপ সরকার প্রয়োজন তা নির্ধারণ করা যায় না বা সমাজের স্থিতিশীলতাও রক্ষিত হয় না। তাঁর মতছিল সদর্থক ইতিবাচক আইন সব সময়ই প্রাকৃতিক আইনের উপর নির্ভরশীল। তিনি কখনই সমজাতীয় আইনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেননি অথবা বিশেষ প্রকার রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য এক নির্দিষ্ট আইন কাঠামোকে অভিপ্রেত বলে মনে করেন নি। বরং বিভিন্ন সমাজব্যবস্থায় মানুষের পারিপার্শ্বিকের বিশেষতার জন্য এক সমাজের আইন ভিন্ন পরিস্থিতিতে অন্য সমাজে যে কার্যকরী হয়ে উঠতে পারে সে বিষয়ে আশা ব্যক্ত করেছেন। যথার্থ অর্থে আইনকে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠতে হলে তার বহুমুখী ও ভিন্ন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োগযোগ্যতাকে সুনিশ্চিত করতে হবে। একটি বাস্তবমুখী আইনী ব্যবস্থা গড়ে তোলবার ক্ষেত্রে সরকারের প্রকৃতি ও নীতি সেই সঙ্গে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় বাস্তবতার প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন বলে তিনি মনে করতেন, কারণ আইনের উপর এসবেরই প্রভাব পড়ে। এমনকি একটি দেশের জলহাওয়া, মৃত্তিকার প্রকৃতি, মানুষের পেশাগত বৈচিত্র্য মানুষের আচরণ প্রভৃতির সঙ্গেও আইনের সামঞ্জস্যতা রক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। তার 'Spirit of Laws' গ্রন্থের মূল তাত্ত্বিক ভিত্তিই তাই গড়ে উঠেছে মানুষের সার্বিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে আইন ব্যবস্থার সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়কে কেন্দ্র করে। এই তাত্ত্বিক ভিত্তিই তাঁর সঙ্গে Enlightenment-এর যুগের বৌদ্ধিক

সম্পর্ককে সুদৃঢ় করেছে। তবে তাঁর বিশ্বাসের তাত্ত্বিক ভিত্তি নীতিমানবাদী প্রকৃতির না হয়ে অভিজ্ঞতাবাদী প্রকৃতির হয়ে উঠেছে। কারণ মঁতেস্কুর আইন ব্যবস্থায় ভিত্তি নিহিত রয়েছে সামাজিক প্রতিষ্ঠানে, পরিবেশে, ইতিহাসে এবং মানুষের জীবনধারায়। সেই জন্যই বলা হয় তিনি আইন সম্পর্কে প্রকৃতি নির্ভর এক সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রচার করেছেন।

৫৯.৪.৫ সরকারের প্রকারভেদ

মঁতেস্কুর আইন তত্ত্ব এক শূন্যতার মধ্যে গড়ে ওঠেনি। কারণ এই তত্ত্ব সরকারের "প্রকৃতি" এবং "নীতির" দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সরকারের প্রকৃতি বলতে তিনি পৌর সমাজে কী ধরনের শাসন প্রকৃতি বিদ্যমান তা বুঝিয়েছেন। নীতি বলতে তিনি সমাজের গতিশীলতা দানকারী অন্তর্নিহিত শক্তিকে বুঝিয়েছেন। কিছু আইন এই "প্রকৃতি" ও "নীতি" উভয় ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে উপযোগী। মঁতেস্কু সরকারের তিনটি সম্ভাব্য রূপের কথা বলেছেন — প্রজাতান্ত্রিক (Republican), রাজতান্ত্রিক (Monarchical) এবং স্বৈরতান্ত্রিক (Despotic)। প্রজাতান্ত্রিক সরকারী ব্যবস্থায় সব মানুষ বা তাদের কিছু প্রতিনিধিরা শাসন করে। যদি সব মানুষ শাসন করে তবে তা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, যদি সবার তরফে কিছু মানুষ শাসন করে তবে তা অভিজাতকেন্দ্রিক প্রজাতন্ত্র। রাজতান্ত্রিক সরকারে একজন নির্ধারিত ও প্রতিষ্ঠিত আইনের দ্বারা শাসন করেন যেখানে একজন শাসকের অনুভূতি বা খেয়াল দ্বারাই সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হয় তখন জন্ম হয় স্বৈরতন্ত্রের। এই প্রকার প্রতিটি সরকারের মধ্যেই নিহিত থাকে কতকগুলি নীতি বা উদ্দেশ্য যা থেকে সরকারের শক্তি অর্জিত হয়। প্রজাতান্ত্রিক সরকারের ভিত্তি নিহিত রয়েছে পৌর অনুভূতি বা গণমানসিকতার মধ্যে। রাজতন্ত্রের ভিত্তি নিহিত রয়েছে সামরিক বা যোদ্ধা শ্রেণীর মর্যাদাবোধের মধ্যে। স্বৈরতন্ত্রের ভিত্তি নিহিত রয়েছে প্রজাবর্গের দাসত্বের মানসিকতা সম্পর্কিত ভীতির উপর।

৫৯.৪.৬ সরকারের প্রকারভেদের বাস্তব মূল্যায়ন

সরকারের শ্রেণীবিভাজন সম্পর্কিত মঁতেস্কুর তত্ত্বের মধ্যে কোন ধারাবাহিকভাবে অর্থবহ মাত্রা নেই। শাসকের সংখ্যার বিচারে রাজতন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্র সমগোত্রীয়, আবার সাংবিধানিকতার বিচারে প্রজাতন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্র সমানভাবে নৈরাজ্যমূলক হতে পারে। তাহলে দেখা যায় যে মঁতেস্কুর তত্ত্বের রূপরেখা যতটা না অভিজ্ঞতাবাদের আলোকে উদ্ভাসিত তার চেয়ে অনেকে বেশী ফ্রান্সের পক্ষে কোনটা হিতকর এই ভাবনার দ্বারা উদ্ভাসিত ছিল। তাঁর ভাবনার আদর্শ প্রজাতন্ত্র ছিল রোমের প্রজাতন্ত্র। আর স্বৈরতন্ত্র ছিল চতুর্দশ লুই এবং রিচলুর অধীনস্থ ফ্রান্সের সরকারী ব্যবস্থা, যেখানে সংসদ এবং অভিজাতবর্গকে তাদের প্রাপ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে এবং পীড়নমূলক কর্তৃত্ব কাঠামো গড়ে উঠেছিল। তার রাজতন্ত্র সম্পর্কিত ধারণা ফ্রান্সে যে রাজতন্ত্র তিনি দেখতে চেয়েছিলেন তার আকাংক্ষায় উদ্ভাসিত ছিল, যদিও পরে তিনি উপলব্ধি করেন যে এই অভিপ্রেত রাজতন্ত্র বর্তমান রয়েছে ইংল্যাণ্ডে। এ্যারিষ্টটলের সঙ্গে মঁতেস্কুর সরকারের শ্রেণীবিভাজনে পদ্ধতির মিল থাকলেও পরিবেশের প্রেক্ষাপটে তার কিছু পরিমার্জনা ঘটিয়েছিলেন মঁতেস্কু। এর মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে এর যে কোন একটি শ্রেষ্ঠ হতে পারে যদি তা পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। Spirit of Laws গ্রন্থের চতুর্থ এবং

সপ্তম অধ্যায়ে তিনি বিভিন্ন প্রকার আইন এবং বিভিন্ন প্রকার সরকারের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে আইনের মর্মার্থ এবং উদ্দেশ্য যদি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় তাহলে দেখা যাবে সামাজিক স্থিতিশীলতা সুনিশ্চিত হচ্ছে। যদি এর অন্যথা হয় তবে সরকার ত্রুটিপূর্ণ হবে এবং যেকোন সময়ে এর পতন ঘটতে পারে। সুতরাং আইন প্রণয়নকারীদের কাজই হল যে সরকারের উপযোগী আইন তৈরী করা। গণতন্ত্রের আইন নাগরিকদের সাম্য বিশেষত অর্থনৈতিক সাম্য সুনিশ্চিত করবে। অভিজাততন্ত্রের মূলকথা হল ধীর গতির পরিবর্তন, যা সমাজে স্থিতি নিয়ে আসে, এক্ষেত্রে যদি সাম্যকে অত্যধিক প্রসারিত করা হয় তবে তা অভিজাততন্ত্রকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে তুলবে। যখন অভিজাতবর্গকে সাধারণের স্বার্থে কর দিতে বাধ্য করা হয় তখন সাম্যের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। রাজতন্ত্রের আইন মর্যাদাবোধকে শ্রদ্ধা করে। একনায়কতন্ত্র শান্তি রক্ষার্থে এক সুবৃহৎ সামরিক কাঠামো গড়ে তোলে।

৫৯.৫ স্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারণা

স্বাধীনতা সম্পর্কে মঁতেস্কুর ধারণা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। তার মতে অস্বচ্ছ শব্দসমূহের একটি হল "স্বাধীনতা"। রাজতান্ত্রিক শাসনই হোক বা প্রজাতান্ত্রিক শাসনই হোক স্বাধীনতা শব্দটির প্রয়োগ উভয় প্রকার সরকারেই প্রত্যক্ষ করা যায়। আবার অস্ত্রধারণের অধিকারই হোক, বা লম্বা দাড়ি রাখার অধিকারই হোক যুগে যুগে মানুষ হাজারো ভিন্ন পথে স্বাধীনতা শব্দের প্রয়োগ করে। এমনকি স্বাধীনতার মাত্রার তারতম্যের নিরিখে উপজাতীয়, রাজতান্ত্রিক, অভিজাততান্ত্রিক এবং গণতান্ত্রিক ইত্যাদি নানা অভিধায় সরকারের শ্রেণীবিভাজনও করা হয়ে থাকে। মঁতেস্কু এ সমস্তকে স্বাধীনতা শব্দটির অপব্যবহার সামিল বলে মনে করেছেন। শব্দটির যুক্তিযুক্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে মঁতেস্কু দুটি মাত্রার কথা বলেছেন — (ক) চরম বা "The Absolute" এবং (খ) আপেক্ষিক বা "The Relative" চরম স্বাধীনতা বলতে অবশ্যই ব্যক্তির অসীম বা নিয়ন্ত্রণহীন স্বাধীনতাকে বোঝানো হয়েছে যা ব্যক্তির যেকোন আচরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাকে অপসারিত করে। অন্যদিকে আপেক্ষিক স্বাধীনতার অর্থ হল যুক্তিযুক্ত আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হয়নি এরূপ সকল বিষয়েই ব্যক্তিবর্গের সমান স্বাধীনতা ভোগ করবার সক্ষমতা। প্রথমটি কোনরূপ বাধ্যবাধকতা ছাড়াই ব্যক্তির চরম স্বাধীনতার কথা বলে; দ্বিতীয়টি কর্তব্য বা দায়বদ্ধতা বন্ধনে আবদ্ধ করে স্বাধীনতাকে একটি বৃহত্তর সামাজিক মাত্রা প্রদান করে। স্বাধীনতার এই বিকল্প দুটি রূপের মধ্যে থেকে মানুষকে তার যোগ্য রূপটি বেছে নিতে হবে।

মঁতেস্কু বলেন সত্যিকারের স্বাধীনতা ভোগের প্রেক্ষাপট তখনই তৈরী হয় যখন আইনের অনুমতি প্রদত্ত সীমার মধ্যে থেকে মানুষ তার দায়িত্ব পালন করে এবং অধিকারভোগ করে। আইন কর্তৃক স্বীকৃত নয় এমন আচরণ বা ভূমিকা কিন্তু স্বাধীনতা থেকে মানুষকে বঞ্চিত করবে বলে মন্তেস্কু সতর্ক করে দিয়েছেন। কারণ এমন পরিস্থিতিতে প্রত্যেক নাগরিকই যথেচ্ছাচারে লিপ্ত হবে, ফলে স্বাধীনতার ক্ষেত্র হয়ে পড়বে সঙ্কুচিত। স্বাধীনতার অর্থ নৈরাজ্য নয়। স্বাধীনতা আইনের অনুশাসনে বাস্তব হয়ে ওঠে। তবে আইনকে ন্যায়সংগত ও বৈধ হতে হবে এবং সুনিশ্চিত করতে হবে যে একজনের ভূমিকা যেন

অন্যের স্বাধীনতাকে সঙ্কুচিত না করে। এক মধ্যপন্থা অনুসরণকারী সরকারের পক্ষেই এই ভূমিকা পালন করা সম্ভব আর এরূপ সরকার বাস্তবে বিরল। স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট কীভাবে সুনিশ্চিত হবে তা নির্ণয় করতে গিয়ে মঁন্তেস্কুর তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ বিষয় ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি গড়ে উঠেছে।

৫৯.৬ মঁন্তেস্কু ও ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণের ধারণা

সম্ভবত "Power corrupts and absolute power corrupts absolutely."—এই বিখ্যাত উক্তিটি জনপ্রিয় হবার অনেক আগেই মঁন্তেস্কু ক্ষমতার নেতিবাচক দিককে উপলব্ধি করেছিলেন। তার উপলব্ধি ছিল প্রত্যেক মানুষ ক্ষমতা অর্জন করলে তার অপব্যবহারের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং কর্তৃত্বকে সম্প্রসারিত করে সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চায়। এক মধ্যপন্থা অনুসরণকারী সরকারকে এ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং ক্ষমতার সাহায্যেই অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতাকে প্রতিহত করতে হবে। সব ধরনের সরকারে তিন প্রকার ক্ষমতা থাকে—আইন প্রণয়ন সম্পর্কিত ক্ষমতা যার দ্বারা আইন প্রণীত হয়; শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা যার দ্বারা বহির্দেশীয় অর্থাৎ কূটনৈতিক ও সামরিক বিষয়াদি এবং অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি নীতি পরিচালিত হয় ও সুনিশ্চিত হয় গণনিরাপত্তা; সবশেষে থাকে আইন ব্যাখ্যা এবং অপরাধ বিচার ও শাস্তিদানের নিমিত্ত এক বিচার বিভাগ যা ব্যক্তি ও রাষ্ট্র এবং ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধকেও মীমাংসার জন্য অবস্থান করে। প্রতিটি ক্ষেত্রে বিভাগগুলির ক্ষমতা প্রয়োগ করবে ভিন্ন সংস্থা বা ব্যক্তি। যদি এর অন্যথা হয় তবে স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবে। যদি আইন প্রণয়ন সম্পর্কিত ক্ষমতা একই ব্যক্তি বা ম্যাজিস্ট্রেটদের সমবায়ে গঠিত একটি সংস্থার হাতে কেন্দ্রীভূত হয় তবে স্বাধীনতা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরী হয়, কারণ সেক্ষেত্রে স্বৈরী আইন প্রণীত হবে এবং তার স্বৈরী প্রয়োগ ঘটবে। আবার বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা যদি আইনবিভাগ এবং শাসনবিভাগ থেকে পৃথক করা না হয় তবে স্বাধীনতা বিপন্ন হবে। ফ্রান্সে এই তিন ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য না করার বিষময় ফল সম্পর্কে মঁন্তেস্কু আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, কারণ এর ফলে ফরাসী রাজতন্ত্র বল্গাহীন ক্ষমতা অর্জন করে। বিপরীতে ইংল্যাণ্ডে সংসদীয় প্রতিষ্ঠানের ক্রমবিবর্তনের ফলে সরকারের তিনটি ক্ষমতার বিভাজন এবং স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভবপর হয় এবং তিনটি বিভাগের স্বতন্ত্র বিকাশও বাস্তব হয়। এটিকে মঁন্তেস্কু ইংল্যাণ্ডের স্বাভাবিক প্রাজ্ঞতা বলে গণ্য করেন যা ইংল্যাণ্ডের শক্তি বৃদ্ধিরও সহায়ক।

৫৯.৬.১ ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণের নীতির মূল্যায়ন

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে মঁন্তেস্কু সরকারের তিনটি অংশের মধ্যে ক্ষমতার বিভাজন (Separation of Power) ব্যবস্থার যে রূপরেখা প্রস্তুত করেছিলেন তা ইংরেজ সরকারী ব্যবস্থার সম্পর্কে ভ্রান্ত ব্যাখার উপর নির্ভরশীল ছিল। ইংল্যাণ্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীতেও ক্যাবিনেটের দায়বদ্ধতার ধারণা সম্পূর্ণ বিকশিত হয়নি। মঁন্তেস্কু যখন ইংল্যাণ্ডে ছিলেন তখন মন্ত্রীরা রাজার অধস্তন হলেও অবগত ছিলেন যে পার্লামেন্টের আস্থার উপরই তাদের পদাধিকার আসলে

নির্ভরশীল। এর ফলে মঁতেস্কু বর্ণিত ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণের নীতি ইংল্যাণ্ডের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না, বরং একান্তভাবেই অর্থহীন ছিল। সরকারের অন্যান্য বিভাগের উপর আইনসভার প্রাধান্য সম্পর্কিত লকের তত্ত্ব বরং অনেক বাস্তবসম্মত ছিল এবং ১৬৮৯ সালের সংস্কারের পর ব্রিটেনের সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। তবুও ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণের তত্ত্ব সরকারের তত্ত্বগত পর্যালোচনায় সহায়ক ছিল। মঁতেস্কুর তত্ত্ব নূতন বিশ্বের সরকারী কাঠামো সম্পর্কিত চিন্তাকে বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান গড়ে ওঠার তাত্ত্বিক বাতাবরণ রচনা করেছিল।

৫৯.৭ দাস প্রথা ও ধর্মীয় পীড়ন সম্পর্কিত ধারণা

স্বাধীনতা সম্পর্কিত মঁতেস্কুর তত্ত্বের সঙ্গেই যুক্ত রয়েছে দাসপ্রথা ও ধর্মীয় পীড়ণ সম্পর্কিত তাঁর ভাবনা। তার রচনাসমূহের মধ্যে এ বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য সর্বাধিক মর্মস্পর্শী। তিনি পরিহাস ছলে বলেছেন ইউরোপের জাতিসমূহ আমেরিকার ভূমিপুত্রদের নির্মূল করেছে এবং আফ্রিকার মানুষদের ক্রীতদাস বানিয়েছে, কারণ এসব না করলে ঐ সকল বিশাল ভূখণ্ড অনাবাদী থেকে যাবে ও সেই সঙ্গে আখের চাষ না হওয়ায় ইওরোপীয়দের কাছে চিনি দুর্মূল্য হবে। আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি করুণা করাও সম্ভবপর নয় কেননা পা থেকে মাথা পর্যন্ত তারা কালো, তাদের তীক্ষ্ণ নাসিকা নেই। যারা ঈশ্বরকে সর্বজ্ঞানী বলে মনে করেন সেই খ্রিষ্টানরা কী করে ভাববেন যে ঈশ্বর এই কালো শরীরে একটি আত্মা এবং উত্তম আত্মা সঞ্চার করেছেন। একজন নীতিনিষ্ঠ খৃষ্ঠান কখনই এদের মানুষ বলে মনে করেন না, কারণ সে ঈশ্বর বিশ্বাসী। এছিল পরিহাস ছলে ক্রীতদাস (Slavery) প্রথা সম্পর্কে মঁতেস্কুর ক্ষোভ। তিনি এই প্রথাকে প্রকৃতি বিরুদ্ধ এবং মানবিকতাবোধের বিরোধী বলে গণ্য করেছেন, কারণ প্রাকৃতিক নিয়মে সব মানুষই জন্মসূত্রে সমান। সতরাং এই প্রথা স্বাধীনতার পরিপন্থী। তিনি এই সূত্রে অ্যারিষ্টটলের প্রাকৃতিক শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কিত যুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করেন। তবে আশ্চর্যের বিষয় দাসপ্রথার বিরুদ্ধে এতকিছু বলেও শেষে মঁতেস্কু বলেছেন যে দাস নিজে বলপ্রয়োগ ব্যাতীতই যদি এই প্রথাকে সমর্থন করে তবে তার অস্তিত্বকে স্বীকার করা যেতে পারে। এই বক্তব্যের ফলে দাসপ্রথা বিরোধী তাঁর বক্তব্যের আন্তরিকতা সম্পর্কে সন্দেহ থেকেই যায়।

ধর্মীয় ভেদাভেদ (Religious Discrimination) প্রসূত পীড়নকে তিনি আরও তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। পর্তুগালের ইহুদীদের তরফে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন যে খ্রীষ্টানরা ধর্মান্তকরণের নামে যে বর্বরতার পরিচয় দিয়েছে তা অষ্টাদশ শতাব্দীর বিভিন্ন প্রগতি সত্ত্বেও অত্যন্ত কলঙ্কজনক এবং ন্যায়বিচারের স্বাভাবিক আদর্শের বিরোধী। ধর্মের নামে অত্যাচার মানুষের মধ্যে ঘৃণা সঞ্চার করে, তৈরী করে অসাম্য এবং তা জীবনের অধিকারের আদর্শের পরিপন্থী। এর ফলে ঈশ্বর এবং সত্যের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে তার অধিকার সম্পর্কিত তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে।

মঁতেস্কু যে সময়ে তার মতবাদ ব্যক্ত করছিলেন তার পূর্বেই ইওরোপে অধিকার সম্পর্কিত দুটি জনপ্রিয় মতবাদ প্রচলিত ছিল। একটি ছিল অধিকার সম্পর্কিত বিমূর্ত ধারণা যার প্রচারক ছিলেন লক

এবং রুশো এবং অপর তত্ত্বটি ছিল সুবিধা বা উপযোগিতার আলোকে সৃষ্ট এবং স্পিনোজা ছিলেন এর স্রষ্টা যা পরে বেন্থামের ন্যায় উপযোগীবাদীদের কাছে অধিকার ও উপযোগের ভিত্তি হয়ে উঠেছিল। মঁন্তেস্কু অধিকার সম্পর্কিত এই দুটি মতবাদকেই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। প্রথম মতবাদটি সম্পর্কে তাঁর আপত্তির কারণ ছিল এই যে এটি মানুষের রাজনৈতিক পরিবেশের ভিন্নতাকে গ্রাহ্য করে না, মানুষকে এক বিমূর্ত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে, যার ফলে স্থান, কাল, পাত্র নির্বিশেষে মানুষের সত্তার অপরিবর্তনীয়তাকে গুরুত্ব দেয়। দ্বিতীয় মতবাদটি সম্পর্কে তাঁর আপত্তি হল আজকে মানুষের কাছে যা উপযোগী কাল তা উপযোগী নাও হতে পারে। সুতরাং এক পরিস্থিতি ও সময়ে যা উপযোগী তার মানদণ্ডে মঁন্তেস্কু অধিকার তত্ত্বকে বিচার করতে চান নি।

৫৯.৮ অধিকার তত্ত্বের মূল্যায়ন

মঁন্তেস্কুর অধিকার তত্ত্ব আপেক্ষিকতার তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল যেখানে যেকোন বিষয়বস্তুকেই তাঁর পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে সম্পর্কের নিরিখে বিচার করা হয়। নাগরিক এবং রাজনৈতিক অধিকার এই সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্যাপক অর্থে তাঁর অধিকারতত্ত্ব নৈতিক বিধির উপর নির্ভরশীল এবং ন্যায়বিচারের আদর্শের সঙ্গে সম্পর্কিত। সুতরাং তিনি যে অধিকারের কথা বলেছেন তা মানুষের নৈতিকতার বিকাশের উপর গুরুত্ব দেয় যা কিনা সংবিধানে স্পষ্ট রূপে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এবং একটি জাতীয় জীবনের গতিময়তার অংশ হতে পারে। তিনি কোন সর্বজনীন মূল্যবোধ যুক্ত চিরন্তন অধিকারের কথা বলেননি। সুতরাং মঁন্তেস্কুর এই অধিকারতত্ত্ব স্বাভাবিকভাবেই লকের অধিকারতত্ত্বের অনুগামীদের বিদ্রুপ উদ্রেক করে। রুশোর মতের সমর্থকরা আরও তীব্রভাবে মঁন্তেস্কুর সমালোচনা করেন। কার্যত একদিকে লক ও রুশোর অধিকারতত্ত্বকে অস্বীকার করে অন্যদিকে অধিকার সম্পর্কিত উপযোগবাদকে খন্ডন করে মঁন্তেস্কু তার অধিকারতত্ত্বকে এক সঙ্কীর্ণ পরিসরে আবদ্ধ করে ফেলেছিলেন। তিনি অবশ্য রাজনৈতিক অধিকারকে কিছু সুবিধার সমষ্টি আখ্যা দিয়ে একই সঙ্গে মানবাধিকার বা ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রশ্নে গ্রহণ করেছিলেন একটি স্বতন্ত্র অবস্থান। এই অধিকারগুলিকে মঁন্তেস্কু জীবনের অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার, বিবেকের স্বাতন্ত্রের অধিকার, বিশ্বাস অনুযায়ী ঈশ্বরকে উপাসনার অধিকার বলে গণ্য করেছেন। এই অধিকারগুলিকে তিনি আইনের উর্দ্ধে বলে গণ্য করেছেন। সুতরাং মানুষের রাজনৈতিক জীবনের সব কিছুকে আপেক্ষিক বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আইনের সঙ্গে রাজনৈতিক অধিকারকে সম্পর্কিত করেছেন। তাই কোন সামাজিক পরিবর্তনকে একমুখী না বলে তিনি বহুমুখী বলতে চেয়েছেন, আবার মানবিক অধিকারকে শাশ্বতও বলতে চেয়েছেন। সামাজিক জীবনে কোন একটি সম্পর্কের সঙ্গে অন্যবিধ সম্পর্কের সংঘাত সৃষ্টি হয় এবং তাকে যদি বাড়তে দেওয়া হয় তবে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরী হয়, যাকে নিয়ন্ত্রিত করা অবশ্যই প্রয়োজন। তিনি মনে করতেন বর্তমান হল অতীতের ফসল সুতরাং কোন একটি জাতির বর্তমান তার অতীতের পরিচায়ক, যাকে কখনও উপেক্ষা করা যায় না। বর্তমান বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই তাঁর অধিকারতত্ত্বকে মৌলিক অধিকারের তাত্ত্বিক বুনিয়াদ বলে মনে করা হয়।

৫৯.৯ রাষ্ট্রদর্শনের বিকাশে মন্তেস্কুর অবদান

মন্তেস্কুর রাজনৈতিক দর্শনের প্রধান প্রবণতাগুলি সম্পর্কে মন্তব্য করবার পর রাষ্ট্রদর্শনের বিবর্তনের পথে তার অবস্থান নিয়ে কিছু মন্তব্য প্রয়োজন। সত্যকথা বলতে কি কাজটি অসুবিধাজনক, কারণ মঁন্তেস্কুর বক্তব্য কতদূর মৌলিক সে বিষয়েই বিতর্ক রয়েছে। তবে প্রকৃতিগত ভাবেই তাঁর বর্ণনা করার ক্ষমতা এবং শৈলী তাঁকে তার পূর্বসূরীদের থেকে স্বতন্ত্র পরিচিতি দিয়েছে। উৎগানের ন্যায় বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে মঁন্তেস্কুই প্রথম রাষ্ট্রদর্শনের বিশ্লেষণে ঐতিহাসিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। তিনি ইতিহাস সচেতন মন, পর্যবেক্ষণ, সাধারণ সূত্র নির্ণয় প্রভৃতি পদ্ধতির সাহায্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বাস্তবতাকে অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন। ইতিহাস সচেতনতা ও বাস্তববাদী মনকে ভিত্তি করে তিনি সরকার কেমন হওয়া উচিত তার পরিবর্তে কেমন সরকার বাস্তবে প্রত্যক্ষ করা যায় তা বর্ণনা করেছেন। ফরাসী বিপ্লবের তাত্ত্বিক রূপকার হিসেবে যে চারজন রাষ্ট্রদার্শনিকের নাম করা হয় তাদের মধ্যে মঁন্তেস্কুর ভূমিকা কোন অংশে কম নয়। বরং বিপ্লবের পূর্ববর্তী অর্ধশতাব্দীকাল সময়ে যত রাজনৈতিক রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রুশো রচিত Contract Social গ্রন্থের সঙ্গে একমাত্র মঁন্তেস্কুর Spirit of the Law-এর তুলনা আনা যেতে পারে।

মঁন্তেস্কুকে অনেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর অ্যারিষ্টটল বলে গণ্য করেন, কারণ গ্রীক চিন্তাবিদের রক্ষণশীলতা মঁন্তেস্কুকেও স্পর্শ করেছিল। মঁন্তেস্কুও বিশ্বাস করতেন যে বংশানুক্রমে অভিজাতবর্গ বিশেষ ক্ষমতা ও সুযোগ সুবিধার বৈধ দাবীদার। জাতীয় জনজীবনের বৈচিত্রের মধ্যে চেতনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অতীত সম্পর্কে বিশেষ দুর্বলতা পোষণ করতেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এই যে ধর্মকে বাদ দিয়ে কোন সুস্থ জাতীয় অস্তিত্ব ও পরিচিতি গড়ে উঠতে পারে না। তবে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম সম্পর্কে বলেছেন যে মানুষ যা কিছুর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে তার মধ্যে ধর্মকে মানুষ সবচেয়ে বেশী নিজের সুবিধার্থে পরিবর্তিত করেছে। প্রথা এবং নৈতিকতা দ্বারা যা পরিবর্তন করা যায় তা আইন দ্বারা পরিবর্তিত হওয়া কাঙ্খিত নয় — মঁন্তেস্কুর এইরূপ বক্তব্য বা রেনেসাঁ পরবর্তী যুক্তিময়তার যুগের গতিময়তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তিনি কি অনুকূল আইন প্রণয়নের দ্বারা মৌলিক সমাজ পরিবর্তনের সম্ভাবনায় ভীত ছিলেন ? এই প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট উত্তর প্রদান করা কঠিন, কারণ তার চিন্তায় রক্ষণশীলতা ও সংস্কার পন্থার সমন্বয় ঘটেছে। একবার তিনি বলেন যে যখন সংবিধানের মূল ধারার বিপরীতে মৌলিক পরিবির্তন প্রয়োজন তখন বিপ্লব এক সাহায্যকারী কাঙ্খিত পদক্ষেপ। অন্যান্য কারণেও বিপ্লব অভিপ্রেত, তবে তার জন্য মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। একই সঙ্গে ইতিহাস, ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা এবং ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা ও সেই সঙ্গে বস্তুনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ ও সংস্কারমনস্কতা তাঁকে তার যুগের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব করে তুলেছিল।

৫৯.১০ উদারনীতিবাদের বিকাশে তাঁর অবদান

ন্যায়বিচার (Justice) মানবিকতাবোধ (Humanism) এবং সহনশীলতার স্বার্থে মঁন্তেস্কু স্বৈরতন্ত্র

ও সর্বাত্মক প্রবণতার বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর অন্তরের উদারনীতিবাদী এবং মানবতাবাদী বক্তব্য কখনই অবগুণ্ঠিত হয়নি এবং তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে এই প্রবণতা অচিরেই সমগ্র ইওরোপকে গ্রাস করবে। মঁন্তেস্কু রাষ্ট্রের কল্যাণকর ভূমিকারও পূর্বাভাষ দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর বিশেষ অবদান হল রাষ্ট্র দর্শনের ক্ষেত্রে আপেক্ষিকতা অর্থাৎ Relativity-র তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটানো। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বাস্তবতার সঙ্গে বাহ্যিক পরিস্থিতির যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রয়েছে এবং উভয়েই যে উভয়কে প্রভাবিত করে সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। আপেক্ষিকতার এই সূত্রের প্রয়োগেই তিনি সরকারী ব্যবস্থার বিবর্তনের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন। তাঁর মানবিক চেতনাই যাজকতন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাকে সোচ্চার করেছিল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের প্রতি তাঁর অবিচল শ্রদ্ধা তাকে উদীয়মান গণতন্ত্রপ্রেমীদের কাছে বরণীয় করে তুলেছিল। আবার ঐতিহ্য এবং আভিজাত্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণও তাঁকে ফ্রান্সের অভিজাতবর্গের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল। তিনি ছিলেন "Age of Enlightenment"-এর সার্থক প্রতিনিধি—আবার রক্ষণশীল আদর্শেরও প্রতীক। ফলে ভলতেয়ার এবং "এনসাক্লোপেডিস্ট'দের বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি বার্কের মত শ্রদ্ধেয় বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন পেয়েছেন। রাজনৈতিক প্রক্রিয়া যে শূন্যস্থানে গড়ে ওঠে না তা যে বৃহত্তর সামাজিক গতিশীলতারই এক বহিঃপ্রকাশ এই মত ব্যক্ত করে মঁন্তেস্কু ফ্রান্স তথা ইওরোপের দর্শনচিন্তার জগতে স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন।

৫৯.১১ সারাংশ

এই এককটি পাঠ করে আমরা মন্তেঁস্কু-এর চিন্তা, বিশেষ করে আইন সম্পর্কে তাঁর ভাবনা ও সাংবিধানিক আইন ও সরকারী কাঠামোর প্রকারভেদ, ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণের আবশ্যিকতা এবং মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও স্বৈরাচার প্রতিরোধে এর গুরুত্ব, দাসপ্রথা ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে তাঁর জোরালো বক্তব্য ইত্যাদি বিষয় এবং সর্বোপরি ইওরোপীয় গণতান্ত্রিক চেতনা বিকাশে তাঁর অবদান সম্পর্কে অবহিত হলাম।

৫৯.১২ অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

(১) মঁন্তেস্কু-এর সমসাময়িক রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট কীভাবে তাঁর চিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল?

(২) আইন এবং আইনের বিকাশ সম্পর্কে মন্তেস্কু-এর মত কি ?

(৩) মঁন্তেস্কু সরকারের শ্রেণীবিভাজন কীভাবে করেছেন?

(৪) মঁন্তেস্কু-এর ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ সম্পর্কিত নীতির বিশ্লেষণ করুন।

(৫) অধিকার সম্পর্কে মঁন্তেস্কু-এর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) মঁতেস্কু ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার প্রতি আকর্ষণ বোধ করতেন কেন ?

(২) মঁতেস্কু রচিত "Spirit of the Laws" গ্রন্থটি সমধিক প্রসিদ্ধ কেন ?

(৩) মঁতেস্কুকে কি "Enlightenment"-এর যুগের প্রতিনিধি বলা উচিত ?

(৪) মঁতেস্কু কোন ধরণের সরকারকে "শ্রেষ্ঠ সরকার" বলেছেন ?

(৫) মঁতেস্কু "স্বাধীনতাকে" কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ?

(৬) "অধিকারের" প্রশ্নে মঁতেস্কু-এর সঙ্গে লক ও রুশোর পার্থক্য কোথায় ?

৫৯.১৩ গ্রন্থপঞ্জী

১। Sabine G.H. & Thorson T.L. — *A History of Pol. Theory, New Delhi, Oxford 1BH Publishing Co. (1973).*

২। Waulass Lawrence — *Gettell's History of Pol.Thought, New Delhi, Surjeet Publications.*

৩। Dunning W.A. — *A History of Political Theories, (1966), Allahabád Central Book Depot.*

৪। Mukhopadhyay Amal Kumar — *Western Political Thought, Plato to Marx, Calcutta, N. P. Bagchi (1980).*

৫। Singh Sukhbir — *A History of Political Thought, Vol. (1973), Meerut, (Rastogi & Company.) (1973).*

৬। দেবাশিস চক্রবর্তী — *রাষ্ট্রচিন্তার ধারা, ম্যাকিয়াওলি থেকে রুশো। কলকাতা সেন্ট্রাল বুক পাবলিশার্স, (১৯৯০)।*

একক ৬০ □ জাঁ জাঁক রুশো - (১৭১২-১৭৭৮)

গঠন

৬০.০ উদ্দেশ্য

৬০.১ প্রস্তাবনা

৬০.২ রুশো—প্রারম্ভিক মন্তব্য

৬০.২.১ রুশোর বৌদ্ধিক অবস্থান

৬০.২.২ সংক্ষিপ্ত জীবনী

৬০.৩ **Enlightenment** এবং রুশো

৬০.৪ রুশোর রাজনৈতিক দর্শন

৬০.৪.১ মানব প্রকৃতি সম্পর্কে রুশোর রাজনৈতিক দর্শন

৬০.৪.২ মানব প্রকৃতি ও যুক্তিবোধ

৬০.৪.৩ প্রাক-সামাজিক জীবনের চিত্রায়ন

৬০.৫ ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্কে রুশোর ধারণা

৬০.৫.১ পৌর সমাজের চিত্রায়ন

৬০.৬ সাধারণের ইচ্ছা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা

৬০.৬.১ স্বাধীনতা ও কর্তৃত্বের সমন্বয়

৬০.৬.২ ধ্রুপদীচেতনা ও আধুনিক স্বতস্ফূর্ততার মিশ্রণ

৬০.৬.৩ সাধারণের ইচ্ছা ও স্বাধীনতার সমন্বয়

৬০.৬.৪ জনপ্রিয় সার্বভৌমিকতার ধারণা

৬০.৬.৫ সহনশীলতার আদর্শ

৬০.৬.৬ উদারনীতিবাদ সম্পর্কে অবস্থান

৬০.৬.৭ আইন প্রণয়নকারীর ভূমিকা

৬০.৭ রুশো ও গণতন্ত্র

৬০.৮ রুশোর মূল্যায়ন

৬০.৯ সারাংশ

৬০.১০ অনুশীলনী

৬০.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৬০.০ উদ্দেশ্য

এই এককটিতে ফরাসী বৌদ্ধিক মনীষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব রুশোর জীবন এবং চিন্তাকে নিয়ে তৈরী হয়েছে। আধুনিক যুগ, তার সমাজ ও মানব প্রকৃতিকে আর কেউ এইভাবে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয়েছেন কিনা সে বিষয়ে বিতর্ক চলতেই পারে। জাঁ জাঁক রুশোর ঘটনাময় জীবন, তাঁর সমসাময়িক সময়, ঘটনাপঞ্জীর উত্থান পতন এ সবই রুশোকে স্বাতন্ত্রতা দিয়েছে। এই এককটি পাঠ করে আমরা জানতে পারব —

- রুশোর জীবন ও রচনাসমূহের কথা।
- মানব প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর মত।
- প্রাক সামাজিক এবং পৌর সমাজে মানুষের জীবন ধারার তারতম্যের চিত্রায়ন।
- সাধারণের ইচ্ছা, স্বাধীনতা ও কর্তৃত্ব সম্পর্কে তাঁর অবস্থান।
- উদারনীতিবাদ সম্পর্কে তাঁর অবস্থান।
- তাঁর গণতন্ত্র চেতনার কথা।
- এবং তাঁর সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন।

৬০.১ প্রস্তাবনা

রাজনৈতিক দর্শনের বিবর্তনের পথে যে ব্যক্তিত্ব তার ব্যতিক্রমী বিতর্কিত এবং বৈপ্লবিক বক্তব্যের দ্বারা একই সঙ্গে প্রসিদ্ধি এবং সমালোচনা অর্জন করেছেন তিনি হলেন জাঁ জাঁক রুশো। শুধুমাত্র "সাধারণের ইচ্ছার" ধারণাকে রুশো যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন সেটিকে অনুসরণ করেই পরবর্তী পর্যায়ে গণ সার্বভৌমিকতা ও "সর্বাত্মক গণতন্ত্রের" মত ধারণার উদ্ভব ঘটেছে। রুশোর দর্শনচিন্তা কোন একগামী প্রবাহে প্রবাহিত হয়নি। কারণ তাঁর সমগ্র জীবনপথে চিন্তার ক্রমাগত বিবর্তন ঘটেছে। এমনকি তিনি ক্রমান্বয়ে দীর্ঘদিন একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বসবাসও করেন নি। বিভিন্ন বিয়োগান্ত ঘটনার অভিঘাতে জীবনের বিভিন্ন মূহুর্তে তিনি সভ্য মানুষের অন্তসারশূন্য মূল্যবোধ এবং স্বার্থপরতার পরিচয় পেয়েছেন। বাস্তবের সঙ্গে তাঁর এই অভিঘাত (Encounter) তাঁকে ঋজু, দীপ্ত এবং স্পষ্টবাদী করে তুলেছিল। ফলে তিনি এমন অনেক কথা বলেছেন যা যুক্তিবাদী মানুষের কাছে বিতর্কিত এবং "সভ্য" মানুষের ক্রোধের কারণ। এককটিতে এই বিতর্কিত দার্শনিকের জীবন ও ভাবনা আলোচনা করা হল।

৬০.২ রুশো — প্রারম্ভিক মন্তব্য

ফরাসী বৌদ্ধিক সৃজনশীলতার অবিনশ্বর রূপ সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে সগর্বে উপস্থাপিত করার কৃতিত্ব যিনি দাবী করতে পারেন, জনগণের চরম বৈধ ভূখণ্ডগত কর্তৃত্বকে যিনি শাশ্বত বলে গণ্য

করেছেন, সরকারকে যিনি জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তরের ফসল বলে গণ্য করেছেন, যিনি সম্মতিকে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার ভিত্তি বলে চিহ্নিত করেছেন, রাষ্ট্র ও ব্যক্তি, আইন ও স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা ও কর্তৃত্বের মধ্যে সংঘাতের পরিবর্তে যিনি সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছেন, তিনি হলেন তথাকথিত Enlightenment পর্বের প্রথম সোচ্চার বিরোধী, চির ব্যতিক্রমী জাঁ জাঁক রুশো। তিনি তাঁর চিন্তাধারার বিকাশের প্রতিটি পর্বে বিতর্ক তৈরী করেছেন, ব্যাখ্যাকাররা তাঁর বক্তব্যের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা খুঁজে পেয়েছেন। রুশোর মধ্যে যে কি রূপ পরস্পর বিরোধিতা রয়েছে তা উপলব্ধি করা যায় রুশো সম্পর্কে তার ব্যাখ্যাকারদের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে। চ্যাপম্যান, ডেরাথে প্রমুখ লেখকগণ রুশোর মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের প্রভাব যেমন দেখেছেন, তেমনই ভ্যগান প্রমুখ রুশোর মধ্যে সমষ্টিবাদের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। আবার ক্যাসিরার প্রমুখ তার মধ্যে যখন নিরলস গণতন্ত্রী মানসিকতা দেখেছেন তখন কোবান, ট্যালমন, টেলর প্রমুখ তার মধ্যে আধুনিক সর্বাত্মক মানসিকতার প্রতিফলন দেখেছেন। আবার ক্রকার এবং লিন্ডসের ন্যায় গবেষক রুশোকে "নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের" প্রবক্তারূপে দেখেছেন এবং কার্ল পপার রুশোকে রোমানন্টিক ও সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী বলে চিহ্নিত করেছেন। মোটকথা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রবক্তা থেকে স্থিতাবস্থাপন্থী সব ধরনের বিশেষণেই, রুশোকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৬০.২.১ রুশোর বৌদ্ধিক অবস্থান

তবে যে মূল্যমানেই রুশোকে বিচার করা হোক না কেন তিনি মানবিক সমাজে সাম্যের জন্য যে আবেদন করেছেন তার মূল্যকে কখনও অস্বীকার করা যায় না। আশ্চর্যের বিষয় Enlightenment -এর যুগের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল এই ব্যক্তিত্ব তাঁর সমসাময়িক উজ্জ্বল অন্যান্য ব্যক্তিত্বের থেকে কত পৃথক। করে। তাঁর রচিত Discourses on Origins of Inequality (১৭৫৫) তে তিনি বলেছেন যে সেই সময়কার ফ্রান্সে সভ্য মূল্যমান অনুপস্থিত ছিল। কমান তাই তাঁর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ রচনা Social Contract (১৭৬২) তে তিনি এক সুন্দর মানবিক সমাজের কথা বর্ণনা করেছেন যেখানে সমাজজীবনের চালিকাশক্তি রয়েছে সাধারণের ইচ্ছার কাছে। প্রথমোক্ত গ্রন্থে বর্ণিত সমাজ যদি হয় পচনশীল, দ্বিতীয় গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে সেই পচনশীলতা থেকে মুক্তির পথ। তাঁর চিন্তার প্রধান বিষয় ছিল মানুষ একই সঙ্গে সভ্যতা ও স্বাধীনতার সুফলভোগ করতে পারবে কিনা তার পথ অনুসন্ধান করা। তিনি আজীবন ব্যাপৃত ছিলেন সামাজিক জীবন এবং নৈতিক জীবনের মধ্যে সমন্বয়ের পথ অনুসন্ধানে। আধুনিক যুগে সামাজিক অনুশাসনের অধীন হয়েও যে মূল স্বাধীনতা ভোগ করা সম্ভব রুশো সে বিষয়ে আমাদের পথনির্দেশ করেছেন। এই বক্তব্যের অনুসঙ্গ হিসেবে তিনি "সাধারণের ইচ্ছার" ধারণা তৈরী করেছেন— যেখানে বৈধ কর্তৃত্বের অধীন হয়েও মানুষ স্বাধীনতা ভোগে সমর্থ। তিনি প্রজ্ঞা, স্বাধীনতা এবং সাম্যের মিলিত উপস্থিতিতে সহমতভিত্তিক, প্রতিনিধিত্বমূলক এবং গণতান্ত্রিক সমাজজীবনের রূপরেখা অঙ্কন করেছেন। রুশোকে বুঝতে হলে তাঁর Social Contract এবং Discourses on Origins of Inequality এক সঙ্গে পড়া উচিত। তিনি ১৭৪৪ সালের বৃহৎ পরিধিতে Political Institutions রচনা

শুরু করেছিলেন, যার একটি অংশ ছিল Social Contract কিন্তু মাঝপথে এই পরিকল্পনা ত্যাগ করে "Emile" রচনা শুরু করেন এবং ১৭৬২ সালে তা সমর্পণ করেন। রুশো সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা প্রভৃতিকে ভিত্তি করে Project of a Constitution for Corsica (১৭৬৪) রচনা করেছিলেন, রচনা করেছিলেন Considerations on the Government of Poland (১৭৮২) নামক গ্রন্থ। এসবের অনেক আগেই রুশো ১৭৫০ সালে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় Discourses on the Science and Arts নামক একটি প্রবন্ধ লেখেন এবং বলেন যে বিজ্ঞান এবং কলাবিদ্যার বিকাশের সঙ্গে আনুপাতিক হারে মানুষের আত্মা ও প্রকৃতি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। এসব ক্ষেত্রে তিনি ম্যাকিয়েভেলী এবং মঁন্তেস্কুর যুক্তিকে ব্যবহার করে বিলাস, স্বাচ্ছন্দ্য, প্রগতি এবং নৈতিক স্খলন এবং স্বাধীনতা হারানোর পারস্পরিক সম্পর্ক চিহ্নিত করেছেন। রুশো যে তীব্রভাবে বিলাসিতা, কৃত্রিমতা, তথাকথিত আধুনিকতাকে আক্রমণ করে সারল্য, স্বাভাবিক আচরণ ইত্যাদির স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেন তা রুশোর সমসাময়িকদের মধ্যে ক্রোধের সঞ্চার করেছিল। আধুনিকতার বিরুদ্ধে প্রথম সোচ্চার কণ্ঠস্বর রুশোর, কারণ তাঁর মত এভাবে আগে আর কেউ বলেন নি যে শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের উৎস নিহিত রয়েছে মানুষের পাপাচার ও ভ্রষ্টাচারের মধ্যে। শিল্পকলা, বিজ্ঞান প্রভৃতির অন্তরালে মানুষ তাঁর লালসা ও অবক্ষয়কে লুকোতে চায়। Enlightenment যুক্তির সারবত্তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তিনি বলেছেন যে তথাকথিত বস্তুগত প্রগতি আমাদের বস্তুর উপর নির্ভরশীলতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে, বৃদ্ধি পেয়েছে আমাদের যান্ত্রিকতা ও কৃত্রিমতা যা আমাদের স্বাভাবিক স্বাধীনতাকে হরণ করেছে। এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে রুশোর বিখ্যাত উক্তি—"মানুষ জন্মায় স্বাধীনভাবে কিন্তু জীবনের প্রতিক্ষেত্রেই সে শৃংখলিত-র "(Man is born free but everywhere he is chains.) প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। মানুষের লোভ বা চাহিদা যত কম হবে ততই বেশী হবে তার স্বাধীনতার ব্যাপ্তি। রুশো সারল্য নিষ্পাপ প্রকৃতি, দারিদ্র এবং সততাকে সমর্থন করেছেন—বিরোধিতা করেছেন তথাকথিত পরিশ্রুত চেতনার, চাতুর্যের, সম্পদের এবং ক্ষয়িষ্ণুতার। প্রকৃত অর্থে রুশোর এই বক্তব্যের মধ্যে গান্ধী কর্তৃক পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য সভ্যতার নিন্দার পূর্বাভাষ লক্ষ্য করা যায়। কারণ গান্ধীও যন্ত্রনির্ভর পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মানবিকতা বিরোধী প্রকৃতিকে Evil বা দুষ্টতার বহিঃপ্রকাশ বলে গণ্য করেছেন।

৬০.২.২ সংক্ষিপ্ত জীবনী

১৭১২ সালের ২৮ শে জুন জেনিভাতে জন্ম নেওয়া এই ফরাসী ব্যক্তিত্বের মনীষা নানাবিধ ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়। রুশোর প্রজ্ঞা ও খ্যাতি মূলত তাঁর লেখাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। জন্মের একমাসের মধ্যে মাকে হারিয়ে তিনি স্বাভাবিক পারিবারিক সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হন। পিতামাতা প্রটেষ্টান্ট মতাবলম্বী হলেও তিনি অভিজাত বংশীয়া মাদাম দ্য ওয়ারেন্স-এর প্রভাবে ক্যাথলিক মতে দীক্ষিত হন। পরে তিনি এই মহিলার প্রেমে পড়েন। মূলত ভবঘুরের জীবন যাপন করেন রুশো এবং Confession (১৭৮২-১৭৮৯) গ্রন্থে তার জীবন কাহিনী বর্ণনা করে গেছেন। ত্রিশ বছর বয়সে তিনি দিদেরোর সঙ্গে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং ফরাসী অভিজাত বর্গের সংস্পর্শে এসে এদের জীবনদর্শন এবং জীবনধারার

অন্তঃসারশূন্যতা সম্পর্কে অবহিত হন। তথাকথিত অভিজাতবর্গের মেকী মূল্যবোধ তাঁকে আধুনিক সভ্যতা সম্পর্কে সংশয়াচ্ছন্ন করে তোলে। এই পরিপ্রেক্ষিতে রুশো তাঁর দর্শন সৃষ্টি করেন।

৬০.৩ Enlightenment এবং রুশো

পাশ্চাত্ত্য দর্শন লিপিবদ্ধকারী রূপে পরিচিত হ্যালোওয়েল Enlightenment সম্পর্কে কান্টের বক্তব্যকে উদ্ধৃত করেছেন। কান্টের মতে Enlightenment হল স্বআরোপিত বন্ধন বা প্রতিবন্ধকতা থেকে মানুষের মুক্তি। প্রতিবন্ধকতা তৈরী হয় যখন মানুষ নিজে তার বিবেচনা শক্তি ব্যবহার করতে পারে না এবং এক্ষেত্রে সে অন্যের বিবেচনা শক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এ জাতীয় আত্মবিশ্বাসী মানসিকতার অভাব থেকে জন্ম হয় সাহসিকতার অভাব যাকে কাটিয়ে উঠে এগিয়ে যাবার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানবমুক্তির পথ। নিজের অনুভূতি ও বিচার ক্ষমতা প্রয়োগে সমর্থ হওয়াই অর্থাৎ সদর্থক চিন্তাশক্তির অধিকারী হবার অর্থই সত্যকে অর্জন করা — এ হল Enlightenment-এর মর্মার্থ। এই Enlightenment-এর যুগকে Age of Reason বা যুক্তির যুগও বলা হয়। এই সময় দার্শনিকেরা বিশেষ কোন দার্শনিক প্রবণতা সৃষ্টি না করে কতকগুলি মৌলিক বিষয়কে মেনে নিতেন এবং প্রগতি, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বহুল প্রয়োগ এবং ব্যবহারিক জীবনে যুক্তিসত্তার প্রয়োগ প্রভৃতি বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দিতেন। রুশো স্বয়ং এই Enlightenment-এর প্রবণতা দ্বারা সৃষ্ট এক দার্শনিক প্রতিভা তবে এই প্রবণতা দ্বারা সৃষ্ট হয়েও এর প্রধান প্রকাশভঙ্গীও তথাকথিত বিজ্ঞানমনস্কতা বা যুক্তির তীব্র সমালোচনা করেছেন রুশো। প্রতিবাদ করেছেন তথাকথিত বুদ্ধি, বিজ্ঞান এবং যুক্তির, কারণ তা মানুষের নৈতিক সত্তা ও চেতনার মূল্যকে খর্ব করে। যুক্তিবাদের এই সোচ্চার প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব মনে করতেন যে তথাকথিত যুক্তিবাদী প্রাণী স্বাভাবিকত্বহীন এক প্রাণীমাত্র এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকেই তার সমসাময়িক গ্রোটিয়াস প্রভৃতিদের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন রুশো। ক্ষমতার প্রগতিশীল প্রকৃতি এবং যুক্তিবাদের স্বচ্ছতাকে রুশো গ্রহণযোগ্য বলে মনে করতেন না। যুক্তিবাদ মানুষকে অজ্ঞতা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে কিন্তু মানুষের সারল্য নষ্ট করে মানুষকে সন্দেহপ্রবণ করে তোলে যাতে মানুষের স্বতস্ফূর্ততা ধ্বংস হয়। এমনকি ঐ তথাকথিত যুক্তিবোধ মানুষকে স্বদেশপ্রেমের অনুভূতি থেকে চ্যুত করে। ধ্বংস করে মমত্ববোধ এবং ভালবাসার ন্যায় মহৎ গুণাবলীকে। তাঁর দৃঢ় অভিমত এই যে, সভ্যতার অগ্রগতির পথ মানুষের চরিত্রকে কলুষিত করার পথ। এডওয়ার্ড গিবনের ন্যায় তিনিও বিশ্বাস করতেন যে ইওরোপের তথাকথিত বৃহৎ সাম্রাজ্যকেন্দ্রিক সমাজগুলি বর্বর জনজাতি কর্তৃক বিজিত হওয়ার মূলে রয়েছে এই যুক্তিবাদের উন্মেষ এবং যার ফলে তথাকথিত সভ্যতার অপমৃত্যু। দ্বিতীয়ত, রুশো দারিদ্র ও সম্পদের সঙ্গে নৈতিকতাবোধের যোগসূত্র রচনা করে তাঁর Essays On Wealth গ্রন্থে নৈতিকতার আলোকে সমাজ ও সভ্যতার বিকাশধারা বিচার করে আধুনিক সমাজকে কৃত্রিম ও ভ্রষ্টাচারপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন, যা মানুষের সত্যিকারের স্বাভাবিক সংস্কৃতিকে ধ্বংস করেছে। রুশো এই স্বাভাবিকত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা চেয়েছেন।

৬০.৪ রুশোর রাজনৈতিক দর্শন

৬০.৪.১ মানব প্রকৃতি সম্পর্কে রুশোর রাজনৈতিক দর্শন

রুশোর রাজনৈতিক দর্শনের মূলে রয়েছে মানুষের মৌলিক সম্পকর্কে চিহ্নিত করবার প্রয়াস এবং রুশোর মতে প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের যে সম্পর্ক কেবলমাত্র সেটিই হল মৌলিক সম্পর্ক। যদিও আদতে মানুষ প্রাক-রাজনৈতিক ও প্রাক-সামাজিক প্রাকৃতিক সমাজে বাস করত বলেই রুশো বিশ্বাস করতেন তবুও যেহেতু মানুষের ঐ সমাজে আবার ফিরে যাওয়া সম্ভবপর নয় সেইহেতু মানুষকে সভ্য সমাজ অর্থাৎ পৌর সমাজ গঠন করতে হয়েছে। রুশো লক্ষ্য করেছেন সভ্য সমাজ মানুষকে অনেক কিছু দিলেও কেড়ে নিয়েছে মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি। এই জন্য নাগরিক জীবনের আবশ্যিকতাকে মেনে নিয়েও রুশো এই সমাজের আদর্শ রূপটির অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। প্রাকৃতিক সমাজে মানুষ তার সহজাত প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হত; যুক্তিবোধ বা বিচার শক্তি দ্বারা পরিচালিত হওয়ার আবশ্যিকতা ছিল না। পশুর সঙ্গে তার তফাৎ এখানেই যে মানুষের নিখুঁতত্ব অর্জনের এক স্বতপ্রণোদিত ইচ্ছা বর্তমান। স্বাভাবিক মানুষের মৌল স্বার্থ বিষয়ে রুশোর বক্তব্য হবসের বক্তব্যের অনুরূপ, কারণ উভয়েই মনে করতেন যে মানুষের মূল প্রবৃত্তি হল আত্মসংরক্ষণ। তবে প্রাকৃতিক সমাজের যে চরিত্র রুশো বর্ণনা করেছেন তার সঙ্গে হবসের বক্তব্যের কোন মিল নেই। হবসের প্রাকৃতিক সমাজ ছিল ভীতিজনক, সেখানে রুশোর প্রাকৃতিক সমাজ ছিল এমন এক অবস্থা যেখানে মানুষের যা কিছু সর্বোত্তম তাকে অর্জনের সুযোগ থাকে। গণস্বার্থেই মানুষের কখনও এই পূর্ণতার পথ থেকে সরে আসা উচিত নয়। এই প্রাকৃতিক সমাজে, অর্থাৎ "মহান আদিমতার" সময়ে মানুষ সাম্য ভোগ করত। তবে কিছু অসাম্যের উপস্থিতির কথাও রুশো বলে গেছেন। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ জাতীয় বৈষম্য স্বাধীনতা বা স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে বাধা সৃষ্টি করে নি, যার ফলে এই সমাজে স্বাধীন, স্বাস্থ্যকর, সৎ এবং সুখী জীবনযাপন সম্ভবপর ছিল। কিন্তু মানুষ যখন কৃষিকার্য এবং ধাতুর ব্যবহার শিখল তখন সমাজের এই স্বতস্ফূর্ত অবস্থা বাধাপ্রাপ্ত হয়, সৃষ্টি হয় শ্রমবিভাজন এবং বিশেষিকরণের যার ফলে উদ্ভূত হয় ব্যক্তি সম্পত্তির।

৬০.৪.২ মানবপ্রকৃতি ও যুক্তিবোধ

রুশো মানুষের তথাকথিত যুক্তিচেতনাকে তাঁর সহজাত গুণ বলে অভিহিত করেন নি। যতক্ষণ না ঐ যুক্তিবোধকে প্রয়োগ করবার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয় ততক্ষণ এই প্রকৃতি অর্থাৎ যুক্তিচেতনা সুপ্ত অবস্থায় ছিল। কারণ যুক্তির প্রয়োগ ছাড়াই স্বাভাবিক মানুষ তার প্রয়োজন পূরণ করতে পারত। রুশোর যুক্তি সুখী মানুষ চিন্তাশীল নয়। যখন স্বাভাবিক পথে পূর্ণতা অর্জনে বাধা সৃষ্টি হয় তখনই মানুষ যুক্তিবুদ্ধি প্রয়োগে তৎপর হয়। অন্যথায় যুক্তির প্রাসঙ্গিকতা অস্পষ্ট। এক জন স্বাভাবিক মানুষের দৈহিক ও বস্তুগত চাহিদা অত্যন্ত কম কিন্তু যে মূহুর্তে তার মধ্যে যুক্তিবোধের উন্মেষ ঘটে সেই মূহুর্তে চাহিদার মাত্রা প্রসারিত হয় এবং মানুষ সততই তার চাহিদা নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করে। যুক্তিবাদী মানুষের চাহিদা অসীম। যেহেতু যুক্তিবাদী মানুষের সুখ তার চাহিদার পরিতৃপ্তির

উপর নির্ভর করে তাই এরূপ মানুষের পার্থিব জীবন হয়ে উঠে দুঃসহ যন্ত্রণাময়, কারণ কৃত্রিম যুক্তি চেতনা ভ্রান্ত চাহিদা তৈরী করে যার পেছনে দৌড়ে মানুষ তার জীবনকে যন্ত্রনাময় করে তোলে। সৃষ্টি হয় অসংখ্য সমস্যা যার বেশীর ভাগই স্বাভাবিক মানুষ ভোগ করেনি। স্বাভাবিক মানুষ এরূপ কৃত্রিম সমাজে সারল্য, ভারসাম্য এবং সমতা হারিয়ে ফেলে।

৬০.৪.৩ প্রাক-সামাজিক জীবনের চিত্রায়ন

রুশোর রাজনৈতিক দর্শনে অসাম্যের (Inequality) আলোচনা যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। তার দৃর বিশ্বাস ছিল এই যে প্রাকৃতিক সমাজে মানুষের স্বাভাবিক নীতিবোধ মানুষের নৈতিকতা ও সাম্যচেতনাকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তিনি মনে করতেন স্বাভাবিক মানুষ অন্যায় করত না, শুদ্ধ ও সৎ ছিল। তাঁর বর্ণিত স্বাভাবিক মানুষ কি মূক প্রাণী ছিল ? অনেকের মনে এই প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে। কারণ, রুশোর মতে সমাজই মানুষকে কলুষিত করেছে—যেন মানুষের কোন স্বতন্ত্র অভিপ্রায় ছিল না — এই বক্তব্যই রুশোর অনুসন্ধানের মূল কেন্দ্রবিন্দু। মানুষ প্রাক-সামাজিক স্তরে ছিল স্বাস্থ্যবান, সৎ এবং একে অপরের সমান, কিন্তু সামাজিক মেলামেশার সূত্রপাত হওয়ামাত্র যাবতীয় ক্ষয়িষ্ণুতা মানুষকে গ্রাস করে। রুশোর মতে সামাজিকজীবনের ভয়ংকরতম দিক হল এর অসাম্যপূর্ণ চেহারা। তিনি প্রথম থেকেই আধুনিক সমাজজীবন সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা ব্যক্ত করেছেন। সভ্য, সামাজিক ও আধুনিক হবার প্রয়াসে মানুষ শুধুই তার জীবনকে কণ্টকিত করেছে। প্রকৌশলের উদ্ভাবনীকে কাজে লাগিয়ে মানুষের জীবনে যে বৈষয়িক উন্নতি ঘটেছে তাতে মানুষ সুখী হয়নি, কারণ তা এক মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের বৈষম্যকে বৃদ্ধি করেছে। তিনি সামাজিক জীবনে সাম্যের কথা বললেও সার্বিক সাম্যের তত্ত্ব সচেতনভাবেই প্রচার করেননি। বরং দুটি ক্ষেত্রে বৈষম্যকে তিনি কাঙ্খিত বলে মনে করতেন — প্রথমটি হল যুবা ও বৃদ্ধ, সবল ও দুর্বল, জ্ঞানী এবং নির্বোধ এবং দ্বিতীয়টি হল সমগ্র গোষ্ঠীর হয়ে মূল্যবান ভূমিকা পালনের জন্য যারা পুরস্কৃত হন তাদের সঙ্গে অন্যদের বৈষম্য। এই দুটি ক্ষেত্রে সৃষ্ট বৈষম্য ব্যতীত অন্য কোন বৈষম্যকে তিনি স্বীকার করেন নি। রুশো কখনই মনে করতেন না সামাজিক বৈষম্য মূলত সক্ষমতার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বৈষম্যের পরিণতি। ধনী ব্যক্তি অন্যদের তুলনায় অধিক গুণবান, তাই তিনি ধনী—এই যুক্তিকে রুশো বিদ্রুপ করেছেন; অসৎ, অন্যায় উপায়ে এই অর্থঅর্জিত হয়েছে। এরূপ বক্তব্যের দ্বারা রুশো ফরাসী অভিজাতবর্গের অসার শ্রেষ্ঠতাবাদী মানসিকতাকে বিদ্রুপ করেছেন। সামর্থ্যের অসাম্য সামাজিক বৈষম্যের বৈধতাকে প্রতিপন্ন করেন। বরং সামাজিক জীবনে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য কীভাবে একে অপরের দ্বারা প্রতারিত হয়েছে তা ভেবে এই ফরাসী দার্শনিক শিহরিত হয়েছেন। সামাজিক সাম্য বলতে তিনি সুযোগের সাম্যকে বুঝিয়েছেন। ধনতান্ত্রিক সমাজে সুবিধা পাওয়ার জন্য সম্পদের ব্যবহার এবং সাম্যবাদী সমাজে ক্ষমতা ও মর্যাদার দ্বারা লব্ধ সুবিধাদি ভোগ করা— এই উভয় প্রবণতাকেই রুশো ঘৃণা করতেন। স্বাভাবিক অধিকার যা মানুষের যুক্তিবোধ নয় অনুভূতির দ্বারা লব্ধ তা রুশোর কাছে অনেক অভিপ্রেত ছিল। কারণ এই অনুভূতিই এক মানুষকে অন্যমানুষের ক্ষতি করা থেকে নিবৃত্ত করত। ফরাসী অভিজাত-বর্গের অনৈতিক নির্মম আচরণ এবং অন্যদিকে সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রসারের বাস্তবতা তার চোখ এড়ায়নি। রুশোর মানসিকতা পুরোপুরি বোঝা যায় যখন তিনি এথেন্সের তুলনায় স্পার্টার নাগরিকদের সরল জীবনধারার

স্তুতি করেছেন। শুধু এথেন্সই নয় সব যুগের দার্শনিকরাই তার মতে, মানুষের মনে দ্বিধা দ্বন্দ্ব এবং অবিশ্বাসের বীজবপন করেছেন যা মানুষের সারল্যকে নষ্ট করে দিয়েছে।

৬০.৫ ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্কে রুশোর ধারণা

প্রাকৃতি সমাজের স্বাভাবিক অবস্থার সুখ এবং সাবলীলত্বের অবসান ঘটে যখন মানুষের কাছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির লোভ দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে। হবস এবং রুশো বর্ণিত প্রাকৃতিক সমাজে ব্যক্তিসম্পত্তি ছিল না; কিন্তু লক বর্ণিত প্রাকৃতিক সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল। তবে এই মিল বাদ দিলে আর কোন বিষয়ে পরস্পরের মিল নেই। হবসের মতে পৌর সমাজের মূল উদ্দেশ্য ছিল আত্মসংরক্ষণ, জীবনের অধিকার ইত্যাদি সংরক্ষণ করা। সেক্ষেত্রে রুশোর মতে পৌর সমাজের উদ্দেশ্য ছিল কতিপয় ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পত্তির সুরক্ষা বিধান করা, আত্মসংরক্ষণ বা আনুসঙ্গিক বিষয়গুলি রুশোর কাছে বিশেষ গুরুত্ব পায় নি। পৌরসমাজ কতিপর স্বার্থন্বেষী ব্যক্তির জন্য সৃষ্টি হয়েছে এই বক্তব্য পেশ করে রুশো হবসের বক্তব্যের বিপরীত অবস্থানে রয়েছেন। হবসের কাছে পৌর সমাজের আবেদন ব্যাপক ও সর্বজনীন, কারণ জীবনের মূল্যের কোন বিকল্প নেই এবং তার সুরক্ষাতেই কমনওয়েলথের সৃষ্টি। রুশোর কাছে সম্পত্তির অধিকার একান্তভাবেই এক কৃত্রিম অধিকার বা আরও সঠিক অর্থে সুবিধা যা কয়েক জন ভোগ করতে সমর্থ। এই অবস্থাকে স্থায়ীত্ব ও প্রতিষ্ঠানিক রূপ দেবার জন্যই পৌর সমাজের সৃষ্টি। তিনি পৌর সমাজের গঠনকে কোন ধারাবাহিক ঘটনার ফল বলেননি বা ঐতিহাসিক সত্যও বলেন নি, বরং যুক্তির ফল বলে গণ্য করেছেন। প্রাকৃতিক সমাজ থেকে পৌর সমাজে উত্তরণের ঘটনা সহসাই ঘটেছিল। এই উত্তরণের দরুণ সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে সমাজে ব্যাপক বিভেদ ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। আবার একই সঙ্গে নূতন পরিস্থিতিতে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে এক প্রকার ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। তবে এই ভারসাম্য প্রায়সই বিনষ্ট হত কারণ ধনী ও দরিদ্রের স্বার্থ ছিল পরস্পরের বৈপরিত্য দ্বারা আকীর্ণ। ফলে পৌরসমাজে বিরাজ করত যুদ্ধাবস্থা যার সঙ্গে হবস বর্ণিত প্রাক-সামাজিক যুদ্ধাবস্থার তুলনা সম্ভব। Discourses-এ রুশো এ বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছেন। তবে রুশো সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রবক্তাদের ন্যায় রুশো সর্বজনীন বা গণসম্পত্তির ধারণা প্রচার করেন নি। আদর্শগতভাবে রুশো কিন্তু সেই কৃষিভিত্তিক ব্যবস্থাকেই সমর্থন করেছেন যেখানে কৃষক ক্ষুদ্র কৃষিজমির মালিক। রুশোকে অনেক সময় আধুনিক সমাজতন্ত্রের আধ্যাত্মিক গুরু বলেও অভিহিত করা হয়, কারণ তিনি সম্পত্তিকেই মানুষের যাবতীয় দুর্দশার কারণ বলে গণ্য করেছেন।

৬০.৫.১ পৌর সমাজের চিত্রায়ন

পৌর সমাজের প্রকৃতি চিত্রিত করতে গিয়ে রুশো মানুষের প্রকৃতি কিভাবে যুক্তিসত্তায় রূপান্তরিত হল সে বিষয়ে আলোকপাত করতে পারেন নি। শুধু বলেছেন এ এক সহসা পরিবর্তন বা কতিপয় ব্যক্তির ইচ্ছার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। এই পৌরসমাজ থেকে প্রাকৃতিক সমাজে ফিরে যাওয়া আর সম্ভব নয় কারণ ব্যক্তি সম্পত্তির

ধারণা এক্ষেত্রে প্রধান বাধা। সমাজ ও সামাজিক জীবনকে অনিবার্য বলে মানতে হবে কারণ এর বাইরে জীবন আর সম্ভব হবে না। সেই সুবর্ণ অতীত অর্থাৎ প্রাকৃতিক সমাজের জীবনকে আর পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব নয়। তার Emile গ্রন্থে তিনি প্রাকৃতিক জীবনের চিত্র অঙ্কন করেছেন এবং স্বাভাবিক মানুষ এবং সামাজিক মানুষের চরিত্রের পার্থক্যকে চিহ্নিত করেছেন এবং বলেছেন গভীর অরণ্যে জন্মগ্রহণ ও বসবাস করে যে মানুষ সে কত ব্যাপক স্বাধীনতা ভোগ করে এবং অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ব্যতীতই তার জীবনের ইপ্সিত বিষয় অর্জন করতে পারেন। কিন্তু এই নিস্তরঙ্গ পথে অভিপ্রেতকে পাবার মধ্যে কোন উত্তেজনা ছিল না। কিন্তু শৃংখলাপরায়নতা তাকে তার অর্জিত অধিকৃত জিনিষকে ভালবাসতে শিখিয়েছিল। জন কল্যাণের নামে শৃংখলা অনেকের কাছে নিছক অজুহাত হলেও তা আসলে নিজের স্বৈরী মানসিকতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হয়েছিল। সমর্থ হয়েছিল অনেক জটিল এবং দুষ্ট প্রকৃতির মানুষের মধ্যে থেকেও স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ রপ্ত করতে। Emile গ্রন্থে বর্ণিত পৌর সমাজের এই রূপরেখা দৃশ্যত আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল Social Contract গ্রন্থে। মানুষের সঙ্গে অন্য প্রাণীবর্গের পার্থক্য হল এই যে মানুষ আত্মসংরক্ষণ এবং দয়া বা মমত্ববোধের অধিকারী। সুতরাং এগুলি মানুষকে তার অন্তর্নিহিত উত্তম দিককে ধ্বংস করতে পারে না। সভ্যতার একটি কলুষিত দিক থাকলেও ব্যক্তির প্রাকৃতিক সত্তা কিন্তু অটুট থাকে যার দরুণ উন্নত প্রকৃতির রাজনৈতিক সংগঠন তৈরী করার মানসিকতা তৈরী হয়। এর ফলে মানুষের প্রয়োজন এবং প্রকৃতির মধ্যে সমন্বয় ঘটে। রুশোর মতে মানুষের অহমিকা (Ego) এবং সম্পত্তির মালিকানার তারতম্যই সমাজে অসাম্য নিয়ে এসেছে। আইন তৈরী করা হয় এই সম্পত্তির মালিকানা ও বন্দোবস্তকে টিকিয়ে রাখবার জন্য। এর ফলেই পৌরসমাজ বৈষম্য, সংঘাত এবং যুদ্ধাবস্থায় পর্যবসিত হয় যেখানে শঠতা সারল্যের স্থান গ্রহণ করে। আইন ও অন্যান্য রাজনৈতিক উপকরণের সাহায্যে ধনীরা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে এবং দরিদ্ররা দাসত্বের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়। সভ্যমানুষ দাস হিসাবে জন্মায়, দাস হিসেবেই মৃত্যুবরণ করে। প্রাকৃতিক মানুষের এই অবস্থান দুর্দশা এবং দম্ভ তাকে দুর্বল করে তোলে। Enlightenment যুক্তিকে রুশো প্রত্যাখ্যান করেছেন, প্রত্যাখ্যান করেছেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর মানুষের যুক্তি সত্তার বিকাশের ধারণাকে। এই বিকাশ মানুষের নৈতিক বিকাশ ঘটায় না, কারণ যুক্তিবাদী সমাজের ধারাবাহিক ক্ষয়িষ্ণুতা যা মানুষের ক্রমবর্ধমান অসুখী জীবনের সঙ্গে আনুপাতিকভাবে যুক্ত তা সব সভ্য সমাজকেই গ্রাস করে। এ বিষয়ে Emile গ্রন্থে রুশো বলেন, যদিও ঈশ্বর সব জিনিসই উত্তম করে সৃষ্টি করেছেন তুবও মানুষের তথাকথিত যুক্তিবাদী হস্তক্ষেপ সব জিনিষকেই কলুষিত করেছে। Enlightenment যুক্তির এক উপাসক ভলটেয়ার রুশোর Discourses পাঠ করে ক্রুদ্ধ হয়ে মন্তব্য করেন যে রুশোর ন্যায় অসাধারণ মেধা সম্পন্ন এক ব্যক্তি যেভাবে সভ্যতা ও মানব প্রগতির সমালোচনা করেছেন তেমনটি তিনি আগে কখনও দেখেন নি। রোবস্‌পীয়ার থেকে শুরু করে মার্ক্স পর্যন্ত বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার সমালোচক সকলেই স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা এবং সমাজ ব্যবস্থার গর্ভে কৃত্রিমতা কীভাবে সেই স্বাধীনতাকে খর্ব করে এই প্রশ্নে রুশোর চিন্তা ধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

৬০.৬ সাধারণের ইচ্ছা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা

রুশো তার সমাধিক প্রসিদ্ধ Social Contract গ্রন্থে এক উচ্চ পর্যায়ের সংগঠনের কথা বলেছেন এবং যুক্তি সহকারে দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে মানবপ্রকৃতির স্খলনের দরুণ যে পরিবর্তনের সূত্রপাত

হয় তার ফলাফল সব সময় খারাপ নাও হতে পারে। যদি সঠিক প্রকৃতির রাজনৈতিক সমাজ গড়ে তোলা যায় তবে মানুষের জীবনের সুখ অর্জনের পথ অবরুদ্ধ নাও হতে পারে। রুশোর পূর্বসূরী চুক্তিমতবাদীরা যেখানে কীভাবে প্রথম সমাজ জীবনের সূত্রপাত হয় সে বিষয়ে তাদের ভাবনা ব্যক্ত করেছেন সেখানে রুশো সঠিক সমাজগঠনের বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, কারণ তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল এই যে, সঠিক সমাজ জীবনের পথ নির্দেশ মানুষের অন্তরস্থিত সুপ্ত মানবতা বোধকে জাগ্রত করবে। রুশোর কল্পিত আদর্শ সমাজে বিশেষ স্বার্থ অর্থাৎ ব্যক্তি স্বার্থের পরিবর্তে অগ্রাধিকার পেয়েছে সাধারণের ইচ্ছা (general will) অর্থাৎ সমাজভুক্ত সকল সদস্যের সাধারণ ইচ্ছা। যে সমাজে এই সাধারণের ইচ্ছা অগ্রাধিকার পায় সেই সমাজেই মানুষের অন্তরস্থিত শুভচেতনা ও মানবিকতা বোধ জাগ্রত হবে, সম্ভব হবে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করা। সমাজ এবং ব্যক্তি রুশোর মতে এক পারস্পরিকতার সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ। ব্যক্তির অধিকার এবং সাধারণ স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হলে ন্যায় এবং উপযোগের ধারণার মধ্যে বিভাজনকে প্রতিহত করা সম্ভব। যখনই বিশেষ ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় তখনই এই সমন্বয়ের পথ অবরুদ্ধ হয়। অবরুদ্ধ হয় স্বাধীনতা ভোগের সম্ভাবনা; রুশোর কাছে মানুষের স্বাধীনতাই হল পরম অভিপ্রেত।

৬০.৬.১ স্বাধীনতা ও কর্তৃত্বের সমন্বয়

অষ্টাদশ শতকের বেশীর ভাগ লেখকই স্বাধীনতাকে ব্যক্তিত্ব বিকাশের একান্ত সহায়ক বলে মনে করতেন। রুশোও এই প্রবণতার অঙ্গীভূত ছিলেন। রুশোর বর্ণিত সামাজিক চুক্তির মৌলিক প্রতিপাদ্য বিষয়ই হল স্বাধীনতা ও কর্তৃত্বের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। স্বাধীনতা এবং কর্তৃত্ব দুটিই মৌলিক ও অপরিহার্য। কারণ দুটির কোন একটির অনুপস্থিতি এ দুটির অর্থহীনতার কারণ হবে—নাগরিক জীবন হয়ে পড়বে অস্বাচ্ছন্দ এবং পরাধীনতায় অভিশপ্ত। তবে স্বাধীনতার প্রাধান্যকে অস্বীকার করা যায় না, কারণ তা মানব ব্যক্তিত্বের মধ্যেই উৎসারিত। প্রাকৃতিক সমাজই হোক বা সভ্য সমাজই হোক স্বাধীনতার অনুভূতি একান্ত ভাবেই স্বাভাবিক। তার কাছে সামাজিক চুক্তির অর্থ তৃতীয় কোন পক্ষের কাছে আত্মসমর্পন নয়। বরং বিধিবদ্ধ বৈধতায় প্রণীত কোন কর্তৃত্বের কাছে নিজের বিশেষ ইচ্ছাকে সমর্পন করলে সাধারণের ইচ্ছা ও অনুভূতির সঙ্গে ব্যক্তির ইচ্ছা সমন্বিত—হয় সম্পূর্ণ হয় অনাবিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র ও স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ। সকলেই সকলের সঙ্গে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হবেন বিশেষ কোন ব্যক্তি বা ইচ্ছার অনুগত হবার বিপদ থেকে মুক্ত হবেন, ভোগ করবেন প্রাকৃতিক সমাজের ন্যায় স্বাধীনতা।

রুশোর এই বক্তব্যের কতকগুলি ইতিবাচক দিক আছে। তিনি ধরেই নিয়েছেন মানুষ আর কখনও প্রাকৃতিক সমাজে ফিরে যেতে পারবে না। ফলে যা কিছু অর্জন করার তা সবই পৌরসমাজেই অর্জন করতে হবে। এরূপ ভাবনা রুশোকে সুবর্ণ অতীতের ভাবনার সঙ্গে নিখুঁত ভবিষ্যৎ সমাজের ভাবনায় উৎসাহিত করেছে। তুলনামূলকভাবে বলা যায় মার্ক্সবাদ যেভাবে অদিম সাম্যবাদ এবং বৈজ্ঞানিক

সমাজবাদের মধ্যে পার্থক্য করেছে সেইভাবেই রুশো প্রাকৃতিক সমাজ এবং পৌরসমাজের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। রুশোর আরেকটি মৌলিক উপলব্ধি ছিল এই যে, মানুষের সকল কার্যকলাপই মূলত রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। লকের ন্যায় রুশোর মনে করতেন যে সম্মতিই সমাজ গঠনের মৌলিক উপাদান; ব্যক্তিস্বাধীনতার সঙ্গে গোষ্ঠীজীবনের গুরুত্বকে রুশো উপলব্ধি করেছিলেন। গোষ্ঠী জীবন ব্যক্তির কল্যাণেই সৃষ্টি হয়। এই যুক্তির সাহায্যে রুশো দুটি বিপরীতধর্মী ধারণার মধ্যে সমন্বয় চেয়েছিলেন — প্রথমটি ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন এবং দ্বিতীয়টি কর্তৃত্ব এবং স্বাধীনতা। সম্মতির ভিত্তিতে জনগণ যখন স্বইচ্ছায় সাধারণের ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পিত করে তখন পূর্বে বর্ণিত দুটি বিষয়ের দ্বান্দ্বিকতার সম্পর্কের অবসান ঘটে। এক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে জন্মেও মানুষ নিজের মঙ্গলের জন্য নিজেকে শৃংঘলের মধ্যে আবদ্ধ করে। একবার সমাজজীবনে প্রবেশ করলে মানুষের মানসিকতারও পরিবর্তন ঘটে। কারণ গোষ্ঠীজীবন স্বতস্ফূর্ত ইচ্ছায় সৃষ্টি হওয়ায় গোষ্ঠীর মধ্যেই মানুষের নৈতিক স্বাধীনতা ও স্বাধিকার সুনিশ্চিত হয়। যেহেতু সমাজ জীবনের মধ্যেই মানুষ তার সকল সম্ভাবনার বিকাশ ঘটাতে পারে তাই সমাজজীবনের এমন পুনর্গঠনকে রুশো কাঙ্খিত বলে মনে করেছেন যেখানে প্রাকৃতিক সমাজের ব্যক্তি স্বাধীনতাগুলিকে নূতন করে ভোগ করবার প্রেক্ষাপট রচিত হয়। কেবলমাত্র সঠিক নূতন সমাজ গঠন করেই এটি অর্জন করা সম্ভব।

৬০.৬.২ ধ্রুপদী চেতনা ও আধুনিক স্বতস্ফূর্ততার মিশ্রণ

বস্তুত রুশোর তত্ত্বের মধ্যে প্রাচীন গ্রীক নগররাষ্ট্রের সমধর্মীতা এবং আধুনিক যুগের স্বতস্ফূর্ততার মিশ্রণ ঘটেছে যার মাধ্যমে তাঁর প্রচারিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের ধারণা লক বর্ণিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের ধারণার থেকে পৃথক মাত্রা অর্জন করেছে। যে প্রজাতন্ত্রের স্বপ্ন রুশো দেখেছেন তা হল সৎগুণাবলী নির্ভর গোষ্ঠী, যেখানে কেবলমাত্র সততাই হবে স্বাধীনতার মূলমন্ত্র। তাই মুক্ত সমাজ হল সততার প্রতীক, কারণ রুশোর মতে সমগ্র গোষ্ঠীরই উচিত নৈতিক বিধির দ্বারা অনুশাসিত হওয়া। তিনি প্রাচীন স্পার্টা এবং এথেন্সকে আদর্শ প্রজাতন্ত্রের মডেল রূপে ভেবেছেন। যে সমাজে "সাধারণের" ইচ্ছা বর্তমান, সেখানে সকলের মিলিত ইচ্ছাই ব্যক্তিস্বাধীনতা সুরক্ষিত করবে এবং গণস্বার্থের সঙ্গে ব্যক্তিস্বার্থের মেলবন্ধন ঘটাবে। "Common Me" সাধারণ আমিই হল রুশোর মর্তে শ্রেষ্ঠ পরিস্থিতি, যেখানে মানুষ স্বার্থপরতাকে অতিক্রম করতে পারে।

৬০.৬.৩ সাধারণের ইচ্ছা ও স্বাধীনতার সমন্বয়

সাধারণের ইচ্ছাই সকল আইনের উৎস এবং এই ইচ্ছাকে অনুসরণ করলেই মানুষ সত্যিকারের স্বাধীনতা অর্জন করবে। নাগরিক স্বাধীনতাকে রুশো যেভাবে বুঝেছিলেন তা হল অন্যের আক্রমণ থেকে মুক্তির আশ্বাস বা অন্যের ইচ্ছার প্রতি বলপূর্বক আনুগত্য প্রকাশে বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি। সত্যিকারের স্বাধীনতা হল সাধারণের ইচ্ছার সঙ্গে ব্যক্তির ইচ্ছার সামঞ্জস্য ঘটিয়ে নিজের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করা। এই প্রক্রিয়ায় প্রত্যেকেই আইন প্রণেতা এবং প্রণীত আইনের প্রতি আনুগত্য ব্যক্ত করে স্বাধীনতার পরম প্রাপ্তি সুনিশ্চিত হয়, যার ফলে কোন

স্বৈরী আইন মান্য করে স্বাধীনতা হারাবার সম্ভাবনা থাকে না। এজন্যেই রুশো বলেছেন যে সেই রাষ্ট্রই স্বাধীন রাষ্ট্র যা সহমতের উপর ভিত্তি করে গণ অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। কেবলমাত্র সর্ব অর্থে সমান আইন প্রণয়নকারীদের সহমতের ভিত্তিতেই সহমত সৃষ্টি হয় এবং সাধারণের ইচ্ছার উদ্ভব ঘটে। এখানে বিচ্ছিন্নতার কোন সুযোগ নেই। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল লক এবং রুশো উভয়েই আইনসভাকে চরম ক্ষমতাশালী করতে চেয়েছেন। লক যেখানে প্রতিনিধিত্বমূলক সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক গণতন্ত্রকে প্রাধান্য দিয়েছেন সেখানে রুশো প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রকে গুরুত্ব দিয়েছেন যা প্রতিফলিত হয় গণসম্মতির মাধ্যমে। ব্যক্তি সাধারণের ইচ্ছার সৃজনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে, কারণ এই ভূমিকার সাহায্যেই নাগরিকত্বের দাবী, অধিকার ও অন্যান্য বিষয়গুলি স্থিরীকৃত হয়। এই সাধারণের ইচ্ছা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার মধ্যে রুশো পার্থক্য করেছেন এবং এখানেই রুশোর সঙ্গে লকের পার্থক্য রয়েছে। রুশো সকলের ইচ্ছার কথাও বলেন নি, কারণ সাধারণের ইচ্ছা সকলের ব্যক্তিগত কল্পনা বা কামনার মিলিত রূপ নয়; বরং তা সকলের কল্যাণের প্রতি উৎসারিত সদর্থক এক ইচ্ছা বা প্রবণতা। এইজন্য সাধারণের ইচ্ছা এই বিশেষণের গভীর তাৎপর্য্য রয়েছে।

স্বাধীনতা বলতে রুশো নৈতিক দিক দিয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণ বুঝিয়েছেন বা ব্যক্তিকে স্বাধিকার ভোগে সক্ষম করে তোলে। হবস বা লকের ন্যায় তিনি স্বাধীনতা বলতে প্রতিবন্ধকতার অবসান বা বলপ্রয়োগের সম্ভাবনা ও ভয় থেকে মুক্তি বোঝান নি। তার মতে সাধারণের ইচ্ছার অনুগত হওয়ার মধ্যেই স্বাধীনতা নিহিত রয়েছে। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির এক শিক্ষাগত ভূমিকা রয়েছে যা মানুষের প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করতে পারে, যার ফলে সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থকে উপেক্ষা করে আসল সামাজিক সত্তাকে উপলব্ধি করা সম্ভব। সাধারণের ইচ্ছার ফলপ্রসূ হবার সম্ভাবনা তখনই থাকে যখন দুটি শর্ত উপস্থিত থাকে — প্রথমত, সার্বভৌম ইচ্ছার উৎস সাধারণ বা গণ ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাবে এবং দ্বিতীয়ত, ঐ ইচ্ছা জনসমাজের প্রত্যেকের সাধারণ স্বার্থকে চিহ্নিত করে তার যথাযথ প্রতিফলন ঘটাবে। এত সমাজের সার্বিক বিকাশ সুনিশ্চিত হবে। সাধারণের স্বার্থের পক্ষে অনুকূল নয় এমন কোন শৃংখল বা প্রতিবন্ধকতা সার্বভৌম সমাজের উপর অর্পন করতে পারবে না। রাজনৈতিক সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রশ্নে রুশোর মত ছিল এই যে, দায়বদ্ধতা বাধ্যতামূলক, কারণ তা পারস্পরিকতা দ্বারা সৃষ্ট। এই দায়বদ্ধতা পালন করতে গিয়ে কেউই নিজের স্বার্থ সংরক্ষণ ব্যাতীত অন্যের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। একই সঙ্গে রুশো মুক্তি ও স্বাধীনতা-র (Independence এবং Liberty) মধ্যে পার্থক্য করেছেন। স্বাধীনতার অর্থ হল নিজের ইচ্ছানুসারে চলার অধিকার এবং অন্যের ইচ্ছার দ্বারা নিজের ইচ্ছাকে সীমিত না করা। যে অন্যের উপর প্রভূত্ব করে তাকে রুশো স্বাধীন বলেননি। তাঁর মতে স্বাধীনতা ও সাম্য এক পরস্পর সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ। যদি না মানুষকে সমানভাবে দেখা হয় তবে স্বাধীনতা অর্থহীন। সাধারণের ইচ্ছার জয়গান করেও রুশো সার্বভৌমের কাছে ব্যক্তির সব ক্ষমতার চরম হস্তান্তরকে কাম্য বলে মনে করেন নি। কারণ এতে সামাজিক শান্তি বিরাজ করলেও স্বাধীনতা থাকবে না। এখানে রুশোর অবস্থান হবসের বিপরীত এবং তিনি হবস প্রদর্শিত আদর্শ সমাজ ও শান্তিময়তার পরিবেশকে নরকের সঙ্গে তুলনা করেছেন, যা কখনও আদর্শ বাসযোগ্য পরিবেশ হতে পারে না। স্বাধীনতা মানবিক সত্তার অঙ্গীভূত। তাই রুশোর সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব হবস ও লকের তত্ত্বের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। হবস-তৃতীয় পক্ষের কাছে সার্বিক আত্মসমর্পন চেয়েছেন, যে তৃতীয় সত্তার পরিচিতি স্বতন্ত্র। রুশোও

সর্বিক আত্মসমর্পনের কথা বলেছেন তবে তা কোন তৃতীয় পক্ষের কাছে নয়। সেই সমর্পন হবে সার্বভৌম এক রাজনৈতিক সমবায়ের কাছে। বিষটির উপর আলোকপাত করতে গিয়ে ভ্যগান (Vaughan) বলেছেন যে রুশোর কল্পিত সার্বভৌমের সমতুল্য শুধু প্রথমটি মস্তকহীন। হবসের ব্যক্তিত্বকেন্দ্রিক সার্বভৌমের ধারণা রুশোর তত্ত্বে অনুপস্থিত।

৬০.৬.৪ জনপ্রিয় সার্বভৌমিকতার ধারণা

রুশোর সার্বভৌম (Sovereign) অবিচ্ছিন্ন এবং অবিভাজ্য এবং এটি একটি যৌথ সত্তার প্রতি প্রদত্ত হয় যা রুশোকে "জনপ্রিয় সার্বভৌমিকতার" ধারণা সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। তাঁর চিন্তার মৌলিকতা রয়েছে কারণ তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার হস্তান্তরকে স্বীকার করেন নি এবং এই বক্তব্যে জোর দিয়েছেন যে এই ক্ষমতার উৎস এবং অবস্থান জনগণের মধ্যে। হবস যেখানে বলতে চেয়েছিলেন যে সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থান শাসকের মধ্যে অর্থাৎ, রাষ্ট্রের সঙ্গে অর্থাৎ সার্বভৌমিকতার আইনগত রূপ হবসের কাছে যেখানে অগ্রাধিকার পেয়েছে, রুশো সেখানে জনগণের সার্বভৌমিকতা, রাজনৈতিক সমাজ প্রভৃতি ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন যা জনগণের অধিকারের গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। লক সার্বভৌমত্বের ধারণাকে গুরুত্ব দেননি এই ভয়ে যে তা স্বৈরাচার সৃষ্টি করতে পারে এই জন্য তাঁর পথনির্দেশ ছিল সীমিত রাষ্ট্র গঠনের। কিন্তু রুশো সরকারের গণঅভীপ্সা (general will) বা সাধারণের ইচ্ছার প্রতীক বলে উল্লেখ করেছেন, যা রাজনৈতিক সমাজের মিলিত সত্তাকে প্রতিফলিত করে। মঁন্তেস্কুর ন্যায় তিনিও মনে করতেন সব ধরনের সরকার সবদেশের উপযোগী নয়। একটি দেশের সরকার ঐ দেশ তাঁর জনগণের প্রকৃতি ও প্রবণতাকে প্রতিফলিত করে। তিনি একটি পৌর আচরণ বিধি (Civil Religion) -এর কথাও বলেছেন, যা নাগরিককে দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করবে এবং সেই সঙ্গে রাষ্ট্রের নৈতিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করবে। যে ব্যক্তি এই সমষ্টি জীবনের ধারাকে অনুসরণ করবে না তাকে রুশো সমাজ থেকে বিতাড়িত করা উচিত বলে মনে করেছেন। এ শুধু ন্যায় বা বিধির সারমর্ম অনুধারণ না করতে পারার জন্য জরুরী নয় তাঁকে কর্তব্যবোধে সমৃদ্ধ করার জন্যও জরুরী। এতে নাগরিক জীবনের স্থিতিশীলতা ও সামঞ্জস্য রক্ষা সহজতর হবে।

৬০.৬.৫ সহনশীলতার আদর্শ

রুশো সামাজিক জীবনে সহনশীলতার কথা বললেও লকের ন্যায় রোমান ক্যাথলিক এবং অবিশ্বাসীদের প্রতি সহনশীল হওয়ার বিষয়টিকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন নি। ম্যাকিয়াভেলির ন্যায় তিনিও মনে করতেন যে ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের আবেগগত সম্পর্ক তৈরীর ক্ষেত্রে ধর্মের বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। জাতীয় অনুভূতির সৃজনে ধর্মের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে রুশো ব্যক্তিকে ধর্মযাজকদের স্বৈরাচার থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন এবং ব্যক্তিকে প্রাকৃতিক অনুশাসন এবং রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনীয়তা দ্বারা নির্ধারিত ধর্মীয় সূত্রের অধীন করতে চেয়েছিলেন। স্বদেশপ্রেমে যারা উদ্বুদ্ধ তারাই স্বাধীনতার অর্থ উপলব্ধি করতে পারেন সেই সঙ্গে জাতীয়তাবোধ দ্বারা সঞ্জীবিত শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে মুক্ত মনের মানুষ করে তুলবে। তবে রুশোর

"সাধারণের ইচ্ছার" ধারণার সবচেয়ে বিতর্কিত অংশ হল এই বক্তব্য যেখানে রুশো বলেছেন স্বাধীনতার অর্থ হল "সাধারণের ইচ্ছার কাছে ব্যক্তি সত্তাকে সমর্পন করা। বাস্তবজীবনে স্বাধীনতা তখনই আসবে যখন মানুষ স্বইচ্ছায় ব্যক্তি ইচ্ছাকে যেখানে সমর্পন করেছে তার অধীনে নিজেকে স্থাপন করবে। ব্যক্তিস্বার্থের চরম বহিঃপ্রকাশের দ্বারা স্বাধীনতার সঠিক মর্ম উপলব্ধি করা যায় না এবং এ বিষয়ে রুশোর পথনির্দেশ হল যৌথ লক্ষ্য এবং স্বার্থের প্রসার ঘটানো যা স্বাধীনতাকে প্রসারিত করে। সাধারণের ইচ্ছাকে মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যা ব্যক্তির বাস্তব একক ইচ্ছার পরিবর্তে সমষ্টির ইচ্ছার প্রাধান্যকে প্রতিষ্ঠিত করবে। রুশো ব্যক্তির ইচ্ছাকে সমাজ চেতনার পরিপন্থী বলেছেন এবং যখন এই ইচ্ছা সমষ্টির কল্যাণ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয় তখনই তা প্রকৃত ইচ্ছায় রূপান্তরিত হয়। এই প্রকৃত ইচ্ছার এক পূর্বশর্ত হল অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমতা। সাধারণের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পন করেও একজন ব্যক্তি ভুল করতে পারে এই অর্থে যে সে ব্যক্তিইচ্ছার বশবর্তী হয়ে স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলতে পারে। এরূপ পরিস্থিতে রুশো "forced to be free" বল প্রয়োগের দ্বারা স্বাধীন করা হবে এরূপ বক্তব্য পেশ করেছেন।

৬০.৬.৬ উদারনীতিবাদ সম্পর্কে অবস্থান

এরূপ মত ব্যক্ত করেও রুশো বলেছেন "সাধারণের ইচ্ছা" স্বৈরী বা সর্বাত্মক ক্ষমতার প্রতীক হবে না। সে জন্যই তিনি এরূপ সম্ভাবনার বিরুদ্ধে কোন রক্ষাকবচের বন্দোবস্ত করেন নি। ইসারা বার্লিন "ইতিবাচক স্বাধীনতাকে" (Positive Liberty) মানবিক অস্তিত্বের পক্ষে আবশ্যিক বলেছেন কিন্তু আবার এ ধারণা সমস্যাপ্রবণও বলে মনে করেছেন। স্বাধীনতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের সহাবস্থান শুনতে ভাল লাগে কিন্তু বাস্তবে তা প্রায়ই আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করার সুযোগে বিকৃত হয়ে পড়ে। রুশোর কাছে স্বাধীনতা হল এক যুক্তিময় সত্তার প্রতি আনুগত্য যা একই প্রকার জীবনধারায় সমাজের সকলের জীবনপথ পরিচালনায় সমর্থ। রুশোর দৃষ্টিভঙ্গী উদারনীতিবাদ বিরোধী, কারণ তার মতে নৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক যে কোন বিরোধই অনৈতিকতার প্রতীক এবং ভ্রান্তিমূলক। তার ইচ্ছা ছিল এক বিরোধবিহীন সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজগঠন, যেখানে স্বাধীন মানুষের ইচ্ছার সামঞ্জস্যই হবে সমাজ জীবনের ভিত্তি।

৬০.৬.৭ আইন প্রণয়নকারীর ভূমিকা

রুশো প্রাচীন প্রজাতন্ত্রগুলির সাফল্যের বিভিন্ন কারণ চিহ্নিত করতে গিয়ে আইন প্রণয়নকারী (Legislator) দের ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। তিনি আইন প্রণয়নকারীকে অতিমানবীয় দায়িত্বের অধিকারী ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র বলে গণ্য করে তাকে সাধারণের ইচ্ছার অনুগামী ব্যক্তিমানসিকতার ধারক ও বাহক বলে অভিহিত করেছেন। এর দায়িত্ব হল ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানসিকতার পরিবর্তে সাধারণ মানুষের মধ্যে সাধারণের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ মানসিকতা তৈরী করা, সাংবিধানিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে মানুষের মধ্যে নৈতিকতার বিকাশকে সুনিশ্চিত করা। এই জন্য আইন প্রণয়নকারীকে সাধারণ মানুষের থেকে স্বতন্ত্র অনন্য বক্তিত্বের অধিকারী হতে হয়। অথচ একই সঙ্গে

নাগরিকদের সুখবিধান করা এবং তাদের স্বার্থের প্রতি সংবেদনশীল হওয়াও তার দায়িত্ব। আইন প্রণয়নকারীর প্রতি রুশোর স্বাভাবিক শ্রদ্ধাবোধ পরবর্তীকালে এডমণ্ডবার্কের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছিল। রাষ্ট্রে গঠনে এই আইন প্রণয়কারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা রুশো সশ্রদ্ধভাবে স্মরণ করেছেন, কারণ তিনি আইন প্রণয়নকারীর ভূমিকাকে গতানুগতিক আইন প্রণয়নের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চাননি। তবে প্রণীত আইনগুলির প্রতি গণসমর্থন থাকতে হবে বলে রুশো মত প্রকাশ করেছেন। তিনি প্রায়শই প্রাচীন স্পার্টার আইন প্রণেতা লাইকারগাসের কথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেছেন। লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, তিনি নিজেকে কর্সিকা এবং পোল্যাণ্ডের আইন প্রণয়নকারী হবার যোগ্য বলে দাবী করেছিলেন। একজন আইন প্রণয়নকারীকে তিনি যে ভৌগোলিক অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করছেন সেই অঞ্চলটি সম্পর্কে সুপরিচিত হবার পরামর্শ দিয়েছেন রুশো এবং বলেছেন যে এই অঞ্চল ক্ষুদ্রায়তন বিশিষ্ট হওয়াই কাম্য। উপযুক্ত গণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা এবং সৎ নৈতিকতার অধিকারী আইন প্রনয়নকারী মিলিতভাবে সমাজকে আদর্শভাবে গড়ে তুলতে পারে।

৬০.৭ রুশো ও গণতন্ত্র

গণতন্ত্র সম্পর্কে রুশোর বক্তব্যের স্বকীয়তা রয়েছে। তাঁর কাছে প্রতিনিধিত্বমূলক সংসদীয় সরকারের তুলনায় প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র অধিকতর অভিপ্রেত। কারণ, এই ব্যবস্থার স্বাধীনতা, স্বশাসন এবং সাম্য সুনিশ্চিত হয়। এই গুণাবলী অর্জনের জন্য রুশো ব্যক্তির উপর বিধিনিষেধ আরোপের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, কারণ এ জাতীয় বিধি নিষেধ ব্যক্তির পক্ষে কল্যাণকরই হবে বলেই তার প্রত্যয়। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ব্যতীত আর কোন গণতন্ত্রই ব্যক্তির চরম আনুগত্য দাবী করতে পারে না। ধর্মের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির মুক্তি বা পরিত্রাণ সম্ভবপর নয়, কারণ এই মুক্তি আসতে পারে কেবলমাত্র গণ অংশগ্রহণভিত্তিক প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে। বিদ্যমান বলপ্রয়োগভিত্তিক সমাজব্যবস্থাকে ধ্বংস করে রাজনৈতিক এবং নৈতিক সত্তাযুক্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেই মানুষের মুক্তি অর্জন সম্ভব। রুশোর এই বক্তব্যের মধ্যে প্লেটোর বক্তব্যের এক প্রচ্ছন্ন প্রতিবিম্ব রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বিষয় হল রুশো ইংরেজ সংসদীয় সরকারী ব্যবস্থার সারবত্তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, কারণ এটি স্বাধীনতা সম্পর্কিত এক অলীক মোহ তৈরী করে। বাস্তবে ইংরেজ জনগণ কেবলমাত্র নির্বাচনের সময়ই স্বাধীনতা পায় আর একবার প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে গেলে মানুষ আবার তার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে। স্বাধীনতা তখনই অর্থপূর্ণ হয় যখন মানুষ স্বশাসন ও আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ অংশগ্রহনের সুযোগ পায়। ব্যক্তিকেন্দ্রিক চেতনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ না হয়ে মানুষ যখন স্বাধীনতা ভোগ করে তখন স্বাধীনতা অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। সামাজিক চুক্তি ব্যক্তিকে এই ক্ষমতাই প্রদান করে। এর ফলে ব্যক্তি এবং সমাজদেহের মধ্যে অচ্ছেদ্য বন্ধন সৃষ্টি হয়। রুশোর এরূপ বক্তব্য অবশ্য গতানুগতিক উদারনৈতিক ভাবনার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ রুশোর বক্তব্য ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পর্কিত উদারনৈতিক চিন্তার বিরোধী। তাহলে রুশো কী সর্বনিয়ন্ত্রণবাদের সমর্থক? উদারনৈতিক দর্শনে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র এবং নিজ সত্তাকে প্রাধান্য

প্রবণতা Private Sphere" বা ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে যার উপর রাষ্ট্র কর্তৃত্বের অধিকারও স্বীকার করা হয় না। এর থেকেই উদ্ভূত হয়েছে এই ধারণা যে রাষ্ট্রীয় ক্রিয়কলাপে যদি রাষ্ট্রকর্তৃত্বের সীমা লংঘিত হয়, তবে ব্যক্তি রাষ্ট্র বিরোধিতার অধিকার ভোগ করবে। কিন্তু রুশো ফরাসী সমাজের বিদ্যমান পরিস্থিতির আলোকে এমন এক জনসমাজ এবং সমাজজীবন তৈরী করতে চেয়েছেন যা ব্যক্তির নৈতিক স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করবে, অর্থাৎ, ব্যক্তি তার সক্রিয় অংশগ্রহণে নির্মিত আইনের অধীনে তার ব্যক্তি স্বাধীনতাকে স্থাপন করবে এবং এভাবেই গড়ে উঠবে পৌরসমাজ বা Civil Society প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে বিজেতা সব কর্তৃত্ব নিয়ে চলে যাবে এই ব্যবস্থাকে রুশো মানতে পারেন নি। তিনি অর্থনীতির ন্যায় রাজনীতির ক্ষেত্রেও প্রতিযোগীতা কাম্য মনে করেন নি, কারণ প্রতিযোগী মানসিকতা সহযোগীতার ইচ্ছাকে অঙ্কুরেই নষ্ট করে। নৈরাজ্যও সমভাবে অনভিপ্রেত। লকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বলা যেতে পারে যে রুশোর বক্তব্য, অর্থাৎ, স্বাধীনতার একটি "Public Domain" বা গণভিত্তিক সত্তা থাকা প্রয়োজন, বিগত শতাব্দীতে হিটলার এবং ষ্টালিনের কাছে উদ্দীপক হয়ে থাকলেও থাকতে পারে। তবে রুশো ন্যায়ভিত্তিক সমাজগঠনের প্রশ্নে ব্যক্তিস্বার্থ কেন্দ্রিক স্বাধীনতায় কখনও বিশ্বাস করেননি। বিশ্বাস করেননি ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণাকে অমোঘ সত্তা দেওয়ার অভিপ্রায়কে। কারণ এসবই ধনীর স্বার্থকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থার সহায়ক। রুশো লকের দ্বারা প্রভাবিত হয়েও দরিদ্রের কল্যাণে সম্পত্তিকে ব্যবহার করার তত্ত্বের সোচ্চার সমর্থক। তাই উদীয়মান বুর্জোয়া দর্শনের স্রোতে ভেসে গিয়ে সীমিত সরকার ও সীমিত রাষ্ট্রের তত্ত্বের দ্বারা মোহগ্রস্ত না হয়ে তিনি ব্যক্তিকে প্রয়োজনে "জোর করে স্বাধীন" করতে চেয়েছেন, চেয়েছেন মানুষের স্বাধীন সমাজ গড়তে।

৬০.৮ রুশোর মূল্যায়ন

মার্ক্সের দর্শনের ন্যায় রুশোর দর্শনেও আন্তর্জাতিকতাবাদী এক সত্তা বর্তমান ছিল। রুশো এক অখণ্ড মানব পরিবার এবং বিশ্বজনীন যুক্তরাষ্ট্রের কল্পনা করেছিলেন। সামগ্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে তিনি নৈতিক সত্তা প্রদান করতে চেয়েছিলেন, যার ফলে সমগ্র এবং তার অংশের যুগ্ম কল্যাণ সুনিশ্চিত হয়। এই ব্যবস্থায় সমগ্র সত্তার সঙ্গে ব্যক্তি সত্তার মিলন সম্ভব হয়। যেখানে এই মিলন সম্ভব সেখানেই আসল মুক্তির সম্ভাবনা—রুশোর এই বক্তব্য তাঁকে ১৭৮৯-এর ফরাসী বিপ্লবের তাত্ত্বিক রূপকার করে তুলেছিল। রুশোর ভাবাদর্শের অনেক কিছুই ফরাসী বিপ্লবের অস্থির সময়ে বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়েছিল তবে তাঁর সব পরিণাম ভাল হয়নি। Enlightenment যুক্তির পথ না অনুসরণ করে রুশো মানবপ্রকৃতির অনবদ্য ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক চেতনা সমৃদ্ধ এই বক্তব্য স্বীকার করেননি আবার আধুনিকপন্থীদের ন্যায় মানুষকে স্বার্থপর ও ব্যক্তি সচেতন বলেও মনে করেননি। তবে তিনি মনে করতেন মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক গতি অনুসারেই মানুষ সঙ্কীর্ণ স্বার্থসচেতনতার স্তর থেকে গণমুখী চরিত্র অর্জন করে। রুশোর কাছে ব্যক্তি অংশত যুক্তিবাদী, অংশত আবেগপ্রবণ এবং অংশত উপযোগী চেতনা দ্বারা পরিচালিত। মানবচরিত্রের গভীরে রয়েছে নৈতিকতা যাকে সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলি

সহজেই কুলষিত করে। এই জন্যই রুশো চেয়েছিলেন সমাজজীবনে নৈতিকতাবোধ সঞ্চারিত করতে। এই জন্য রুশোকে ঠিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী বলে চিহ্নিত করা যায় না। তিনি সুস্থ স্বাভাবিক সমাজ জীবনের কথা ভেবেছেন এবং সেই ভাবনার আলোকে সার্বভৌমিকতা সম্পর্কিত সবচেয়ে বৈপ্লবিক বক্তব্য পেশ করেছেন। তাই রাষ্ট্র এবং তার সার্বভৌম সত্তার মধ্যেই মানুষের অস্তিত্বের সার্থকতা, অন্যথায় জীবনের বুনিয়াদ হয়ে পড়বে অনিশ্চিত। রুশোর তত্ত্বে এভাবেই ব্যক্তি ও রাষ্ট্র সবসময় কেন্দ্রীয় সত্তা অর্জন করেছে। রুশোর দর্শন বাস্তবিকই বিংশ শতাব্দীর রাজনীতির মর্মবস্তুকে স্পর্শ করেছে, কারণ জাতীয়তাবাদ, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা, অর্থনেতিক সাম্য এবং তা সুনিশ্চিত করতে রাষ্ট্রের ভূমিকা রুশোর দর্শনে গুরুত্ব পেয়েছে। রুশো আজন্ম স্বাধীনতাপ্রেমী কিন্তু সেই স্বাধীনতাকে তিনি সামাজিক হিতার্থে প্রয়োগ করতে চেয়েছেন যেখানে মানুষের উপর মানুষের কৃত্রিম নির্ভরশীলতা থাকবে না। তার Social Contract গ্রন্থ ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের বিরোধী এবং একদিক দিয়ে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার পূর্বসংকেত দিয়ে গিয়েছে। তাই তিনশতাব্দীকাল অতিক্রান্ত হলেও রুশোর আকর্ষণের অমোঘতা হ্রাস পায়নি।

৬০.৯ সারাংশ

এককটি রুশোর সমসাময়িক ফ্রান্সের অস্থির সমাজ অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে রুশোর দর্শন গড়ে উঠেছে সেটি আলোচিত হল। এই অস্থির সমাজের পটভূমিকায় প্রাক-সামাজিক ও সামাজিক জীবন ধারা, সামাজিক চুক্তি বা কর্তৃত্বের সৃজন, কর্তৃত্বের প্রকৃতি অর্থাৎ সাধারণের ইচ্ছা এবং এই ইচ্ছার সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার সম্পর্ক, মানুষ কতদূর স্বাধীনতা ভোগ করবে, গণতন্ত্র এবং কর্তৃত্বের মধ্যে সমন্বয় সম্ভবপর কিনা, উদারনীতিবাদ সম্পর্কে রুশোর অবস্থান ইত্যাদি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল। এককটিতে দেখানো হয়েছে রুশো কীভাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চিন্তাকে প্রভাবিত করেছেন।

৬০.১০ অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

(১) রুশোর চিন্তায় মানব প্রকৃতি কিভাবে চিত্রিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করুন।

(২) রুশোর দর্শনে প্রাক-সামাজিক এবং সামাজিক জীবনের কিরূপ চিত্রায়ন ঘটেছে।

(৩) ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্কে রুশোর মত বিশ্লেষণ করুন।

(৪) রুশোর দর্শনে কীভাবে স্বাধীনতা ও কর্তৃত্বের সমন্বয় ঘটেছে ?

(৫) গণতন্ত্র সম্পর্কে রুশোর অবস্থান ব্যাখ্যা করুন ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) রুশোর মতে আইন প্রণয়নকারীর ভূমিকা কী ?

(২) সহনশীলতা সম্পর্কে রুশোর অবস্থান কী ?

(৩) রুশো মানুষের যুক্তি চেতনা সম্পর্কে কী মত ব্যক্ত করেছেন ?

(৪) রুশোর মতে মানুষের সমাজে কী কারণে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে ?

(৫) রুশোর কল্পিত উদ্দেশ্য কি ?

৬০.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১। Berki, R. N. — *The History of Political Thought, Dent, London, (1977).*

২। Cassirer, E. — *"Enlightenment" in Encyclopaedia of Social Sciences New York, Macmillan, (1937).*

৩। Cobban, A — *Rousseau and the Modern State, London, Unwin University Books, (1964).*

৪। Colletti, L. — *From Rousseau to Lenin, Studies in Ideology and Society, J. Merrington and J. White (Trans.) New Delhi, Oxford University Press, (1969).*

৫। Salsine G. H. & Thorson T. L. — *A History of Political Theory New Delhi, Oxford IBH Publishing, (1973).*

৬। Mukherjee, Subrata & Ramaswamy Sushila — *A History of Political Thought, New Delhi, Prentice Hall of Indian, (1999).*

৭। চক্রবর্তী দেবাশিষ — *রাষ্ট্রচিন্তা ধারা—ম্যাকিয়াভেলি থেকে রুশো। কলকাতা, সেন্ট্রাল বুক পাবলিসার্স, (১৯৯০)।*

একক ৬১ □ জর্জ উইলহেলম ফ্রেডরিক হেগেল

গঠন

৬১.০ উদ্দেশ্য

৬১.১ প্রস্তাবনা

৬১.২ হেগেলের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সময়

৬১.৩ হেগেলের রাষ্ট্রচিন্তার পরিচয়

৬১.৩.১ হেগেলের রাষ্ট্রতত্ত্বের দার্শনিক ভিত্তি

৬১.৩.২ দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি

৬১.৩.৩ রাষ্ট্রসংক্রান্ত ধারণা

৬১.৩.৪ স্বাধীনতার ধারণা

৬১.৩.৫ পুরসমাজ সম্বন্ধে ধারণা

৬১.৩.৬ সার্বভৌমিকতা ও শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে ধারণা

৬১.৪ হেগেলের দৃষ্টিতে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক

৬১.৫ হেগেলের রাষ্ট্রচিন্তার সমালোচনা

৬১.৬ রাষ্ট্র চিন্তায় হেগেলের অবদান

৬১.৭ সারাংশ

৬১.৮ অনুশীলনী

৬১.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৬১.০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল হেগেলের রাষ্ট্রচিন্তার বিভিন্ন দিক, হেগেলের রাষ্ট্রচিন্তার সমালোচনা ও রাষ্ট্রচিন্তায় হেগেলের অবদানের সঙ্গে আপনার পরিচয় স্থাপন। এটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন—

- হেগেলের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সময়
- হেগেলের রাষ্ট্রতত্ত্বের দার্শনিক ভিত্তি ও দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি
- রাষ্ট্র, স্বাধীনতা, পুরসমাজ, সার্বভৌমিকত্ব ও শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে হেগেলের ধারণা

- হেগেলের মতে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক
- হেগেলের রাষ্ট্রচিন্তার সমালোচনা
- রাষ্ট্রচিন্তায় হেগেলের অবদান

৬১.১ প্রস্তাবনা

অষ্টাদশ শতকের ইউরোপে প্রাকৃতিক আইন (Natural Law) ও অবাধ বাণিজ্য নীতির ভিত্তিতে উদারনীতিবাদী দর্শন বিকাশ লাভ করেছিল। উদারনীতিবাদ ব্যক্তির স্বাধীনতা ও স্বতঃস্ফূর্ততাকে গুরুত্ব দেয় এবং রাষ্ট্রকে ন্যূনতম কর্তৃত্ব প্রদান করে। উদারনীতিবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের কাজ শুধু শৃঙ্খলারক্ষা ও দোষীদের শাস্তিবিধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। ব্যক্তির জীবনে কল্যাণবৃদ্ধি বা ইতিবাচক ভূমিকা পালন রাষ্ট্রের কাজ নয়।

ঊনবিংশ শতকে উদারনীতিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। উদারনীতিবাদের বদলে প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের কর্তৃত্ববাদ ও আদর্শবাদকে ফিরিয়ে আনার দুটি প্রচেষ্টা এই শতকে উল্লেখযোগ্য — জার্মান আদর্শবাদ ও ব্রিটিশ (অক্সফোর্ড) আদর্শবাদ। জার্মান আদর্শবাদের মুখ্য প্রবক্তা হলেন কান্ট, ফিক্‌টে ও হেগেল। হেগেলের লেখনীতে জার্মান আদর্শবাদ চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। কান্ট, ফিকটে ও হেগেল আবার অক্সফোর্ড আদর্শবাদীদের প্রভাবিত করেন।

এখন আমরা হেগেলের আদর্শবাদী রাষ্ট্রচিন্তা নিয়ে আলোচনা করব।

৬১.২ হেগেলের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সময়

১৭৭০ সালের ২৭শে আগষ্ট জার্মাণীর স্টুটগার্ট শহরে আমলাতান্ত্রিক পরিবেশে ও অভিজাত পরিবারে হেগেলের জন্ম। তাঁর পিতা ছিলেন রাজস্ব দপ্তরের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তিনি প্রথমে গ্রামার স্কুলে এবং পরে টিউবিনগার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। ২৩ বছর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করে তিনি কিছুদিন "টিউটর" হিসেবে কাজ করেন। ১৮০১ সালে তিনি জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদলাভ করেন। তাঁর লেখার জন্য এই সময় থেকে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং স্বীকৃতি হিসাবে তাঁকে জেলা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরো সময়ের অধ্যাপক পদ দেওয়া হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত থাকার সময়ই তাঁর রাষ্ট্রদর্শন বাস্তব রূপ লাভ করে।

১৮০৬ সালে নেপোলিয়ন জার্মাণী আক্রমণ করেন এবং জেনা বিশ্ববিদ্যালয় এই আক্রমণে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। হেগেল এর পর জেনা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে নুরেমবার্গে একটি স্কুলের হেডমাস্টারের পদ গ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি আদর্শ শিক্ষার জন্য ছাত্রদের আনুগত্য দেখাতে ও আত্মসমর্পণ করতে বলেন। রাজনীতিতে যে কর্তৃত্ববাদের সঙ্গে তাঁর নাম যুক্ত, তা এইভাবে অল্পবয়সে

তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। ১৮১৬ সালে তিনি হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে যোগ দেন। ১৮১৮ সালে তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। আমৃত্যু তিনি এই পদে ছিলেন। ১৮৩১ সালে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে তাঁর জীবনাবসান হয়।

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন তাঁর খ্যাতি প্রসারিত হয়। সাহিত্যজগতে গ্যেটের মত চিন্তাজগতে হেগেলের প্রভাব ছিল। তাঁর চিন্তাধারা শুধুমাত্র লেখনীর জগতে নয়, বাস্তব ক্ষেত্রেও কার্যকরী ছিল। মনে করা হয় যে পরবর্তীকালে প্রাশিয়ার চ্যান্সেলর বিসমার্ক হেগেলের তত্ত্বকেই বাস্তবে অনুসরণ করেন। রাষ্ট্র যে কয়েকজন ব্যক্তির সমষ্টিমাত্র নয়, একটি পরিপূর্ণ, সমগ্র ক্ষমতার বলে বলীয়ান জাতীয় রাষ্ট্রই হল মানুষের কাজের মূল লক্ষ্য বা চরম ক্ষমতাশালী রাজতন্ত্রের ওপর গুরুত্বস্থাপন বিসমার্কের এসব ধারণা হেগেলীয় রাষ্ট্রতত্ত্বেরই প্রতিধ্বনি বলা যায়।

তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থাবলীর মধ্যে The Phenomenology of Mind, The Science of Logic, Encyclopedia of Philosophical Sciences, The Philosophy of Right, The Philosophy of History ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত গ্রন্থদুটি তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের কাছে তাঁর গ্রন্থগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগকে (১৮০১-৩১) হেগেলীয় চিন্তাভাবনার বিকাশকাল বলা যায়। এই সময় জার্মাণী ছিল বিভক্ত, দুর্বল ও অশান্ত। তাই সপ্তদশ শতকে ইংলন্ডে বা অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সে বুর্জোয়াপরিচালিত যে বিপ্লব ঘটেছিল, তা ঊনবিংশ শতকের জার্মাণীতে সম্ভব ছিল না। ইংলন্ড, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, নরওয়ে, স্পেন, সুইডেন ইত্যাদি বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশে জাতীয় রাজশক্তির অধীনে এই সময় যে রাজনৈতিক একীকরণ ঘটেছিল (Political unification), তার ফলে সামন্ততন্ত্রের সমাপ্তি ঘটে, জাতীয় রাষ্ট্র শক্তি সঞ্চয় করে এবং বুর্জোয়াদের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। জার্মাণীতে ঊনবিংশ শতকে জাতীয় ঐক্য গড়ে ওঠে নি। ১৬১৮ থেকে ১৬৪৮ পর্যন্ত তিরিশ বছরের রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ ও বৈদেশিক আক্রমণ জার্মাণীকে বিভক্ত ও দুর্বল করে দেয়। এর আগে পর্যন্ত সম্রাটের কিছুটা যে কর্তৃত্ব ছিল তা পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়। ১৬৪৮-এর ওয়েষ্টফালিয়া চুক্তির ভিত্তিতে জার্মাণী ২৩৪টি ভূখন্ডগত এককে বিভক্ত হয়, প্রত্যেকেই সার্বভৌম ক্ষমতা ও স্বাধীনতা চায়, অন্যের প্রতি শত্রুমনোভাব ব্যক্ত করে এবং সমগ্রভাবে জার্মাণী সম্বন্ধে কোন আবেগ দেখায় না। ফলত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নৈরাশ্যজনক অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং জার্মাণী ফ্রান্সের চতুর্দশ লুইএর অধীনে প্রটেক্টরেটে পরিণত হয়। এই রাজনৈতিক অধীনতার চূড়ান্ত পর্যায় দেখা যায় ১৮০৬ সালে যখন নেপোলিয়ন জার্মাণীর প্রকৃত শাসক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। এর কিছু আগে ১৮০৩ সালে ২৩৪ টি ভূখন্ডগত একক ৪০ টি অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল এবং জামণীর ভৌগোলিক কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল। ১৭৮৯ এ ফরাসী বিপ্লবের আগে প্রাশিয়া শক্তিশালী হয়ে ওঠেছিল এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ রাষ্ট্র হিসাবে ইউরোপীয় রাজনীতিতে কিছুটা প্রভাবও ফেলেছিল। কিন্তু অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে দীর্ঘকালীন সংঘর্ষের ফলে প্রাশিয়াও দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ফ্রান্স ও

নেপোলিয়নের অধীন হয়ে পড়ে। তবে ফ্রান্স বেশিদিন জার্মাণীর ওপর আধিপত্য করতে পারে নি। উনবিংশ শতক থেকে জার্মাণীতে জার্মান জাতীয়তাবাদ দেখা দেয় এবং ১৮১৩-র মুক্তিযুদ্ধের ফলে জার্মাণী ফ্রান্সের আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়।

কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ জার্মাণীতে শুধু শাসকেরই পরিবর্তন ঘটায়, রাজনৈতিক অবস্থার ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। ফরাসী আধিপত্যমুক্ত হওয়ার পর প্রধান রাজ্যগুলি— প্রাশিয়া, বাভারিয়া এবং স্যাক্সনি — তাদের সার্বভৌম ও স্বাধীন অস্তিত্ব ঘোষণা করে। ফলে জার্মাণী রাজনৈতিক দিক থেকে বিভক্তই থেকে যায়।

এইভাবে রাজনৈতিক দিক থেকে বিভক্ত জার্মাণীতে বুর্জোয়াদের বিকাশও বিলম্বিত হয়। তিরিশ বছরের যুদ্ধ জার্মাণীর ব্যবসা ও বাণিজ্যের ক্ষতিসাধন করে। ওয়েষ্টফালিয়া চুক্তি অনুসারে অসংখ্য ভূখন্ডগত একক রাষ্ট্রশক্তি গড়ে ওঠায় অনেক জার্মান প্রিন্সের আবির্ভাব ঘটে, যারা রাজনৈতিকভাবে স্বাধীনতা লাভ করে ও রক্ষণশীল সামন্তশাসকের মত শাসন করতে থাকে। ফলে নতুন ধরণের সামন্ততন্ত্র দেখা দেয় এবং বুর্জোয়াদের বিকাশকে ব্যাহত করে। কেন্দ্রীভূত জাতীয় রাজনৈতিক কর্তৃত্ব, যা প্রয়োজনে বুর্জোয়াদের সহায়তা করবে, তার অভাবে জার্মান বুর্জোয়ারা সামন্ততান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে দুর্বল হয়ে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধের পর জার্মাণীতে পুরোনো ব্যবস্থাই ফিরে আসে এবং জার্মান বুর্জোয়া দুর্বলই থেকে যায়।

উনবিংশ শতকের প্রথমে জার্মাণীর এই দুঃখজনক রাজনৈতিক বিভাজন ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য জার্মান বুর্জোয়ারা ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্র ও দৃঢ় রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অধীনে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা ও অনৈক্য ও বিভেদজনিত শক্তির বিনাশ কামনা করে। তারা আশা করে যে শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্রের সাহায্যে জার্মানীতে দ্রুত বুর্জোয়াদের বিকাশ সম্ভব হবে। অর্থাৎ এই সময় জার্মাণীতে এক নতুন ধরণের রাজনৈতিক তত্ত্ব, যার মধ্যে হব্‌স্ ও ম্যাকিয়াভেলীর মিশ্রণ থাকবে, তার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। হেগেল এই মিশ্রণ ঘটিয়ে তাঁর নতুন রাজনৈতিক তত্ত্ব নির্মাণ করেন ও বুর্জোয়াদের প্রয়োজন মেটান।

ব্রিটেন ও ফ্রান্সের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধের ধারা দেখা যায়। ফলে সরকারের স্বৈরাচারিতারোধ ও জনগণের স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষা সেখানে প্রাধান্য পায়। কিন্তু জার্মাণীর রাজনৈতিক ঐতিহ্য অন্যরকম। সেখানে স্বৈরতান্ত্রিক ভাবধারারই প্রাধান্য। কান্ট ও ফিকটের আদর্শবাদী বা ভাববাদী চিন্তাধারার উত্তরসূরী হলেন হেগেল। তিনি ভাববাদ ও সর্বনিয়ন্ত্রণবাদের পরিমন্ডলেই থেকে গেছেন, বার্কের রক্ষণশীলতাকেও তিনি গ্রহণ করেন, রুশোর 'সাধারণ ইচ্ছা' তত্ত্ব তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। রুশোর 'সাধারণ ইচ্ছা' হেগেলের হাতে 'রাষ্ট্রের ইচ্ছায়' পরিণত হয়, যা সমস্ত ব্যক্তির ইচ্ছাকে গ্রাস করে। এইভাবে রাষ্ট্র তাঁর হাতে এক নতুন লেভিয়াথানে পরিনত হয়।

১৭৮৯ এর ফরাসী বিপ্লব এবং ১৮০৬ সালে নেপোলিয়নের জার্মাণী আক্রমণ তাঁর চিন্তাধারার ওপর প্রভাব ফেলে।

৬১.৩ হেগেলের রাষ্ট্রচিন্তার পরিচয়

হেগেলের রাষ্ট্রচিন্তার মধ্যে সার্বিক রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের যৌক্তিকতা সুচারুভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। হব্‌স্ ও ম্যাকিয়াভেলীর রাষ্ট্রচিন্তাতেও সার্বিক রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের কথা আছে। কিন্তু হেগেলের অনন্যতা এই যে তিনি সমগ্র বিষয়টিকে অধিবিদ্যক (metaphysical) দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপনা করেছেন।

প্লেটোর পর তিনিই প্রথম বিশেষকে (particular) গুরুত্বহীন বলেছেন। তাঁর মতে, বিশেষ তখনই অর্থবহ হয় যখন তা সমগ্রের (whole) সঙ্গে সংযুক্ত হয় এবং সমগ্রই (whole) হল যথার্থ, যুক্তিসিদ্ধ ও সত্য। হেগেল অধিবিদ্যক দিক থেকে সমগ্রের যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্রকে সমগ্র হিসাবে যুক্তিসিদ্ধ বলে প্রতিষ্ঠা করেছেন। হেগেলের রাষ্ট্রতত্ত্ব তাই মানুষের জগৎ ও জীবন সংক্রান্ত পরিপূর্ণ দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্বের আলোচনার আগে তাঁর দার্শনিক ভিত্তি জানা প্রয়োজন।

৬১.৩.১ হেগেলের রাষ্ট্রতত্ত্বের দার্শনিক ভিত্তি

দার্শনিক জন লকের দ্বারা সৃষ্ট ও হিউম দ্বারা পরিপূর্ণতাপ্রাপ্ত অভিজ্ঞাতাবাদী দার্শনিক ঐতিহ্যকে হেগেল প্রথমেই প্রত্যাখ্যান করেন। লকের মতে বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতাই হল জ্ঞান। অর্থাৎ বাস্তব বা reality আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মনন বা চিন্তা প্রক্রিয়াকে তিনি কোন গুরুত্ব দেন নি। যা ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করি তাই বাস্তব হলে মন বা চিন্তাপ্রক্রিয়ার কোন সৃজনমূলক ভূমিকা থাকে না। লকের মতই হিউম বলেন যে, আমরা ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান-লাভ করি। ফলে সমস্ত জ্ঞানই বিশেষ বিষয় সংক্রান্ত ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা। হিউমের মতে 'সমগ্র'-সংক্রান্ত কোন ধারণা সম্ভব নয়। মনন ও চিন্তার কাজ হল অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে গ্রহণ করা ও সংযুক্ত করা, নতুন কিছু সৃষ্টি করা নয়।

হেগেল এই মত গ্রহণ করেন নি। তাঁর মতে মানুষ চিন্তাশীল জীব। তাই সে শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বাস্তবকে স্বাধীন যুক্তিশীল চিন্তার ভিত্তিতে নির্মাণ করে এবং নিজের ধারণার সঙ্গে বহির্জগতের ঘটনার ঐক্যসাধন করে। তাঁর মতে, মানুষ ও বহির্জগত একত্রে একটি ঐক্যবদ্ধ সমগ্র। এজন্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জগতে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, অধিবিদ্যক (metaphysical) দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা প্রয়োজন।

হেগেলের মতে, জ্ঞাতা স্বাধীন এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞেয় বস্তুজগতকে অতিক্রম করে যুক্তির ভিত্তিতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বা চিন্তা ও বাস্তবের মধ্যে ঐক্যসাধন করে। তিনি আরও বলেছেন যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে

যে বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভ করি, তা প্রকৃত সত্তা নয়। বিশেষ বস্তুর অস্তিত্ব থেকে জ্ঞাতা যুক্তির সাহায্যে উচ্চতর সত্তায় পৌঁছয়। সেখানে বস্তুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে, অথচ তার উচ্চতর নির্যাস (essence) দেখা যায়। সেটাই বস্তুর প্রকৃত সত্তা।

হেগেল মনে করেন যে বস্তুর অস্তিত্বটাই বাস্তব নয়, বাস্তব হল যুক্তি দ্বারা সৃষ্ট। তাই বাস্তবই যুক্তিসিদ্ধ এবং যা যুক্তিসিদ্ধ তাই বাস্তব। যুক্তি শুধু যে বাস্তবকে সৃষ্টি করে তাই নয়। যুক্তি স্বাধীন এবং মানুষের ইতিহাসে যুক্তির বিকাশ ঘটেছে।

বিশেষ বস্তু থেকে যুক্তি কীভাবে বাস্তবকে নির্মাণ করে এবং অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) জ্ঞানকে অধিবিদ্যক (metaphysical) জ্ঞানে পরিণত করে তার উত্তর পাওয়া যায় হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির মধ্যে।

৬১.৩.২ দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি

হেগেলের দর্শনচিন্তার কেন্দ্রবিন্দু হল দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির সাহায্যে তিনি ভাবাবেগ, যুক্তি ও নৈতিকতাকে একত্রিত করেন। হেগেলের মতে প্রতিটি বস্তু, ভাব এমন কি ইতিহাসও দ্বান্দ্বিক পথে চলে। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি অনুসারে, প্রতিটি ধারণা বা ভাবের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগত সম্পর্ক আছে। পরস্পরবিরোধী সম্পর্কের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দেয় এবং তা থেকে একটা অস্থায়ী ঐক্য গড়ে ওঠে। এই ঐক্যের মধ্যে আবার পরস্পরবিরোধিতা দেখা দেয়, আবার সংঘর্ষ, আবার ঐক্য দেখা দেয়। এইভাবে দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি অবিশ্রান্তভাবে এগিয়ে চলে এবং এই অগ্রগতির ফলেই প্রকৃত সত্য উদঘাটিত হয়। বস্তুজগৎ, ভাবজগৎ সবকিছুই, তাঁর মতে, অতীন্দ্রিয় পরমাত্মার (spirit) দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় আত্মবিকাশের ফল।

যে কোন ভাব বা বস্তুকে—ভাব বা বস্তুটি যা এবং ভাব বা বস্তুটি যা নয় — এই দুদিক থেকে দেখা যায়। ইতিবাচক ও নেতিবাচক শক্তি থেকে বিরোধ এবং বিরোধ থেকে ঐক্য - এইভাবে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি চলে। হেগেল বস্তুটির বা ভাবের অস্তিত্বকে 'বাদ' (thesis), নেতিবাচক অস্তিত্বকে 'প্রতিবাদ' (anti-thesis) এবং প্রতিবাদের সঙ্গে বাদের সংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট ঐক্যকে 'সম্বাদ' বা সমন্বয় বলেন। সম্বাদ (synthesis) বা সমন্বয় চূড়ান্ত নয়। আজ যা সম্বাদ, কাল তা পরিবর্তিত হতে পারে। পরিস্থিতি ও চিন্তার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সম্বাদের ও পরিবর্তন ঘটে। প্রতিটি সম্বাদই চরম সত্য (Absolute Truth) অভিমুখে এগিয়ে চলে, কিন্তু কোন সম্বাদই চরম সত্য নয়। সম্বাদে বিপরীত শক্তিগুলির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উচ্চতর সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

জাতির সভ্যতাকে 'বাদ' বলা যায়। এই বাদ দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে এগিয়ে গিয়ে ইতিহাসে পরিণত হয়। দ্বান্দ্বিক নিয়মে সমাজ বিবর্তিত হওয়ার সময় নানা সমস্যা দেখা দেয়। এগুলির সমাধান থাকে

ইতিহাসের মধ্যে। ইতিহাস তাই জাতির সভ্যতার চরম বহিঃপ্রকাশ। ইতিহাস কখনও অযৌক্তিক হতে পারে না। হেগেলের মতে ইতিহাসের কাছে ব্যক্তির কোন স্বতন্ত্র ভূমিকা নেই। ব্যক্তি ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, শুধু ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। ইতিহাসের চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে রাষ্ট্রে।

৬১.৩.৩ রাষ্ট্রসংক্রান্ত ধারণা

হেগেলের দ্বন্দ্ববাদ অনুসারে অতীন্দ্রিয় পরমাত্মার বিরামহীন বিকাশ ঘটে এবং রাষ্ট্রের মধ্যে তার সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি দেখা যায়।

হেগেলের দর্শন মূলত সমগ্রসংক্রান্ত দর্শন এবং 'বিশেষকে তিনি অবাস্তব মনে করেন। 'বিশেষ' যখন যুক্তির সাহায্যে বিপরীত ভাবের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হয় তখনই প্রকৃত সত্তা ও সমন্বয়মূলক সমগ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। 'সমগ্রের' ধারণা চিন্তা ও বাস্তবজগতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির সাহায্যে এই সমন্বয়ের ধারণা দেখা দেয়। 'সমগ্র' সম্বন্ধে হেগেলের এই ধারণাই তাঁর রাষ্ট্র সংক্রান্ত বক্তব্যে পরিস্ফুট। রাষ্ট্র, তাঁর মতে, একটি ঐক্যবদ্ধ সমগ্র, যার মধ্যে সামগ্রিকতা ব্যক্তিদের বিভিন্ন স্বার্থ কাজ করে। রাষ্ট্র ব্যক্তিবর্গের বিভিন্ন, বিশেষ, পরস্পরবিরোধী স্বার্থের মধ্যে সামগ্রিকতা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে ও ব্যক্তিস্বার্থগুলিকে যুক্তিবহ সাধারণ স্বার্থের মধ্যে একীভূত করে। বিভিন্ন ব্যক্তিগত স্বার্থকে নিয়ন্ত্রিত করে রাষ্ট্রই সাধারণ স্বার্থে সকলকে চলতে বাধ্য করে। সাধারণ স্বার্থের এই ঐক্য ব্যক্তির একার পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়, রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব। রাষ্ট্র যুক্তির জয় সূচিত করে।

রাষ্ট্র সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে হেগেল দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন এবং বিশ্ব ইতিহাসে যুক্তির দ্বান্দ্বিক বিকাশের কথাও বলেছেন। চুক্তি মতবাদীদের মত তিনি রাষ্ট্রকে চুক্তির ফল মনে করেন নি। রাষ্ট্র হল বিশ্বচেতনা বা পরমাত্মার বিবর্তনের ফলে সৃষ্ট। মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে বাস করে এবং প্রথমে পরিবার গঠন করে। পরিবার হল সর্বপ্রথম মানবিক প্রতিষ্ঠান যার মধ্যে যুক্তির প্রকাশ দেখা যায়। পারস্পরিক ভালবাসার ভিত্তিতে গঠিত পরিবারকে (family) দ্বান্দ্বিক নিয়মে 'বাদ' বলা হয়। পরিবার তার সমস্ত চাহিদা পূর্ণ করতে পারে না বলে মানুষ 'পুর সমাজ' (Civil Society) গঠন করে। পুর সমাজকে প্রতিবাদের স্তর বলা যায়। পুর সমাজ পরস্পরবিরোধী স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত বলে বিপরীতমুখী শক্তির সংঘর্ষ পুরসমাজে প্রকট হয়ে দেখা দেয় এবং তীব্র প্রতিযোগিতা চলে। ফলে ঐক্য সম্ভব হয় না। শেষ পর্যন্ত সম্বাদের স্তর হল 'রাষ্ট্র'। রাষ্ট্রের মধ্যে পরিবার ও পুরসমাজের সুবিধাগুলি বহাল থাকে, অথচ উভয়ের থেকে উচ্চতর সংস্থায় পরিণত হয়। রাষ্ট্রের ঐক্য ও সামগ্রিকতার মধ্যেই যুক্তির জয় ঘটে। রাষ্ট্রের মধ্যে আছে সহযোগিতা ও সমন্বয় এবং প্রতিটি ব্যক্তির মুক্তি ও কল্যাণ। রাষ্ট্র একটি অতিমানবীয় নৈতিক সংগঠন, অন্যান্য সব সংস্থার ওপরে। রাষ্ট্র নিজেই নিজের উদ্দেশ্য। প্রতিটি ব্যক্তির রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের কাছে বশ্যতাস্বীকার ও আনুগত্য প্রদর্শন কর্তব্য। রাষ্ট্রের মধ্যে সে সার্বজনীনতা, যুক্তি ও স্বাধীনতা ভোগ করে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যক্তির কোন অধিকার সম্ভব নয়।

হেগেলের রাষ্ট্রতত্ত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি হল —

১। রাষ্ট্র একটি ঐশ্বরিক ধারণা। ঈশ্বরই পূর্ণতররূপে রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

২। ইতিহাস ও সভ্যতা রাষ্ট্রে চরম পরিণতি লাভ করেছে। তাই রাষ্ট্র সমগ্র এবং অংশের থেকে বড়। ব্যক্তিবর্গ রাষ্ট্রের অংশ। অংশ স্বভাবতই সমগ্রের অধীন। ব্যক্তিরা তাই রাষ্ট্রের অধীন।

৩। রাষ্ট্র নৈতিক আইন দ্বারা আবদ্ধ নয়। রাষ্ট্রই আইনের সৃষ্টিকর্তা ও নৈতিকতার বহিঃপ্রকাশ। নাগরিকদের নৈতিকতার মান রাষ্ট্রই স্থির করে। রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত সবাইকে মানতে হবে।

৪। হেগেল রাষ্ট্রকে জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করেছেন। জীবদেহের কোন অংশকে কেটে ফেললে তা অকার্যকর হয়ে পড়ে। তেমনি ব্যক্তিও রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হলে গুরুত্বহীন হয়ে যায়।

৫। নেতিবাচক ও ইতিবাচক শক্তির দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে যেমন প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হয়, তেমনি বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধে যে রাষ্ট্র সত্যের প্রতীক তার জয়লাভ ঘটে। তাই হেগেল যুদ্ধকে গৌরবের স্থান দেন এবং যুদ্ধের মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয় বলে মনে করতেন।

৬। সভ্যতা; সংস্কৃতি ইত্যাদির পেছনে কোন ব্যক্তি বিশেষের গুরুত্ব নেই। এ প্রসঙ্গে হেগেল জাতীয় রাষ্ট্রকেই তাৎপর্যপূর্ণ মনে করতেন। জাতীয় রাষ্ট্রই আইন, নৈতিকতা ইত্যাদি সৃষ্টি করতে পারে। জাতীয় রাষ্ট্রের বাইরে অন্য কোন কিছু তিনি কল্পনা করেন নি।

৭। সামাজিক চুক্তি (Social Contract) ও প্রাকৃতিক অধিকার (Natural Right) তত্ত্বের তিনি বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে, অধিকারের তালিকা স্থির করে রাষ্ট্র। তাই বলা যায় যে হেগেল প্রাকৃতিক অধিকারের বদলে সামাজিক অধিকারের ধারণাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

৬১.৩.৪ স্বাধীনতার ধারণা

হেগেলের মতে সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিপূর্ণ বিকাশ দেখা যায় জাতীয় রাষ্ট্রে। তাই স্বাধীনতার (freedom) -র পূর্ণ উপলব্ধি একমাত্র রাষ্ট্রেই সম্ভব। রাষ্ট্রকে শর্তহীনভাবে আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমেই ব্যক্তি স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। রাষ্ট্রই স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করতে পারে। রাষ্ট্রের মধ্যে যুক্তির (Reason) পূর্ণ প্রকাশ ঘটে। ব্যক্তির মধ্যে যুক্তির পূর্ণ প্রকাশ হলে ব্যক্তি বুঝতে পারবে যে রাষ্ট্র বা তার আইন ব্যক্তিস্বাধীনতা বিরোধী নয়। কিন্তু ব্যক্তি যদি যুক্তির দ্বারা না চলে তাহলে সে নিজেকে রাষ্ট্র থেকে স্বতন্ত্র বলে ভাবতে শিখবে। ফলে সে পরাধীন হয়ে পড়বে। অর্থাৎ হেগেলের মতে স্বাধীনতা ব্যক্তির যুক্তিহীন ইচ্ছা নয়, যুক্তিপূর্ণ ইচ্ছা। যুক্তিপূর্ণ ইচ্ছাদ্বারা পরিচালিত ব্যক্তি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে পরিপূর্ণ ভাবে স্বাধীন হতে পারে।

হেগেল স্বাধীনতাকে ব্যক্তির এলাকা থেকে সমাজের এলাকায় নিয়ে গেছেন। স্বাধীনতার ধারণা সামাজিক। স্বাধীনতাকে ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছা দ্বারা পরিচালিত মনে করলে সমাজের সবাই স্বাধীনতা

ভোগ করতে পারে না। সামাজিক কল্যাণকে নিজের কল্যাণ বলে ব্যক্তিকে ভাবতে হবে। তবেই ব্যক্তি স্বাধীনতা লাভ করতে পারবে। অর্থাৎ হেগেলের মতে ব্যক্তির স্বাধীনতা রাষ্ট্রের সার্বিক কল্যানের বেদীতে উৎসর্গীকৃত। উপযোগবাদী বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মত রাষ্ট্রের সামগ্রিক স্বার্থ ও ব্যক্তিস্বার্থের মধ্যে কোন সংঘর্ষ হতে পারে বলে হেগেল মনে করেন নি।

প্রাদেশিকতা, বিশৃঙ্খলা ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বিদীর্ণ জার্মাণীতে জাতীয় ঐক্যসৃষ্টির জন্য হেগেল শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্রের সমর্থক ছিলেন। ব্যক্তিস্বাধীনতা জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী ও নৈরাজ্যবাদের সৃষ্টি করুক তা তিনি চান নি। তাই তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বিরোধী ছিলেন।

৬১.৩.৫ পুরসমাজ সম্বন্ধে ধারণা

রাষ্ট্রের বাইরে ব্যক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, সত্তা বা মর্যাদা থাকতে পারে। হেগেল তা ভাবেন নি। কিন্তু তিনি সমাজকে অস্বীকার করেন নি। সর্বোচ্চ সংস্থা রাষ্ট্রের কাছে পৌঁছনোর মাধ্যম হিসাবে তিনি এস্টেট (Estate), নিগম (Corporation) বা সমিতি (association)-র কথা বলেছেন। তাঁর সময়ের জার্মাণীর এস্টেট, নিগম, সমিতি সম্বন্ধে তিনি উৎসাহী ছিলেন। তাই হেগেলের রাষ্ট্রচিন্তায় পুরসমাজের প্রসঙ্গ বাদ পড়ে নি। হেগেলের মতে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মাঝে পুরসমাজের অবস্থান এবং সকলেই ঐক্যসূত্রে মিলিত। রাষ্ট্র সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারী হলেও পুরসমাজকে বিলুপ্ত করে দিতে পারে না।

পুরসমাজের গঠনমূলক ভূমিকাকে হেগেল স্বীকার করেন। পুরসমাজ মানুষকে রাষ্ট্রের উপযোগী করে তোলে। সম্পত্তির মালিকানা নির্ধারণ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় কাজে নাগরিকের অংশগ্রহণ ও অন্যান্য নানা ক্ষেত্রে পুরসমাজ নেতৃত্ব দেয়। প্রয়োজন হলে পুরসমাজের দায়িত্বপালন বিষয়ে রাষ্ট্র পরামর্শ দিতে পারে। পুরসমাজ ভুল করলে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ জারী করতে পারে। অর্থাৎ পুর সমাজ পূর্ণভাবে স্বাধীন নয়। চূড়ান্ত পর্যায়ে রাষ্ট্র কর্তৃত্ব করতে পারে। রাষ্ট্রকে হেগেল পুরসমাজের অভিভাবক বলেছেন। রাষ্ট্র সামগ্রিক নৈতিকতার প্রতীক। কিন্তু রাষ্ট্রকেও পুরসমাজের ওপর নির্ভর করতে হয় । নাগরিকের মনে যুক্তিসিদ্ধতার ধারণা সৃষ্টি করা পুরসমাজের কাজ। তবে পুরসমাজের থেকে রাষ্ট্রের স্থান অনেক উচুঁতে। রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতিকে তিনি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। তাই মনে করেছিলেন যে পুরসমাজকে স্বাতন্ত্র্য দিলে রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ঠ হবে। তাই নাগরিকের চরিত্র গঠন ও অন্যান্য দায়িত্ব থাকলেও পুরসমাজের অবস্থান রাষ্ট্রের থেকে নীচে।

হেগেল-অঙ্কিত পুরসমাজকে বুর্জোয়া সমাজ বলা যায়। তিনি বলেছেন যে বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিকাশের ফলে পুরসমাজ দেখা দিয়েছে। মধ্যযুগে পুরসমাজ ছিল না।

৬১.৩.৬ সার্বভৌমিকতা ও শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে ধারণা

হেগেলের মতে সার্বভৌমিকতা 'চূড়ান্ত, চরম ও অবিভাজ্য। সার্বভৌম কর্তৃত্বকে কোনভাবে খর্ব করা যায় না। সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ হিসাবে রাষ্ট্র যা বলে তাই ঠিক। শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় নাগরিকদের সঙ্গে

সম্পর্কের ক্ষেত্রে নয়, অন্য দেশের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের কথাই চূড়ান্ত। অর্থাৎ রাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় দিক থেকে সার্বভৌম, রাষ্ট্র নিজের স্বার্থেই পরিচালিত হবে — অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও। রাষ্ট্রের স্বার্থ যখন বিঘ্নিত হবে তখন রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে। যুদ্ধের মধ্যে অন্যায় কিছু নেই। কোন নৈতিক আইন বা আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা সীমাবদ্ধ নয়। সার্বভৌমিকতা বলতে হেগেল রাজার সার্বভৌমিকতার কথা বলেন এবং জনগণের সার্বভৌমিকতার বিরোধিতা করেন। রাজা একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি কিন্তু জনগনের আকার সম্বন্ধে নির্দিষ্ট ধারণা করা যায় না। তাই জনগণের সার্বভৌমিকতাকে হেগেল বিভ্রান্তিজনক বলেছেন। জনগণের সার্বভৌমিকতার সঙ্গে সঙ্গে হেগেল গণতান্ত্রিক শাসনকেও অস্বীকার করেছেন। হেগেল রাজতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন। হেগেলের রাজা স্বৈরতান্ত্রিক নয়, সাংবিধানিক। তিনি শাসনতন্ত্র অনুসারে পরামর্শদাতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে শাসন চালান। রাজা শাসনতন্ত্র মেনে চলেন।

শাসনতন্ত্র কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে কিছু মানুষ দ্বারা প্রণীত একটি দলিল বলে হেগেল মনে করতেন না। মনুষ্যসৃষ্ট সবকিছুর উর্দ্ধে শাসনতন্ত্রের স্থান। ঈশ্বরের মতই তা নির্দিষ্ট সময়ের সীমায় আবদ্ধ নয়, দীর্ঘকাল ধরে এর অস্তিত্ব। একটা দেশের ঐতিহ্যের ওপর সংবিধান নির্ভর করে। অনেকে মনে করেন যে ব্রিটেনের অলিখিত সংবিধানকে সামনে রেখেই তিনি শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত বক্তব্যগুলি রেখেছেন।

৬১.৪ হেগেলের দৃষ্টিতে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক

ব্রিটেন ও ফ্রান্সে উদারনীতিবাদ ও অবাধ বাণিজ্য নীতি ব্যক্তিস্বাধীনতার ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিল। জার্মাণীতে সেভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতার ঐতিহ্য গড়ে ওঠে নি। বরং জার্মাণীতে রাষ্ট্র ছিল গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। হেগেল জার্মাণীতে উদারনীতিবাদের বিপক্ষে ছিলেন। ভাববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি রাষ্ট্র ও ব্যক্তির সম্পর্ক আলোচনা করেছেন।

হেগেলের মতে, একটি দেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও প্রতিষ্ঠান দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে ক্রমোচ্চ স্তরের দিকে এগিয়ে চলে। প্রতিষ্ঠান পরিপূর্ণতা পায় রাষ্ট্রে। প্রতিষ্ঠান সমূহের বিবর্তনের শেষ স্তর রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের কাছে ব্যক্তি যখন শর্তহীন আনুগত্য প্রকাশ করে তখন সে স্বাধীনতা অর্জন করে। রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যক্তির সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যাওয়াই স্বাধীনতা। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গিয়ে বা রাষ্ট্রকে অস্বীকার করে ব্যক্তি স্বাধীন হতে পারে না।

হেগেলের ধারণা অনুযায়ী ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক পরস্পর বিরোধী নয়। রাষ্ট্রকে ব্যক্তি নানাভাবে সাহায্য করে। আবার রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব স্বাধীনতার বিকাশের ক্ষেত্রে সহায়তা করে। কিন্তু ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য দাবি করতে বা রাষ্ট্রের বিরোধিতা করতে পারে না। বিশ্বচৈতন্যের জীবন্ত রূপ রাষ্ট্রের কাছে ব্যক্তিকে নিঃশর্ত আনুগত্য দেখাতে হবে।

বিশৃঙ্খল জার্মাণীতে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রয়োজন হেগেলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাই তিনি রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও ব্যক্তিস্বাধীনতাকে একত্র করেছেন, রাষ্ট্রের স্বার্থ ও ব্যক্তির স্বার্থকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন।

হেগেলের মতে স্বাধীনতা ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক। সমাজের বাইরে কোন স্বাধীনতা নেই। সমাজের মধ্যেই এগুলির অস্তিত্ব। সমাজের সঙ্গে একাত্ম হয়েই এগুলি উপভোগ করতে হয়।

৬১.৫ হেগেলের রাষ্ট্রচিন্তার সমালোচনা

হেগেলের রাষ্ট্রতত্ত্ব নানাভাবে সমালোচিত হয়েছে। হেগেলকে রাজনৈতিক চরম অবস্থানের ও রাষ্ট্রীয় স্বৈরতন্ত্রের প্রবক্তা বলে মনে করা হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জার্মাণীর একনায়কতান্ত্রিক শাসক হিটলার ও ইটালীর স্বৈরতান্ত্রিক শাসক মুসোলিনী রাষ্ট্রকে হেগেলীয় ধাঁচে সর্বশক্তিমান করে গড়ে তোলেন। এজন্য গণতান্ত্রিক লেখকরা হেগেলীয় রাষ্ট্রভাবনাকে দায়ী করেন।

হেগেল সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের বেদীতে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সম্পূর্ণ বলি দেন। ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা বিকাশের জন্য স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা হেগেল উপলব্ধি করেন নি। বরং রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সংহতির প্রশ্নকে তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। উদারনীতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র দার্শনিকদের মতে, ব্যক্তির জন্যই রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের জন্য ব্যক্তি নয়। হেগেল এই কথাটি উপলব্ধি করেন নি।

হেগেলের মতো রাষ্ট্রকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বা অনন্ত চৈতন্যের জীবন্ত রূপ বা পরমাত্মার প্রকাশ বলে মানতে গণতন্ত্রপ্রেমীরা কেউ রাজী হবেন না। এ জাতীয় বক্তব্য মানবসভ্যতার পক্ষে বিপজ্জনক।

হেগেলের নীতি ও সিদ্ধান্তের মধ্যে অসঙ্গতি লক্ষণীয়। তাঁর দ্বান্দ্বিক নীতির অর্থ হল, সমাজে কোন কিছুই চিরন্তন নয়। সমাজের বৈশিষ্ট্য হল পরস্পর বিরোধী শক্তির সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই সমাজ ক্রমশ প্রগতির দিকে অগ্রসর হয়। আবার তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে জাতীয় রাষ্ট্র হল অনন্ত সত্তা ও পরমাত্মার চরম বহিঃপ্রকাশ। এই বক্তব্য দ্বান্দ্বিক নীতির বিরোধী।

মূল্যায়ণ ঃ হেগেলের আমলে জার্মাণীর বুর্জোয়াদের উন্নতি ঘটে নি। অথচ ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বুর্জোয়ারা শিল্পবিপ্লব ও জাতীয় রাষ্ট্রীয় ঐক্যের আওতায় অর্থব্যবস্থায় নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। জার্মাণীর বুর্জোয়াদের প্রয়োজন ছিল দৃঢ়, ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির সাহায্যে হেগেল রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সংহতিকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপনা করে, রাষ্ট্রকে পরমাত্মার সর্বোচ্চ বহিঃপ্রকাশ বলে এবং রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদানের কথা বলে জার্মাণীতে বুর্জোয়াদের বিকাশের পথ উন্মুক্ত করেন। তাঁর অধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে। একথা সত্যি যে ব্যক্তিকে কোন গুরুত্ব না দেওয়ায় হেগেলের রাষ্ট্র হব্‌সের লেভিয়াথানে পরিণত হয়।

কিন্তু বিশৃঙ্খল ও অনৈক্যপীড়িত জার্মাণীতে হেগেলের সময়ে এই লেভিয়াথানেরই প্রয়োজন ছিল। হেগেল তাঁর সমকালীন জার্মান সমাজের বুর্জোয়াদের ঐতিহাসিক প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

৬১.৬ রাষ্ট্রচিন্তায় হেগেলের অবদান

হেগেলের রাষ্ট্রচিন্তা রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত। জার্মাণীতে নেপোলিয়নের যুদ্ধের পর যে অস্থিতিশীল অরাজক ও ঐক্যহীন অবস্থা দেখা গিয়েছিল তাই ছিল হেগেলের প্রেক্ষাপট। এই প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে হেগেল স্বভাবতই জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে গুরুত্ব দিয়েছেন, ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে নয়। জার্মাণীর বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি রাষ্ট্রকে ক্ষমতার প্রতীক মনে করেন। জার্মাণীর ঐক্য সাধনের ক্ষেত্রে হেগেলের ভূমিকা অনস্বীকার্য। জার্মান জাতীয়তাবাদেরও তিনি উদ্বোধন করেন। পরবর্তীকালে বিসমার্ক হেগেলের চিন্তাভাবনাকে কার্যকর করেন।

কার্ল মার্ক্সের ওপর হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির প্রভাব লক্ষণীয়। কিন্তু হেগেলের বিপরীত সিদ্ধান্তে মার্ক্স উপনীত হন একই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির ভিত্তিতে। হেগেলের মতে ভাবজগতে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত পরমাত্মায় উপনীত হবে। মার্ক্স জড়বাদী জগতে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে দেখান, সাম্যবাদ হল দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির শেষে পর্যায়। উভয়েই ইতিহাসে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেন এবং উভয়েই ইতিহাসকে স্থিতিশীল না ভেবে গতিশীল মনে করেছেন। কিন্তু হেগেলের কাছে 'সম্বাদ' (synthesis) হল পরমাত্মা, মার্ক্সের কাছে 'সম্বাদ' হল সাম্যবাদ।

ব্রিটিশ ভাববাদীরাও হেগেলের দ্বারা প্রভাবিত হন। ইংলন্ডে নতুন সামাজিক চিন্তা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে উদারনীতিবাদের ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সংশোধনের প্রয়োজন হয়েছিল। হেগেলের প্রভাবে গ্রীণ (Green) এই সংশোধন করেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা রাষ্ট্রের ন্যূনতম হস্তক্ষেপের কথা বলেন। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের ফলে ধনীদরিদ্রের ব্যবধান বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং অসন্তুষ্ট শ্রমিকদের চার্টিস্ট (chartist) আন্দোলনের ভয়াবহতা দেখে গ্রীণ অনুভব করেন যে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি প্রয়োজন। গ্রীণ হেগেলের দার্শনিক সমগ্রতার ভিত্তিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সঙ্গে রাষ্ট্রকর্তৃত্বের মিলন ঘটান। গ্রীণ ছাড়াও ব্রাডলে (Bradley) ও বোসাংকোয়ে (Bosanquet) এইভাবে হেগেল দ্বারা প্রভাবিত হন।

হেগেল রাষ্ট্রকে চুক্তির ফল না বলে বিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্ট মনে করতেন। তাঁর মতবাদ পরবর্তীকালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে গৃহীত হয়েছে।

তাছাড়াও, সমাজের সর্বাঙ্গীন কল্যান সাধনে রাষ্ট্রের গঠনমূলক ভূমিকাকে হেগেল গুরুত্ব দিয়েছেন। রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তার ওপর তিনি জোর দিয়েছেন।

হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাঁর মৃত্যুর ১৭০ বছর পর আজও জ্ঞানবিজ্ঞানের বহু শাখায় হেগেলের তত্ত্বের প্রভাব দেখা যায়।

৬১.৭ সারাংশ

হেগেল বিভিন্ন সময়ে জেনা বিশ্ববিদ্যালয়, হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। নুরেমবার্গের একটি স্কুলের হেডমাস্টার হিসাবেও কিছুদিন কাজ করেন। বিভিন্ন গ্রন্থ লিখে তিনি খ্যাতিলাভ করেন।

হেগেলের সমকালীন ঊনবিংশ শতকের জার্মাণী বৈদেশিক আক্রমণ, ওয়েষ্টকালিয়া চুক্তির ভিত্তিতে প্রথমে ২৩৪টি ভূখন্ডে বিভাজন এবং পরে ৪০টি ভূখন্ডে বিভাজন এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যুদ্ধবিবাদ ও সংঘর্ষের ফলে ঐক্যহীন ও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এই দুর্বলতার সুযোগে ফ্রান্স জার্মাণীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। ১৮১৩ সালে জার্মাণী ফ্রান্সের আধিপত্য থেকে মুক্ত হলেও রাজনৈতিক দিক থেকে বিভক্ত থেকে যায়। ঊনবিংশ শতকেও সেখানে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির অভাব ছিল। হেগেল শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ জার্মান রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনুভব করেন এবং তাঁর লেখনীর মাধ্যমে অধিবিদ্যক দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রীয় সর্বনিয়ন্ত্রণবাদের তত্ত্ব গড়ে তোলেন।

লক ও হিউমের অভিজ্ঞতাবাদ ও বিশেষ সংক্রান্ত জ্ঞানের তত্ত্বকে হেগেল বর্জন করেন। যুক্তিপূর্ণ চিন্তার দ্বারা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের জগতে উত্তীর্ণ হয়ে অধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে সমগ্রের জ্ঞানে উপনীত হওয়ার কথা বলেন। বস্তুর অস্তিত্বকে তিনি বাস্তব বলেন নি। তাঁর মতে বাস্তব হল যুক্তিদ্বারা সৃষ্ট। যে কোন বস্তু যা এবং যা নয় — এই দুদিক বা ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক থেকে দেখা প্রয়োজন। ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকের মধ্যে বিরোধ এবং পরে তা থেকে ঐক্য গড়ে ওঠে। ঐক্য বেশিদিন স্থায়ী হয় না। আবার তার নেতিবাচক শক্তি দেখা দেয় ও বিরোধের সৃষ্টি হয়। আবার ঐক্য সৃষ্ঠ হয়। ঐক্য বা সম্বাদ পরিবর্তনশীল, চূড়ান্ত নয়।

রাষ্ট্রকে হেগেল একটি ঐক্যবদ্ধ সমগ্ররূপে দেখেন। রাষ্ট্রে পরস্পরবিরোধী ব্যক্তিস্বার্থের সমন্বয় ঘটান হয়। রাষ্ট্র, হেগেলের মতে, বিবর্তনের ফল। মানুষ প্রথমে পরিবার গঠন করে। মানুষের সব চাহিদা পরিবারে পূর্ণ হয় না, তাই পুরসমাজ গড়ে তোলে। পুরসমাজে বিপরীত স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা চলে, ঐক্য থাকে না। বিবর্তনের শেষ স্তর রাষ্ট্রে ঐক্য ও সামগ্রিকতা দেখা যায়, আবার পরিবার ও পুরসমাজের সুবিধাগুলিও বজায় থাকে। রাষ্ট্রকে ব্যক্তি শর্তহীন আনুগত্য দেখাতে বাধ্য। কারণ রাষ্ট্রের মধ্যেই তার কল্যাণ নিহিত। ব্যক্তি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন দ্বারাই স্বাধীনতা ভোগ করে।

পুরসমাজকে হেগেল স্বীকার করেন। ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী স্তর হল পুরসমাজ। পুরসমাজ নাগরিককে রাষ্ট্রের উপযোগী হওয়ার শিক্ষা দেয়। রাষ্ট্র পুরসমাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে। রাষ্ট্রের স্থান পুরসমাজের ওপরে। তবে রাষ্ট্র ও পুরসমাজ একে অন্যের ওপর নির্ভর করে।

হেগেল রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতাকে চূড়ান্ত মনে করেন। সার্বভৌমিকতা-আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক এই

দুধরণের। সার্বভৌম রাষ্ট্র পরিচালিত যুদ্ধকেও তিনি সমর্থন করেন। তবে হেগেল জনগণের নয়, রাজার সার্বভৌমিকতার কথা বলেন। সার্বভৌম রাজা অবশ্যই সংবিধান অনুসারে চলবেন। সংবিধান, হেগেলের মতে, মনুষ্যসৃষ্ট দলিল নয়, দীর্ঘকাল ধরে বিবর্তনের ফল ও দেশীয় ঐতিহ্যের ওপর নির্ভরশীল।

রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও ব্যক্তিস্বাধীনতার মধ্যে তিনি রাষ্ট্রীয় ঐক্যকেই অগ্রাধিকার দেন। তাই ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের মতে চলতে বলেন।

হেগেলের রাষ্ট্রতত্ত্ব নানাভাবে সমালোচিত হয়েছে। তাঁকে স্বৈরতন্ত্রের প্রবক্তা বলা হয়। তিনি ব্যক্তিস্বাধীনতাকে রাষ্ট্রের বেদীমূলে বিসর্জন দেন বলেও মনে করা হয়। বিশৃঙ্খল ও দুর্বল জার্মাণীতে তখন শক্তিশালী রাষ্ট্রেরই প্রয়োজন ছিল। হেগেল বাস্তব প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে চিন্তাভাবনা করেছেন এবং শক্তিশালী রাষ্ট্রের তত্ত্ব নির্মান করে জার্মাণীতে বুর্জোয়াদের বিকাশকে সাহায্য করেন।

কার্ল মার্ক্স তাঁর দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হন, যদিও হেগেলের দ্বন্দ্ববাদ ছিল ভাবভিত্তিক আর মার্ক্সের দ্বন্দ্ববাদ ছিল জড়জগৎ ভিত্তিক। অক্সফোর্ড ভাববাদীরাও হেগেল দ্বারা প্রভাবিত হন।

হেগেলের তত্ত্বের প্রভাব আজকের যুগেও জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পরিলক্ষিত হয়।

৬১.৮ অনুশীলণী

১। হেগেলের সময়ের জার্মানীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

২। হেগেলের রাষ্ট্রতত্ত্বের দার্শনিক ভিত্তি ও দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি আলোচনা করুন।

৩। হেগেলের রাষ্ট্রসংক্রান্ত ধারণা আলোচনা করুন।

৪। হেগেলের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ও ব্যক্তির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

৫। হেগেলের রাষ্ট্রচিন্তার মূল্যায়ন করুন।

৬। রাষ্ট্রচিন্তায় হেগেলের দান পর্যালোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

(ক) হেগেলের মতে স্বাধীনতার অর্থ পরিস্ফুট করুন।

(খ) 'পূরসমাজ' সম্বন্ধে হেগেলের বক্তব্য কী ?

(গ) সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে হেগেলের ধারণা কী ছিল ?

(ঘ) শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে হেগেলের ধারণা ব্যক্ত করুন।

(ঙ) হেগেলের দুটি সমালোচনা লিখুন।

৬১.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১। R. G Gettel – History of Political Thought, (George Allen and Unwin Ltd., London, Cheaper Edition) 1932.

২। G. H. Sabine,– History of Political Theory, (Oxford & I. B. H. Publishing Co., Indian Ed.), 1961.

৩। Amal Kumar Mukhopadhyay– Western Political Thought, (K. P. Bagchi & Co., Calcutta), 1980.

৪। J. P. Suda – A History of Political Thought. (Modern) vol III Bentham to Marx, (K Nath & Co., Meerut Ciry - 2), 1972 - 3.

৫। সুভাষ সোম, রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস, ১ম খন্ড (ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা) ১৯৯৫.

৬। দেবাশীষ চক্রবর্তী, রাষ্ট্রচিন্তার ধারা, (সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, কলিকাতা) ১৯৯০।

৭। প্রাণগোবিন্দ দাস, রাষ্ট্রচিন্তার ইতিবৃত্ত, সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ১৯৮৬।

৮। অমৃতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস, (সুহৃদ পাবলিকেশন, কলিকাতা), ১৯৯৬।

একক ৬২ □ কার্ল মার্ক্স

গঠন

৬২.০ উদ্দেশ্য

৬২.১ প্রস্তাবনা

৬২.২ মার্ক্সের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সময়

৬২.৩ মার্ক্সবাদের উৎস

৬২.৪ মার্ক্সের রাষ্ট্রচিন্তার পরিচয়

- ৬২.৪.১ সমাজবিকাশের পাঁচটি স্তর
- ৬২.৪.২ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ
- ৬২.৪.৩ ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ
- ৬২.৪.৪ শ্রেণীসংগ্রাম তত্ত্ব
- ৬২.৪.৫ রাষ্ট্রের তত্ত্ব
- ৬২.৪.৬ বিপ্লবের তত্ত্ব
- ৬২.৪.৭ ধনতন্ত্র সম্বন্ধে বক্তব্য
- ৬২.৪.৮ উদারনৈতিক গণতন্ত্র সম্বন্ধে বক্তব্য
- ৬২.৪.৯ স্বাধীনতা সম্বন্ধে বক্তব্য
- ৬২.৪.১০ সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে বক্তব্য

৬২.৫ মার্ক্সের রাষ্ট্রচিন্তার সমালোচনা

৬২.৬ রাষ্ট্রচিন্তায় মার্ক্সের অবদান

৬২.৭ সারাংশ

৬২.৮ অনুশীলনী

৬২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৬২.০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য মার্ক্সের চিন্তাধারার সঙ্গে আপনার পরিচয় স্থাপন। এই এককে আপনাকে জানান হচ্ছে —

- মার্ক্সের জীবনী ও সময় সম্বন্ধে ধারণা

- মার্ক্সের রাষ্ট্রচিন্তার বিভিন্ন দিক —

  সমাজবিকাশের পাঁচটি স্তর, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, শ্রেণীসংগ্রামতত্ত্ব, রাষ্ট্রের তত্ত্ব, বিপ্লবের তত্ত্ব এবং ধনতন্ত্র, উদারনৈতিক গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে মার্ক্সীয় ধারণা
- মার্ক্সবাদের উৎস
- মার্ক্সবাদের সমালোচনা এবং
- রাষ্ট্রচিন্তায় মার্ক্সের অবদান

৬২.১ প্রস্তাবনা

অষ্টাদশ শতকে শিল্পবিপ্লবের পর পুঁজিবাদের উদ্ভব ঘটে। ঊনবিংশ শতকের আগেই পুঁজিবাদের শ্রেণীশোষণ, শ্রেণী বিরোধ ও ধ্বংসাত্মক উপাদান সমূহের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। কিছু চিন্তাবিদ এই সময় থেকে পুঁজিবাদের ভয়াবহ শোষণকে চিত্রিত করেন, কেউ বা শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি সহানুভূতি জানান, কেউ বা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যেই কাঠামোগত পুনর্গঠনের কথা বলেন, আবার কেউ কেউ পুঁজিপতি মালিকের হৃদয় পরিবর্তন ও সদিচ্ছার দ্বারা সুন্দর সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের প্রসঙ্গ তোলেন। কিন্তু কেউই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে তত্ত্বগতভাবে চ্যালেঞ্জ জানান নি। মার্ক্স প্রথম তত্ত্বগত ভিত্তিতে ধনতন্ত্রের পতন ও সমাজতন্ত্রের অনিবার্যতার কথা বলেন। মার্ক্স দেখান যে পুঁজিবাদ তার যাত্রাপথে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সংকটের সম্মুখীন হয় এবং পুঁজিবাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়। মার্ক্স পুঁজিবাদের সংকটের কারণগুলি বিশ্লেষণ করে তাঁর আলোচনাকে তাত্ত্বিক রূপ দেন। তাঁর তত্ত্ব কোথাও বাস্তবতা বর্জিত ছিল না। তিনিই সমাজ ও রাজনীতির প্রথম বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের নির্মাতা।

এখন আমরা মার্ক্সের জীবনী, সময় ও রাষ্ট্রচিন্তার ওপর আলোকপাত করব।

৬২.২ মার্ক্সের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সময়

কার্ল মার্ক্স ১৮১৮ সালের ৫ই মে জার্মাণীর রাইনল্যান্ডের ট্রিয়ের শহরে জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক্সের পিতা ছিলেন হাইকোর্টের একজন দক্ষ আইনজীবি। তাঁর আইনের জ্ঞান ও সততার জন্য সহকর্মীরা তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তাঁদের পরিবার ছিল ইহুদি। পরে মার্ক্সের পিতা খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হন। কিন্তু কোন ধর্মের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল না। মার্ক্সের মা ছিলেন একজন কঠোর ও গোঁড়া ডাচ ইহুদি।

মার্ক্স ১২ বছর বয়সে Trier Gymnasium এ পড়াশোনা শুরু করেন। তিনি গ্রীক, ল্যাটিন ও অঙ্কে ভাল ছিলেন। স্কুলের পাঠ সমাপ্ত করে তিনি ১৮৩৫ সালে বন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনশাস্ত্র পড়েন। সেখানে মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি জেনি ফন ওয়েষ্টফ্যালেন নামে এক অভিজাত বংশের সুন্দরী

বালিকার প্রেমে পড়েন এবং পরে তাঁদের বাড়ির অমতেই বিবাহ হয়। পরের বছর ১৮৩৬ সালে মার্ক্স বন বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়তে যান।

আইনের ছাত্র হলেও ইতিহাস ও দর্শনের প্রতি মার্ক্সের অনুরাগ ছিল। হেগেলের দর্শনের প্রভাবে বার্লিনে 'Young Hegelians' বলে এক গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল। মার্ক্স হেগেলের দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এই গোষ্ঠীর একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন।

১৮৪১ সালে মার্ক্স জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে "Differences between the Natural Philosophy of Democritus and of Epicurus" নামাঙ্কিত গবেষণা পত্র জমা দেন এবং ওই বছরেই ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। প্রাশিয়ার শিক্ষাবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট না থাকায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনায় যোগ দিতে পারেন নি। ১৮৪২ সালে তিনি 'Rheinische Zeitung' নামে একটি সংবাদপত্রের সম্পাদকের বৃত্তি গ্রহণ করেন। সাংবাদিক থাকাকালীন তিনি বুঝতে পারেন যে কল্পনাত্মক দর্শন দ্বারা বিভিন্ন সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। সামাজিক সমস্যার মধ্যে অর্থনৈতিক সমস্যার গুরুত্বও তিনি উপলব্ধি করেন। সমাজতন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য ১৮৪৪ সালে তিনি জার্মাণী ত্যাগ করে প্যারিস যান। তখন ফ্রান্সের সমাজতন্ত্রই প্রধান ও প্রবল ছিল। সেখানে তিনি প্রুধোঁ, লুই ব্ল্যাঙ্ক, কাবে ও বাকুনিনের দ্বারা প্রভাবিত হন। ফ্রান্সে তিনি এঙ্গেলসের সঙ্গে পরিচিত হন এবং উভয়ের বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। এঙ্গেলসের সাম্যবাদী চিন্তাধারা মার্ক্সকে প্রভাবিত করে এবং উভয়ে একসঙ্গে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিকাশে কাজ শুরু করেন।

মার্ক্স প্যারিসে থাকাকালীন যে সকল বিভিন্ন বিষয়ে লেখেন তা প্রাশিয়া সরকারকে উত্তেজিত করে এবং প্রাশিয়া সরকারের অনুরোধে ১৮৪৫ সালে ফরাসী সরকার মার্ক্সকে ফ্রান্স থেকে নির্বাসনের আদেশ দেয়। মার্ক্স তখন র‍্যাডিকাল বন্ধুদের নিয়ে ব্রাসেলসে যান এবং বন্ধু এঙ্গেলসের সঙ্গে সাম্যবাদের প্রচারে নমেন। ১৮৪৮ সালে তিনি ও এঙ্গেলস্ কমিউনিষ্ট লীগের জন্য যে ইস্তাহার লেখেন তার নাম 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেষ্টো' ('Communist Manifesto') । এটির সহজবোধ্য ভাষা, সাবলীল ব্যাখ্যা ও অনবদ্য শৈলী ইস্তাহারটিকে বিখ্যাত করে। এ ছাড়াও তাঁর 'দাস ক্যাপিটাল' ('Das Capital') গ্রন্থটিও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থগুলি হল 'The Poverty of Philosophy' (1847), 'The Critique of Political Economy' (1859), 'Inaugural Address of the International Workmen's Association' (1864), 'Value Price and Profit' (1865), 'The Civil War in France' (1870-71) এবং 'Critique of the Gotha Programme' (1875)।

মার্ক্সের কমিউনিষ্ট ম্যানিফেস্টোর বিপ্লবী মতবাদ বেলজিয়াম সরকারকে ভীত করে তোলে। তিনি ব্রাসেলস থেকে নির্বাসিত হন। তিনি ফরাসী বিপ্লবে অংশগ্রহণ করবেন বলে ফ্রান্সের দিকে যান। সেখানে তিনি দেরীতে পৌঁছন ও তখন বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। তিনি তখন জার্মাণীতে যান। সেখান থেকে নির্বাসিত হয়ে ইংলন্ডে যান। জীবনের শেষ ৩৪ বছর তিনি ইংলন্ডেই ছিলেন।

মার্ক্সের ব্যক্তিগত জীবন ছিল দুঃখকষ্টের। অর্থকষ্ট, নির্বাসন, শিশু সন্তানের মৃত্যু ইত্যাদি তাঁকে বেদনাজর্জর করেছে। দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে তাঁকে চলতে হয়। বন্ধু এঙ্গেলস সবসময় মার্ক্সকে অর্থসাহয্য করেছেন। ১৮৮৩ সালে লন্ডনে তাঁর জীবনাবসান হয়।

মার্ক্সের সময় ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছিল এবং সংগঠিত শক্তি হিসাবে শ্রমিক শ্রেণীর আবির্ভাব হয়েছিল। ধনতন্ত্র তার বিকাশের প্রাথমিক স্তরের পর নিজের অন্তর্দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ ছিল। ফলে ধনতন্ত্রের অস্তিত্বই বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল। ধনতন্ত্র কীভাবে তার ধ্বংস ডেকে আনে মার্ক্স তারই ব্যাখ্যা করেছেন। মার্ক্সের সময় পরিবর্তনের উপযোগী পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। মার্ক্স সামগ্রিকভাবে তত্ত্ব নির্মাণ করে সেই পরিবর্তনের উপযোগী শর্তগুলিকে চিহ্নিত করেছেন। এইভাবে সামগ্রিক তত্ত্ব নির্মাণ করলেও মার্ক্স নিজে দার্শনিকতার বেড়াজালে বন্দী ছিলেন না। তাঁর তত্ত্ব কখনই বাস্তব বর্জিত ছিল না। ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে অবরোহমূলক পদ্ধতি দ্বারা তিনি তাঁর সাধারণ তত্ত্ব নির্মাণ করেন।

৬২.৩ মার্ক্সবাদের উৎস

লেনিন মার্ক্সবাদের তিনটি উৎসের কথা বলেছেন — জার্মান দর্শন, ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ও ফরাসী সমাজবাদ। লেনিন বলেছেন যে জার্মাণী, ব্রিটেন ও ফ্রান্স ছিল উনিশ শতকের ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী। জার্মান দর্শন, ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ও ফরাসী সমাজবাদের শ্রেষ্ঠ বিষয়গুলি থেকে মার্ক্সবাদের জন্ম।

জার্মান দর্শন — হেস সর্বপ্রথম বলেন ক্রমবর্দ্ধমান সম্পদ ও দারিদ্র্যের মধ্যে বৈপরীত্য বা দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করলে সমাজবিপ্লব দেখা দেবে। ধনী দরিদ্রের পার্থক্যের ফলে সমাজ থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিলুপ্ত হবে এবং সমাজ প্রধান দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়বে। শ্রেণীবিভাজন ও সমাজবিপ্লবের কথাও তিনি বলেছেন। মার্ক্সীয় দর্শনের কিছু বীজ হেসের মধ্যে পাওয়া যায়। তবে হেস মার্ক্সের মত বিস্তৃত ইতিহাসনির্ভর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেন নি। ফয়েরবাখের বস্তুবাদ ও ধর্মসংক্রান্ত আলোচনা মার্ক্সকে প্রভাবিত করে। তিনি বলেছেন যে ধর্ম মানুষের সামর্থকে পঙ্গু করে দেয়। ধর্মকে সমাজ থেকে সরিয়ে দিলে অনেক সামাজিক অসাম্যের অবসান ঘটবে বলে ফয়েরবাখ মনে করেন। জার্মান দর্শন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে হেগেলীয় দর্শনে। হেগেল বলেন যে সমগ্র বিশ্ব একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ার অন্তর্গত এবং এই প্রক্রিয়াটি গতিশীল। একে তিনি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া বলেছেন। ইতিহাসে বিবর্তনের নানা পর্যায় পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, খন্ডিত নয়। হেগেল ইতিহাসকে অধিবিদ্যার বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে দ্বান্দ্বিকতার স্তরে উপস্থাপিত করেন। মার্ক্স তাঁর এই দ্বান্দ্বিকতাকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু হেগেলের কাছে ইতিহাস ভাববাদী ছিল, মার্ক্স ভাববাদকে সরিয়ে বস্তুবাদকে স্থাপন করেন। মার্ক্সের মতে, আগে বস্তু, তারপর তার থেকে জন্ম নেয় ভাব। জড়বাদী জগতের গতিশীলতা বিশ্লেষণের কাজে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির প্রয়োগ করে মার্ক্স চিন্তাজগতে আলোড়ন তোলেন। মার্ক্স হেগেলের

কাছ থেকে দ্বান্দ্বিকতার নীতি গ্রহণ করলেও তাঁর দ্বান্দ্বিকতা হেগেলের থেকে আলাদা।

<u>ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি</u> — শিল্পবিপ্লব প্রথমে ব্রিটেনে দেখা দেয়। তাই ব্রিটেনে প্রথম পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটে। পুঁজিবাদের বিশ্লেষণ করেন অ্যাডাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো ইত্যাদি অর্থনীতিবিদেরা ও হবস, লক ইত্যাদি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা। ঊনবিংশ শতকের প্রথমেই ব্রিটিশ পুঁজিবাদের শোষণ প্রকট হয়ে পড়ে। মার্ক্স কুফলগুলি বিচার করে পুঁজিবাদের ধ্বংসসাধনের জন্য লেখনী ধরেন। ব্রিটিশ লেখকদের ধনতন্ত্রের আলোচনা, মূল্যের শ্রমতত্ত্ব ও উদবৃত্ত মূল্যতত্ত্ব মার্ক্সকে প্রভাবিত করে।

<u>ফরাসী সমাজবাদ</u> ঃ পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে ফরাসী সমাজবাদের জন্ম। সেন্ট সাইমন, ফুরিয়ের, রবার্ট ওয়েন ইত্যাদি রচিত সমাজবাদের চিত্র মার্ক্সকে আকৃষ্ট করে, কিন্তু এঁরা কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করতেন। পুঁজিপতিদের কাছে আবেদন দ্বারা তাদের সদিচ্ছার মাধ্যমে তাঁরা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন। ধনতন্ত্র বিকাশের নিয়ম সম্বন্ধেও তাঁদের যথেষ্ট ধারণা ছিল না। ফরাসী সমাজবাদ তাই বাস্তবতাযুক্ত ছিল না। মার্ক্স বিজ্ঞানসম্মতভাবে ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দ্বারা শ্রমিক শ্রেণীর পরিচালিত বিপ্লবের মাধ্যমে ধনতন্ত্রের পতন ও সমাজতন্ত্রে উত্তরণের বাস্তব পথের সন্ধান দেন। শ্রেণীসংগ্রাম দ্বারাই সমাজের শোষণ মুক্তির কথা তিনি বলেন।

মার্ক্স তিনটি উৎস দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যে মার্ক্সবাদ সৃষ্টি করেন তা সম্পূর্ণ নতুন মতবাদ এবং তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি।

৬২.৪ মার্ক্সের রাষ্ট্রচিন্তার পরিচয়

মার্ক্সের আগে টমাস মুর, কাম্পানেল্লা, গ্রাকুস বাব্যুফ, সেন্ট সাইমন, চার্লস ফুরিয়ের, রবার্ট ওয়েন ও প্রুঁধোর চিন্তাধারার মধ্যে সমাজবাদী চিন্তাভাবনার প্রকাশ দেখা যায়। তবে তাঁদের আলোচনা বাস্তবসম্মত ছিল না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমালোচনা, পুঁজিবাদকে বর্জন এবং পুঁজিপতিদের মধ্যে সদিচ্ছার জাগরণ দ্বারা শোষণমুক্ত সহযোগিতামূলক সমাজবাদী সমাজের প্রতিষ্ঠার স্বপ্নের মধ্যেই তাঁদের সমাজবাদ সীমাবদ্ধ ছিল। সমাজবাদের বাস্তব রূপায়ন সংক্রান্ত সঠিক পথের সন্ধান তাঁরা দিতে পারেন নি। তাঁদের সমাজবাদের সঙ্গে বস্তুবাদের কোন যোগ ছিল না। মার্ক্স সমাজবাদকে কল্পনার জগৎ থেকে বার করে এনে বাস্তব ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। মার্ক্স ধনতন্ত্রের অসারতা ও বৈপরীত্য দেখিয়ে ধনতন্ত্রের পতন এবং তার ধ্বংসাবশেষ থেকে সমাজতন্ত্রের উত্থানের অনিবার্যতার কথা বলেন। মার্ক্সই প্রথম বলেন যে পুঁজিবাদের প্রগতির মধ্যেই তার পতনের বীজ উপ্ত থাকে। সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার পথেরও তিনি সন্ধান দেন। তাঁর মতে, শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রলেতারিয়েত একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজবাদ আসবে। তিনি সমাজবাদকে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতদের শ্রেণী সংগ্রামের ফসল বলে অভিহিত করেন। এখানে মার্ক্সের আলোচনা ইতিহাস নির্ভর ও বস্তুবাদ ভিত্তিক; কল্পনাবিলাস বা অধিবিদ্যামূলক নয়। তাই মার্ক্সীয় সমাজবাদকে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ বলা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে

তাঁর চিন্তাধারার ভিত্তিতে বড় ধরণের সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্বগত ভিত্তির নির্মাতা হিসাবে মার্ক্স স্মরণীয়।

৬২.৪.১ সমাজবিকাশের পাঁচটি স্তর

মার্ক্সের মতে, মানুষের সমাজে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান — এই তিনটি জিনিষ একান্তভাবে প্রয়োজন। এগুলি আসে উৎপাদন থেকে। শ্রম প্রয়োগ করে উৎপাদন তাই মানব সমাজের বৈশিষ্ট্য। উৎপাদন ব্যবস্থার দুটি দিক ঃ উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক। মানুষের শ্রম, যন্ত্রপাতি, জমি, কলকারখানা, পুঁজি সবকিছুকেই উৎপাদিকা শক্তি বলা হয়। উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে উৎপাদন সম্পর্ক বলে। এই সম্পর্কের ভিত্তিতে কেউ উৎপাদিকা শক্তির মালিক, অন্যেরা নয়। কেউ নয় তারা শ্রম বিক্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করে। উৎপাদিকা শক্তি আবার ঘন ঘন পরিবর্তনশীল। তাই আদিম মানুষের ভোঁতা পাথরের অস্ত্রের জায়গায় দেখা দিয়েছে আজকের উন্নত যন্ত্রপাতি ও কলকারখানা। উৎপাদন সম্পর্ক সে তুলনায় কম পরিবর্তনশীল। অথচ উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে ভারসাম্য না থাকলে উৎপাদন চালান যায় না। সংকট দেখা দেয়। তবে উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য শেষ পর্যন্ত গড়ে ওঠে। উৎপাদন সম্পর্ক পরিবর্তিত হয়ে এই ভারসাম্য দেখা দেয়। উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক উভয়ের পরিবর্তন হলে সমাজবিকাশের ক্ষেত্রেও নতুন স্তরের সৃষ্টি হয়। উৎপাদন সম্পর্ক ও শক্তির পরিবর্তনের ভিত্তিতে মার্ক্স ইতিহাসে পাঁচটি স্তরের কথা বলেছেন —

১। আদিম সাম্যবাদী সমাজ — এই যুগে উৎপাদন সম্পর্ক ও উৎপাদিকা শক্তির মধ্যে কোন বৈরিতা ছিল না। ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না। সামাজিক মালিকানা থাকায় শ্রেণী বিভাজনও ছিল না। সমগ্র উৎপাদনের মালিক ছিল সমাজ।

২। দাস সমাজ — এই যুগে দাসমালিক ও দাস এই দুই শ্রেণীতে সমাজ বিভক্ত হয়। দাসমালিকরা দাসদের পণ্যের মত কিনে নিয়ে উৎপাদনে নিযুক্ত করতেন। উৎপাদিত সামগ্রী সবটাই দাসমালিকের কাছে যেত। দাসেরা তার কোন অংশ ভোগ করতেন না। দাসদের কোন অধিকার ছিল না। মার্ক্স ইতিহাস থেকে তথ্য দিয়ে দেখিয়েছেন যে শ্রেণীসংগ্রাম দাসযুগেই শুরু হয়।

৩। সামন্ত সমাজ — এই যুগে সমাজে সামন্তপ্রভু জমিদার ও জমিতে শ্রমবিক্রয়কারী কৃষক এই দুইটি শ্রেণী ছিল। সামন্ত প্রভুরা কৃষকদের শ্রমের পরিবর্তে জমি বা মজুরী দিতেন। ভূমিদাস কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা দাসদের তুলনায় উন্নততর ছিল। তাদের কিছু অধিকারও ছিল। কিন্তু উৎপাদিকা শক্তির মালিকানা সামন্তপ্রভুদের হাতেই ছিল। তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে কৃষকদের বঞ্চিত করা হত। অসন্তুষ্ট কৃষক শ্রেণীর রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় উভয় শ্রেণীর মধ্যে বৈরী সম্পর্ক দেখা দেয় ও শ্রেণীসংগ্রাম শুরু হয়।

৪। পুঁজিবাদী সমাজ—শিল্প বিপ্লবোত্তর এই যুগে নতুন নতুন কলকারখানায় উৎপাদন শুরু হয় এবং তাদের মালিকানা ছিল মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি শ্রেণীর হাতে। অন্যদিকে গ্রাম থেকে এসে বহু লোক

কলকারখানায় শ্রমিক হিসাবে যোগ দেয়। স্পষ্টতই সমাজে দুটি পরস্পরবিরোধী শ্রেণী—পুঁজিপতি মালিক ও শ্রমিক—দেখা দেয়। উভয় শ্রেণীর বিরোধ তীব্রতর হয়ে শেষ পর্যন্ত তা শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লবের চেহারা নেয়। বিপ্লবের পর শ্রমিক শ্রেণীর জয়লাভ ঘটে এবং সমাজের নতুন চেহারা দেখা যায়।

৫। সমাজতান্ত্রিক সমাজ — এই সমাজে উৎপাদনের ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপসাধন করা হয় এবং উৎপাদনের সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে শ্রেণীবিভাজন ও শ্রেণীশোষণ বন্ধ হয়। সমাজের বৃহত্তর স্বার্থকে সমাজতন্ত্র প্রাধান্য দেয়। সমাজতন্ত্র সকলের জন্য সাম্য স্বাধীনতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করে এবং শাসক ও শোষক শ্রেণীর বিরোধেরও অবসান ঘটায়।

কার্ল মার্ক্স বলেছেন যে ঐতিহাসিকভাবে এই পাঁচটি স্তর বিভিন্ন সমাজে পর পর দেখা দেয়। কিন্তু কোন একটি বিশেষ সমাজে একটি স্তর নাও আসতে পারে। যেমন, সামন্ততান্ত্রিক রাশিয়ায় বিপ্লবের পর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে পুঁজিবাদের স্তর দেখা দেয় নি।

মার্ক্স আরও বলেছেন যে কোন একটি সমাজে দুটি বা তিনটি স্তর মিশ্রিত অবস্থায় থাকতে পারে। তবে যে স্তরটি প্রধান, তাই দিয়ে সেই সমাজকে চিহ্নিত করা হয়।

৬২.৪.২ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ

দ্বান্দ্বিকতা ও বস্তুবাদ এই দুইয়ের ওপর মার্ক্সীয় দর্শন দাঁড়িয়ে আছে। দ্বান্দ্বিকতা শব্দটি গ্রীক শব্দ dialego থেকে এসেছে, যার অর্থ হল তর্কবিতর্ক। হেগেল মনে করতেন যে, মানুষের চিন্তারাজ্যে ভাবের জগতে বৈপরীত্য থাকায় দ্বান্দ্বিক নিয়মে বিপরীত ভাবগুলির মধ্যে সংঘর্ষ হয় এবং সেই সংঘর্ষ থেকে সত্য বেরিয়ে আসে। সংঘর্ষ বা দ্বন্দ্ব তাই প্রগতির শর্ত। মার্ক্স দ্বান্দ্বিকতাকে ভাবের রাজ্য থেকে বার করে এনে বস্তুজগতে প্রয়োগ করেন এবং দ্বন্দ্ববাদ ও বস্তুবাদের মিলনে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ রচনা করেন, যা হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদ থেকে আলাদা। হেগেলীয় ভাবজগৎ বা কল্পনার রাজ্যের বদলে মার্ক্স বস্তুজগৎ বা বাস্তব জীবনকে বেশি প্রাধান্য দেন।

মার্ক্সীয় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা যায় ঃ

(i) মার্ক্সের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি অনুসারে বস্তুজগতের যাবতীয় ঘটনা ও বিষয়সমূহ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্র নয়, বরং তারা নিবিড়ভাবে সম্পর্ক যুক্ত।

(ii) প্রকৃতি স্থিতিশীল বা স্থির নয়। বস্তুজগতের সর্বত্র পরিবর্তন ঘটে এবং তার ফলে বিকাশ সম্ভব হয়।

(iii) দ্বান্দ্বিক নিয়মে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় আমূল রূপান্তর ঘটে। বস্তুর প্রাথমিক অবস্থাকে বাদ (thesis) এবং তার বৈপরীত্যকে প্রতিবাদ (anti-thesis) বলা হয়। বাদ ও প্রতিবাদের দ্বন্দ্বের ফলে সম্পূর্ণ নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয়, যাকে মার্ক্স সম্বাদ বলেন। সম্বাদ (synthesis) যখন

বিপরীত দুই শক্তির মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করে, তখন বস্তুর গুণগত রূপান্তর ঘটে যা জটিল ও ব্যাপক। সম্বাদ বা নতুন অবস্থা কিছুদিন পর বাদে পরিণত হয়, আবার প্রতিবাদ গড়ে ওঠে। আবার সম্বাদ সৃষ্ট হয়। এইভাবে দ্বান্দ্বিক নিয়মে সমাজ অগ্রসর হয়।

(iv) প্রকৃতির সমস্ত বস্তুর মধ্যে আভ্যন্তরীণ বৈপরীত্য দেখা যায়।

মার্ক্সীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ যান্ত্রিক বস্তুবাদ নয়। মার্ক্সের মতে গতি হল বস্তুর বৈশিষ্ট্য। এই গতি হল দ্বান্দ্বিক গতি। মার্ক্সীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ইতিহাসে মানবসমাজের বিবর্তনকে গুরুত্ব দেয়। আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি হল গতি, পরিবর্তন ও বিকাশ। মার্ক্সীয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের যাবতীয় আবিষ্কারকে স্বীকার করে।

এঙ্গেলস্ দ্বান্দ্বিকতার নিয়মগুলিকে তিনভাগে ভাগ করেছেন —

(i) পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনে রূপান্তরের নিয়ম — বস্তুর পরিমাণগত ও গুণগত উভয় প্রকার পরিবর্তন ঘটে। উভয় পরিবর্তন সম্পর্কযুক্ত এবং উভয়েই প্রগতির সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু গুণগত পরিবর্তনের ফলে বস্তুর সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটে, যা পরিমাণগত পরিবর্তনে ঘটে না। পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনে সমাজ যখন উপস্থিত হয়, তখন সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটে ও প্রগতি সাধিত হয়।

(ii) বৈপরীত্যের সংগ্রাম ও ঐক্যের নিয়ম — প্রতিটি বস্তুর অসংখ্য দিক আছে এবং এরা নিজেদের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়ায় লিপ্ত। মিথষ্ক্রিয়ায় ভিন্নমুখী কাজ ও গতিকে বৈপরীত্য বলা হয়। বৈপরীত্যের সংগ্রাম থেকে ঐক্য এবং ঐক্য থেকে প্রগতি ঘটে।

(iii) নেতির নেতিকরণ নিয়ম — কোন কিছু বর্জন করাই হল নেতি। পুরাতনের জঠর থেকে নতুন জন্মায়। পুরাতনের নেতির দ্বারাই নতুনের আবির্ভাব সম্ভব হয়। নতুন পুরাতনের থেকে অনেক বেশি সম্পূর্ণ ও উন্নত। মার্ক্সের মতে প্রকৃতি, সমাজ, ইতিহাস ও চিন্তার বিকাশের একটা সাধারণ নিয়ম হল নেতির নেতিকরণ। আদিম সাম্যবাদ থেকে দাস সমাজ, সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদের বিবর্তনের দিকে তাকালে দেখা যায় যে পূর্ববর্তী পর্যায় থেকে পরবর্তী পর্যায়ের আবির্ভাব ঘটেছে। প্রত্যেকটি পর্যায়ে আভ্যন্তরীণ বৈপরীত্যের ফলে পরবর্তী স্তর সৃষ্টি হচ্ছে। এইভাবে নেতির নেতিকরণ দ্বারা প্রগতি সাধিত হচ্ছে। পুঁজিবাদের পর একই পথে আসবে সমাজবাদ এবং তারপর সাম্যবাদ। সাম্যবাদে কোন বৈপরীত্য না থাকায় এর অবলুপ্তির প্রয়োজন হবে না।

৬২.৪.৩ ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

এঙ্গেলসের মতে প্রকৃতির জগতে ডারউইন যেমন বিবর্তনের নিয়ম আবিষ্কার করেন, তেমনি ইতিহাসের ক্ষেত্রে কৃতিত্ব হল মার্ক্সের। তিনি মানুষের জীবন ও ন্যূনতম প্রয়োজন এবং সামাজিক পরিবেশের সুগভীর আলোচনার ভিত্তিতে তাঁর ইতিহাসের ধারণা নির্মাণ করেন। পর্যবেক্ষণ, অতীতের

আলোচনা ও তৎকালীন বাস্তব ঘটনার ভিত্তিতে মার্ক্স তাঁর ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তত্ত্ব গড়ে তোলেন।

সমাজজীবনের অনুশীলনে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মূল নীতিসমূহের প্রয়োগকে বলা হয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টিকে সামাজিক সমস্যার সমাধানে ব্যবহার করার প্রয়োজনেই ইতিহাস সংক্রান্ত বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সৃষ্টি হয়েছে। কর্নফোর্থের মতে, বস্তুবাদী ইতিহাস চর্চা ইতিহাসকে বিজ্ঞানে পরিণত করেছে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ একদিকে ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করে এবং অন্যদিকে ইতিহাস কেমন করে সৃষ্টি করতে হবে তারও পথ দেখায়।

কর্নফোর্থ ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তিনটি মৌলিক নীতির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন —

(১) প্রকৃতির মত সামাজিক প্রক্রিয়াও নিয়মের অধীন। (২) সমাজের বস্তুগত জীবন সামাজিক ধ্যানধারণা ও প্রতিষ্ঠানের নির্ধারক। (৩) বস্তুগত অবস্থার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ধারণাগুলি বস্তুজীবনকে কিছুটা প্রভাবিত করে।

মার্ক্সের মতে ইতিহাস কতকগুলি ঘটনার সংকলনমাত্র নয়; ঈশ্বর-নির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা তথ্যের সমষ্টিও নয়। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সাহায্যে মার্ক্স দেখান যে ইতিহাস হল সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপের আবির্ভাব, বিকাশ ও পরিবর্তনের ফল। মানুষ কিভাবে উৎপাদন করছে, উৎপাদন করতে গিয়ে তাদের সম্পর্ক কী হচ্ছে তাই হল ইতিহাসের মূল কথা।

মার্ক্সের মতে, সমাজবদ্ধ মানুষ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান সংগ্রহের জন্য উৎপাদন পদ্ধতি গড়ে তোলে। উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক হল উৎপাদন পদ্ধতির দুটি দিক। উৎপাদন পদ্ধতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল —

(১) উৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমপরিবর্তনশীল ও উন্নততর হয়, স্থির নয়।

(২) উৎপাদিকা শক্তিতে আগে পরিবর্তন আসে এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উৎপাদন সম্পর্ক পরিবর্তিত হয়।

(৩) নতুন উৎপাদিকা শক্তি ও তদনুযায়ী উৎপাদন-সম্পর্ক পুরোনো ব্যবস্থা ধ্বংস হওয়ার পর সেই ধ্বংস থেকেই সৃষ্ট হয়।

উৎপাদন পদ্ধতিকে মার্ক্স সমাজের ভিত্তি বলেন। এই ভিত্তির ওপর নির্ভর করে উপরিকাঠামো। উপরিকাঠামোর অন্তর্গত হল সংস্কৃতি, রাজনীতি, ধর্ম, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন হলে উপরিকাঠামোতেও পরিবর্তন আসে। অর্থাৎ সমাজের আমূল পরিবর্তন হয়।

উৎপাদনপদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে মার্ক্স পাঁচটি আর্থসামাজিক রূপের কথা বলেছেন — আদিম সাম্যবাদী সমাজ, দাসসমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ, পুঁজিবাদী সমাজ ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ। আগেই এগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অনুসারে প্রতিটি যুগেই উৎপাদন সম্পর্কগুলি ঐ যুগের অবস্থার সঙ্গে

সামঞ্জস্যপূর্ণ। উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের ফলে পুরোনো সম্পর্ক বাতিল হয়ে যায়। দাসকে সামন্তযুগে প্রয়োজন হয় না। কৃষককে পুঁজিবাদের যুগে লাগে না। পুঁজিবাদের যুগে বড় বড় কলকারখানায় লাগে শ্রমিক। প্রতিটি যুগেই শ্রেণীশোষণ ও শ্রেণীসংঘর্ষ চলে। ফলস্বরূপ দেখা দেয় নতুন সমাজ। এইভাবে এসেছে দাসসমাজ, সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্র। ধনতন্ত্রে আসার পর শোষিত শ্রমিক শ্রেণী কিভাবে তাদের সকলের জন্য কল্যাণকর সমাজগঠন করবে মার্ক্স তার পথনির্দেশ করেছেন। তিনি শ্রমিক শ্রেণীকে বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের পতন ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র গড়ার জন্য আহ্বান জানান। সমাজতন্ত্র সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা দ্বারা সমাজের পুনর্নির্মাণ করে। সেখানে শ্রেণীশোষণ অবলুপ্ত হয়। শ্রমিক তার শ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার পায় এবং মালিক দ্বারা শোষিত হয় না।

৬২.৪.৪ শ্রেণীসংগ্রাম তত্ত্ব

মার্ক্স বিশ্ব ইতিহাসকে রাজায় রাজায়, জাতিতে জাতিতে যুদ্ধের ইতিহাস না বলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য বিরোধী দুই শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রামের ইতিহাস বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, শ্রেণীসংগ্রাম হল ইতিহাসের চালিকাশক্তি। আদিম সাম্যবাদের পর থেকে সমাজবিকাশের ইতিহাস, তাঁর মতে শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস।

সমাজে শ্রেণীর অস্তিত্ব বা শ্রেণীসংগ্রাম সম্বন্ধে মার্ক্সই যে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তা নয়। মার্ক্স নিজে লিখেছেন যে তাঁর আগেই বুর্জোয়া লেখকরা শ্রেণীসংগ্রামের ঐতিহাসিক বিকাশ ও শ্রেণীর অর্থনীতিগত অবস্থানের কথা বলেছেন। তবে তাঁর বিশেষ অবদান হল এই যে তিনিই প্রথম বলেন—

(১) ইতিহাসের বিশেষ পর্যায়ে উৎপাদনের বিকাশের সঙ্গে তাল রেখে শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে ও তার অস্তিত্ব বজায় থেকেছে।

(২) শ্রেণী সংগ্রামের শেষ স্তরে সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

(৩) সর্বহারার একনায়কত্ব পুঁজিবাদ ও শ্রেণীহীন সমাজগঠনের অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থা।

শ্রেণীর অর্থ কি তা মার্ক্স পরিষ্কারভাবে বলেন নি। লেনিনের মতে শ্রেণী হল পরস্পর থেকে পৃথক গোষ্ঠী, যাদের সামাজিক উৎপাদনের সঙ্গে এক ধরণের সম্পর্ক দেখা যায়।

মার্ক্স বলেছেন যে সমাজজীবনে শ্রেণী চিরকাল ছিল না। উৎপাদন ব্যবস্থার একটি বিশেষ স্তরে ব্যক্তিগত মালিকানাকে কেন্দ্র করে শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে। ব্যক্তিগত মালিকানার বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীরও বিলুপ্তি ঘটবে।

আদিম সাম্যবাদী স্তরে সামাজিক মালিকানা থাকায় শ্রেণী ছিল না। অসাম্য থেকে শ্রেণীর প্রথম প্রকাশ দাস সমাজে। দাসদের ওপর অত্যাচার করেছে দাসমালিক। এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও সংগ্রাম করেছে দাসেরা আর তার ফলে দাসসমাজের পতন ঘটেছে ও সামন্ততন্ত্র দেখা দিয়েছে। সেখানেও কৃষক

ও জমিদারের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম থেকে দেখা দিয়েছে পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদে নতুন শ্রেণী ও নতুন পদ্ধতির অত্যাচার দেখা দিল। বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত— এই পরস্পর বিরোপী শ্রেণীর মধ্যে তীব্র সংগ্রাম দেখা দিল। মার্ক্স প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামকে তীব্রতর করে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রলেতারিয়েতদের উদ্বুদ্ধ করেন। সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিকশ্রেণীর বা প্রলেতারিয়েতদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিবাদী শোষণ মুক্ত হবে। সমাজতন্ত্রে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার পর শ্রেণী ও শোষণের অবসান ঘটবে। সমাজ ধীরে ধীরে শ্রেণীহীন রাষ্ট্রহীন সাম্যবাদের দিকে অগ্রসর হবে।

৬২.৪.৫ রাষ্ট্রের তত্ত্ব

মার্ক্সের মতে রাষ্ট্র কোন প্রাকৃতিক প্রতিষ্ঠান নয়, ঐশ্বরিক প্রতিষ্ঠান নয়, চিরন্তন প্রতিষ্ঠানও নয়; রাষ্ট্র সমাজের সামগ্রিক স্বার্থেও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তাঁর মতে সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পূর্ণ আলাদা। সমাজ প্রাকৃতিক প্রতিষ্ঠান, কিন্তু রাষ্ট্র তা নয়। রাষ্ট্র হল মনুষ্যসৃষ্ট কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান। নৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য রাষ্ট্র গড়ে ওঠে নি, রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে সমাজের বিকাশের কোন এক স্তরে শ্রেণীদ্বন্দ্ব থেকে, সমাজের মুষ্টিমেয় মালিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার্থে। আদিম সাম্যবাদী সমাজে রাষ্ট্র ছিল না। ব্যক্তিগত সম্পত্তি শ্রেণীবিভাজন ও শ্রেণীশোষণ না থাকায় আদিম সাম্যবাদী সমাজে রাষ্ট্রের প্রয়োজন ছিল না। রাষ্ট্র প্রথম দেখা দেয় দাস সমাজে। দাসমালিকরা দাসদের ওপর তাদের কর্তৃত্বকে সুনিশ্চিত করার জন্য বলপ্রয়োগমূলক উৎপীড়ন ও নিপীড়নের যন্ত্র রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। পরবর্তী সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদে সেই রাষ্ট্র নতুনভাবে শ্রেণীশোষণ ও নিপীড়ন চালাতে থাকে। অর্থাৎ মার্ক্সের মতে, রাষ্ট্র হল শ্রেণীশোষণের যন্ত্র, এক শ্রেণী দ্বারা অন্য শ্রেণীকে শোষণের যন্ত্র। উৎপাদনের মালিক শ্রেণীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার প্রতিষ্ঠান হল রাষ্ট্র।

মার্ক্স বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিবাদকে পরাজিত করে শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়ত্ত করার কথা বলেন। বিপ্লবের পর শ্রমিকরা প্রলেতারিয়েত একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। এই স্তরেও রাষ্ট্র থাকবে। কিন্তু এতকাল রাষ্ট্র অল্প কিছু মালিকের স্বার্থে পরিচালিত হত, প্রলেতারিয়েত একনায়কত্ব পরিচালিত হয় অধিকাংশ শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে। প্রলেতারিয়েত একনায়কত্বের স্তরে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবার পর সাম্যবাদ দেখা দেয়। সাম্যবাদে সব অস্যম্য দ্রবীভূত হয় এবং শ্রেণী বিভাজন ও শ্রেণীশাসন বিলুপ্ত হয়। ফলে শ্রেণীশোষণের যন্ত্রস্বরূপ রাষ্ট্রেরও আর কোন প্রয়োজন থাকে না। রাষ্ট্রও আপনা থেকে বিলুপ্ত হয়। তাই মার্ক্সীয় রাষ্ট্রতত্ত্বকে রাষ্ট্র বিলুপ্তির তত্ত্ব বলা যায়।

৬২.৪.৬ বিপ্লবের তত্ত্ব

মার্ক্সবাদ বৈপ্লবিক মতবাদ। মার্ক্সবাদ মনে করে যে বিপ্লবের মধ্যেই সর্বহারা শ্রেণীর মুক্তি। মার্ক্সই প্রথম সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনে শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা উপলব্ধি করেছেন। বুর্জোয়া গণতন্ত্রবাদীরা বিপ্লবসংক্রান্ত মার্ক্সীয় ভাবনাকে নানাভাবে উপেক্ষা করেন। তাঁরা বিপ্লবকে হিংসাত্মক ও ভয়াবহ বলে

প্রচার করে বিপ্লবের অগ্রগতি বন্ধ করে দিতে চান। বিপ্লবের বদলে শান্তিপূর্ণ সাংবিধানিক পরিবর্তনের ওপর তাঁরা জোর দেন। বস্তুত, অভিধানে বিপ্লবকে আভ্যন্তরীণ কারণে সংগঠিত ও হিংসাত্মক পদ্ধতিতে সম্পন্ন সরকার বা সংবিধানের আকস্মিক পরিবর্তন বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

অপরদিকে মার্ক্সীয় মতে, বিপ্লব হল সেই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া যা এক সামাজিক রূপান্তর ঘটায়, যার মাধ্যমে এক শাসকশ্রেণী অপর শাসকশ্রেণী দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং যেখানে এই নতুন শাসকশ্রেণী পুরোনোর তুলনায় সামাজিক দিক থেকে প্রগতিশীল। মার্ক্সীয় মতে বিপ্লবের দুটি কারণ আছে — বিষয়গত ও বিষয়ীগত। বিষয়গত কারণ বৈপ্লবিক সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। নতুন উৎপাদিকা শক্তি ও পুরোনো উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্ব এই বিষয়গত অবস্থার সৃষ্ঠি করে। উৎপাদিকা শক্তি সর্বদাই পরিবর্তনশীল। উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের পথে প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্ক যখন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্ঠি করে তখনই আবির্ভাব হয় সমাজ বিপ্লবের। সমাজবিপ্লব ওই প্রতিবন্ধকতা দূর করে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশে সহায়তা করে। বিষয়ীগত অবস্থা বলতে বোঝায় সঠিক পথে বৈপ্লবিক শক্তিকে সংগঠিত করা, জনগণের বিপ্লবী মানসিকতা ও ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুতি, বিপ্লবে যোগ্য নেতৃত্বের উপস্থিতি ইত্যাদি। বিষয়ীগত উপাদান ছাড়া সমাজ বিপ্লব সফল হতে পারে না।

লেনিন বলেছেন যে বিপ্লব অর্ডারমাফিক হয় না, কোন বিশেষ মুহূর্তে ভেবেচিন্তে বিপ্লব হয় না। বিপ্লবের কারণগুলি ঐতিহাসিক বিকাশেব প্রক্রিয়ায় পরিপক্ক হয় এবং আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণগুলির সমাহারের মাধ্যমে নির্ধারিত মুহূর্তে প্রকাশ পায়। লেনিন আরও বলেছেন যে বিপ্লবী মতবাদ ছাড়া বিপ্লব হয় না এবং বৈপ্লবিক মতবাদ সম্পন্ন দলই হবে বিপ্লবের অগ্রবর্তী বাহিনী।

বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক ও অসমাজতান্ত্রিক দুধরণের হতে পারে। যে বিপ্লবের পর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বলে। যেমন, রাশিয়ার বিপ্লব বা চীনের বিপ্লব। যে বিপ্লবের পর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় না, কিন্তু পরিবর্তন ঘটে তাকে অসমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বলে, যেমন ইংলন্ডের গৌরবময় বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ইত্যাদি।

উভয় ধরণের বিপ্লবের মধ্যে মিল এই যে উভয় ক্ষেত্রেই পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রের মধ্যে অমিল অনেক বেশি। সেগুলি হল —

প্রথমত, অসমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগে ব্যক্তিগত মালিকানা, শ্রেণীর অস্তিত্ব ও শ্রেণীশোষণ থাকে। বিপ্লবের পরেও এগুলি থেকে যায়, অন্য নামে, অন্যভাবে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগে এগুলি থাকলেও পরে থাকে না। তাই গুণগত দিক থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নতুন ধরণের।

দ্বিতীয়ত, অসমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে ক্ষমতাচ্যুত বিদায়ী মালিক শ্রেণী ও নতুন মালিক শ্রেণীর মধ্যে সমঝোতা থাকে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে বিদায়ী বুর্জোয়া শ্রেণী ও নতুন মালিক শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে কোন সমঝোতা সম্ভব নয়।

তৃতীয়ত, অসমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নতুন অর্থনৈতিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে না। পুরোন সমাজের মধ্যে জাত অর্থনৈতিক সম্পর্কেই বিকশিত করে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণী যখন রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে তখন নতুন অর্থনৈতিক সম্পর্ক জন্মলাভ করে।

চুতর্থত, অসমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে বিপ্লব সম্পূর্ণ হওয়ার পর বিপ্লবীদের কাজও শেষ হয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে বিপ্লব শেষ হওয়ার পরও বিপ্লবীদের কাজ ফুরোয় না। নতুনভাবে সমাজ নির্মানের বৈপ্লবিক কাজ শুরু হয়।

পঞ্চমত, অসমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর রাষ্ট্র আরও শক্তিশালী হয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর রাষ্ট্র থাকলেও তার গুরুত্ব কমে যায়। ধীরে ধীরে সাম্যবাদের স্তরে উপনীত হওয়ার পর রাষ্ট্র পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়।

৬২.৪.৭ পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্র সম্বন্ধে বক্তব্য

মার্ক্সের চিন্তার বেশির ভাগটা জুড়ে আছে পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর বিশ্লেষণ। বার্ণস বলেছেন যে মার্ক্সের জীবনের একটা বড় অংশ পুঁজিবাদের অধ্যয়নে ব্যয়িত হয়েছে। তাঁর অধ্যয়নের বিষয় ছিল পুঁজিবাদী সমাজের গতির নিয়ম আবিষ্কার করা। পুঁজিবাদ বলতে মার্ক্স একটি উৎপাদনপদ্ধতিকে বুঝিয়েছেন যেখানে পুঁজিই বিভিন্নরূপে উৎপাদনের উপায় হিসাবে পরিগণিত হয় এবং একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর হাতে পুঁজির মালিকানা থাকে। পুঁজিবাদের যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে তিনি চিহ্নিত করেছেন সেগুলি হল —

(i) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ধারণার ভিত্তিতে পুঁজিবাদ উৎপাদনের উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা সমর্থন করে।

(ii) পুঁজিবাদে উৎপাদনের মালিকানা কেন্দ্রীভূত থাকে মুষ্ঠিমেয় পুঁজিপতিদের হাতে। সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিক শ্রেণী উৎপাদনের উপাদানের মালিকানা থেকে বঞ্চিত থাকে।

(iii) সহায় সম্বলহীন শ্রমিকরা জীবিকানির্বাহের জন্য পুঁজিপতিদের কাছে শ্রম বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। পুঁজিপতিরা কম দামে শ্রমশক্তি কেনে। পুঁজিবাদ হল পণ্য কেনাবেচার বাজার। শ্রমশক্তি এই বাজারের শ্রেষ্ঠ পণ্য।

(iv) নামমাত্র মজুরি দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীকে পুঁজিপতি শ্রেণী ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে। পুঁজিবাদে শ্রমিক শ্রেণী দ্বারা সৃষ্ট উদ্‌বৃত্ত মূল্য মালিক শ্রেণী আত্মসাৎ করে। শ্রমিক শ্রেণী শোষিত হয়।

(v) পুঁজিবাদী সমাজ শোষক পুঁজিপতি ও শোষিত শ্রমিক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

(vi) পুঁজিবাদে সমাজে মুনাফার জন্য পণ্য উৎপাদন করা হয়।

(vii) পুঁজিবাদে প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগের ফলে উৎপাদিকা শক্তি দ্রুত উন্নতিলাভ করে।

(viii) পুঁজিবাদ বাজার অর্থনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, ফলে উৎপাদনব্যবস্থার ওপর সরকার বা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থাকে না। ক্রেতাদের চাহিদা অনুসারে পণ্য উৎপাদন করা হয়।

(ix) পুঁজিবাদে থাকে অবাধ প্রতিযোগিতা।

(x) পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ভোগের জন্য নয়, বিক্রীর জন্য পণ্য উৎপাদিত হয়।

(xi) পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ার ওপর পুঁজিপতির নিয়ন্ত্রণ থাকে।

(xii) পুঁজিবাদী সমাজে রাষ্ট্র শ্রমিক শ্রেণীর ওপর পুঁজিপতিদের শোষণকে অব্যাহত রাখার যন্ত্র হিসাবে কাজ করে।

(xiii) পুঁজিবাদে অর্থনীতি ও উপরিকাঠামো অর্থাৎ শিক্ষাসংস্কৃতি, আদর্শ, ধর্ম সব কিছু পুঁজিপতিদের স্বার্থে পরিচালিত হয়।

ক্রমবিকাশের ধারায় পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদে উপনীত হয়। সাম্রাজ্যবাদী স্তরে পুঁজির কেন্দ্রীভবন ও একচেটিয়া কর্তৃত্ব সৃষ্ট হয়।

মার্ক্স মনে করেন যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যেই স্ববিরোধ বা দ্বন্দ্ব দেখা যায়। এই দ্বন্দ্ব থেকে সংকট সৃষ্ট হয়। সংকট থেকে পুঁজিবাদের অবসান ঘটে। সংকটগুলি হল —

(i) পুঁজিপতিরা তাদের মুনাফা বৃদ্ধির জন্য পুঁজির সঞ্চয় বাড়াতে থাকে। কিন্তু পুঁজির সঞ্চয় বৃদ্ধি পেলে মুনাফা হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(ii) পুঁজির সঞ্চয় বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন ব্যবস্থায় অধিক পরিমাণে উন্নততর যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। এগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয়। কিন্তু এগুলির ফলে শ্রমিক নিয়োগের সংখ্যা হ্রাস পায়। শ্রমিকদের শ্রমের তীব্রতাও বাড়ানো হয়। নতুন শ্রমিক কাজ পায় না। বহু শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। এসবের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও জনগণের ক্রয়ক্ষমতা কমে।

(iii) পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে বিরোধ দেখা যায়।

বহু যন্ত্রপাতি-সমন্বিত কলকারখানায় বহু শ্রমিক একসঙ্গে কাজ করে। ফলে উৎপাদন সামাজিক চরিত্রসম্পন্ন হয়। উৎপাদনের সামাজিকীকরণ হলেও উৎপাদিত পণ্যের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে। ফলে অসামঞ্জস্য দেখা দেয়।

(iv) সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হওয়ার পর পুঁজিবাদী মালিক ঔপনিবেশিক শাসন চালাতে থাকে। কিন্তু উপনিবেশগুলির অসন্তুষ্ট শোষিত মানুষরা মুক্তি আন্দোলনে যোগ দেয়।

পুঁজিবাদ সৃষ্ট শ্রমিকরা এবং সাম্রাজ্যবাদী শোষণে পীড়িত উপনিবেশের জনগণ পুঁজিবাদের পতন ডেকে আনে। শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম পুঁজিবাদকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যায়। উপনিবেশগুলির মুক্তিআন্দোলন সাম্রাজ্যবাদের পতন ঘটায়।

৬২.৪.৮ উদারনৈতিক গণতন্ত্র সম্বন্ধে বক্তব্য

উদারনীতিবাদীরা গণতন্ত্র বলতে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কথা বলেন — নির্বাচিত আইনসভা, সার্বজনীন ভোটাধিকার, রাজনৈতিক দল, চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ইত্যাদি যা শাসক ও শাসিতকে কাছাকাছি আনে। মার্ক্সের মতে রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রতিষ্ঠান হল উপরিকাঠামোর অংশ। উপরিকাঠামো নির্ভর করে উৎপাদনপদ্ধতির ওপর। পুঁজিবাদী উৎপাদনপদ্ধতি, যা প্রধানত বুর্জোয়াদের স্বার্থ চরিতার্থ করে, তা কখনই গণতান্ত্রিক নয়। তার ভিত্তিতে নির্মিত গণতান্ত্রিক উপরিকাঠামোও তাই গণতান্ত্রিক নয়। সরকারের রূপ যাই হোক না কেন, সেখানে বিত্তশালী পুঁজিবাদীরাই প্রাধান্য পায়, জনগনের স্বার্থ নয়। সার্বজনীন ভোটাধিকার, নির্বাচন ইত্যাদি সত্ত্বেও উদারনৈতিক গণতন্ত্র সমাজের সকলের অর্থনৈতিক স্বার্থকে চরিতার্থ করতে পারে না।

মার্ক্সের মতে গণতন্ত্র বলতে যদি সংখ্যালঘিষ্টের ওপর সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনকে বোঝায় তাহলে প্রলেতারিয়েত একনায়কত্ব উদারনৈতিক গণতন্ত্র অপেক্ষা অনেক বেশি গণতান্ত্রিক। মার্ক্সীয় বিশ্বাস অনুসারে প্রকৃত গণতন্ত্র তখনই সম্ভব হবে যখন সমাজের সকলের হাতে উৎপাদনের উপায়ের মালিকানা থাকবে এবং কেউ কারো দ্বারা শোষিত হবে না। সাম্যবাদকেই তিনি তাই প্রকৃত গণতন্ত্র মনে করেন।

৬২.৪.৯ স্বাধীনতা সম্বন্ধে বক্তব্য

সমাজের সামগ্রিক পটভূমিকায় মার্ক্স স্বাধীনতার ধারণাকে বিশ্লেষণ করেন। মার্ক্সীয় মতে, নিঃসঙ্গ অবস্থায় বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না। অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে সমাজের মধ্যে ব্যক্তি স্বাধীনতা লাভ করে।

স্বাধীনতা সম্বন্ধে মার্ক্সীয় ধারণা উদারনৈতিক বুর্জোয়া ধারণা থেকে আলাদা। বুর্জোয়া মতে স্বাধীনতা নেতিবাচক — রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অনুপস্থিতিকে বোঝায়। কিন্তু মার্ক্সীয় মতে স্বাধীনতা হল আত্মিক মুক্তি, যার অর্থ অন্যায় ও সংস্কারের ঊর্ধ্বে অবস্থান এবং যুক্তিসিদ্ধ পথে চলা। মার্ক্সবাদ তাই স্বাধীনতাকে ইতিবাচক অর্থে গ্রহণ করে।

মার্ক্সীয় স্বাধীনতা অর্থনৈতিক সাম্যকে গুরুত্ব দেয়। তাই মার্ক্সবাদ উৎপাদনের উপকরণ সমূহের ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপসাধন দ্বারা সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার কথা বলে। সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলে শ্রেণীর অস্তিত্ব ও শ্রেণীশোষণ থাকে না। অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠাও সম্ভব হয়। মার্ক্সীয় স্বাধীনতার তত্ত্ব অনুসারে সমাজের অধিকাংশের উন্নতিতেই সমাজের উন্নতি, অল্প কিছু বাছাই করা লোকের উন্নতিতে নয়। মার্ক্স আন্তর্জাতিক স্তরেও সব জাতির সাম্যে বিশ্বাসী। জাতিতত্ত্ব বা পশ্চিমের জাতিগুলির শ্রেষ্ঠত্ব এবং আফ্রিকা ও এশিয়ার জাতিগুলির নিকৃষ্টতা তত্ত্বে মার্ক্সবাদ বিশ্বাসী নয়। মার্ক্সবাদ স্বতঃস্ফূর্ততার বদলে পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে স্বাধীনতার পরিবেশ সৃষ্টির ওপর জোর দেন। মার্ক্সীয় স্বাধীনতার অর্থ হল বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা। মার্ক্সের ধারণানুযায়ী

সমাজতন্ত্র সকল প্রকার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য দূর করে এবং শোষণের অবসান ঘটিয়ে এমন একটা অর্থনৈতিক ভিত্তি ও উপরিকাঠামো প্রস্তুত করে যা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূল। মার্ক্সীয় মতে, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা কেবল সমাজতন্ত্র তথা সাম্যবাদী সমাজেই সম্ভব।

৬২.৪.১০ সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে বক্তব্য

মার্ক্সবাদী ব্যাখ্যা অনুসারে মানবসমাজের ইতিহাসের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের ধারায় সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী বলে মনে করা হয়। সমাজতন্ত্র হল পুঁজিবাদী সমাজ ও সাম্যবাদী সমাজের অন্তর্বর্তীকালীন একটি সমাজব্যবস্থা। পুঁজিবাদী সমাজের গর্ভ থেকেই সমাজতন্ত্রের জন্ম। সমাজতান্ত্রিক সমাজে পুঁজিবাদের পতন ঘটেছে। কিন্তু পুঁজিবাদ ধ্বংস হয় নি, আবার সাম্যবাদের জন্ম হয়েছে, কিন্তু সাম্যবাদ পরিণত হয় নি; ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ ও উদীয়মান সাম্যবাদের এক সংঘাতপূর্ণ অবস্থা। সমাজতন্ত্র আবার সাম্যবাদের প্রথম পর্যায়ও বলা যায়।

সমাজতন্ত্র প্রলেতারিয়েত শ্রেণীকে শাসকের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করে, পুঁজিবাদের ধ্বংসসাধন করে এবং সুসংহত ও উন্নততর সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের কর্মযজ্ঞ সম্পূর্ণ করার জন্য সমাজতন্ত্রে কঠোর সংগ্রামের প্রয়োজন হয়।

সমাজতন্ত্র অর্থব্যবস্থার মৌলিক রূপান্তর ঘটায়। এজন্য উৎপাদনের ব্যক্তিগত মালিকানার জায়গায় সামাজিক মালিকানা, জাতীয়করণ, সমবায় ইত্যাদি দ্বারা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপন করে। পরিকল্পিত পথে আর্থিক উন্নয়ন, উন্নত যান্ত্রিক ও কারিগরী পদ্ধতির প্রয়োগ, উৎপাদন পদ্ধতির প্রযুক্তিগত উন্নতি ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ নির্মাণ করা হয়।

সমাজতন্ত্রের সহায়ক সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ গড়ে তোলার ওপর সমাজতন্ত্র জোর দেয়। ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বার্থপর দৃষ্টিভঙ্গীর বদলে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর জোর দেওয়া হয়, জনগণের মধ্যে সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ সঞ্চার করা হয়।

সমাজতন্ত্র শাসনকার্যে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে উৎসাহ দেয়। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি অনুসারে সমাজতান্ত্রিক পরিচালনার ব্যবস্থা করে। সমাজতন্ত্র সাম্যবাদী সমাজে উত্তরণের পথ প্রশস্ত করে।

৬২.৫ মার্ক্সবাদের সমালোচনা

মার্ক্সীয় তত্ত্ব নানাভাবে সমালোচিত হয়েছে।

(১) সমালোচকদের মতে মার্ক্স অর্থনৈতিক উপাদানের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক উপাদান সব কিছুর নিয়ামক নয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক উপাদান নৈতিকতা, ধর্ম ইত্যাদিও গুরুত্বপূর্ণ। মার্ক্স এগুলির প্রভাবকে স্বীকার করেন নি।

(২) মার্ক্স দ্বন্দ্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, কিন্তু সমাজে দ্বন্দ্ব ছাড়াও সহযোগিতা আছে। সহযোগিতার কথা মার্ক্স বলেন নি।

(৩) ধনতন্ত্র সম্বন্ধে মার্ক্সের ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্য প্রমাণিত হয় নি। পৃথিবীতে ধনতন্ত্র এখনও বহাল তবিয়তে বিরাজ করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, জার্মাণীতে ধনতন্ত্র ভেঙ্গে পড়ে নি।

(৪) সমালোচকরা মনে করেন যে বিপ্লবের মত হিংসাত্মক পথ পরিহার করে শান্তিপূর্ণ পথে পরিবর্তনই শ্রেয়। ব্রিটেনে শান্তিপূর্ণভাবে সংস্কার আইন দ্বারা পরিবর্তন আনা হয়েছে।

(৫) সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কি ধরণের হবে যে সম্বন্ধে মার্ক্স পরিষ্কার কোন ধারণা দেন নি।

(৬) সমালোচকদের মতে মার্ক্সের প্রলেতারিয়েত একনায়কত্বের ধারণাটি ঠিক নয়। কারণ শ্রমিকশ্রেণীর নামে কমিউনিষ্ট দলই কার্যত একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করবে।

(৭) মার্ক্সের মতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার চরম উন্নতির পর্যায়ে সমাজতন্ত্র দেখা দেবে। মার্ক্সের এই ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্য হয় নি। আজও শিল্পোন্নত কোন দেশে বিপ্লব হয় নি।

(৮) বিংশ শতকের আশির দশক থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্রের পতনের পর সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সমালোচকরা আশাবাদী নন।

৬২.৬ রাষ্ট্রচিন্তায় কার্ল মার্ক্সের অবদান

মার্ক্সবাদের নানা সমালোচনা সত্ত্বেও একথা স্বীকার্য যে মার্ক্সবাদ বৈজ্ঞানিক ও বাস্তবসম্মত। কোটি কোটি নিপীড়িত শোষিত মানুষের কাছে মার্ক্সবাদ আশার বাণী। মার্ক্সবাদ তাদের শেখায় নিজেদের চেষ্ঠায় বিপ্লবের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্যের উন্নতি করতে। মার্ক্সই প্রথম ইতিহাসের বাস্তববাদী ধারণার ভিত্তিতে ভাবাদর্শের বদলে বৈষয়িক অবস্থানকে ইতিহাসের প্রধান চালিকা-শক্তিতে পরিণত করেন। আগেকার তত্ত্বে মানুষের কোন স্থান ছিল না। মার্ক্সই প্রথম মানুষের ভূমিকাকে গুরুত্ব দেন। মার্ক্সীয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মূল্য অনস্বীকার্য। মার্ক্সীয় শ্রেণী সংগ্রামতত্ত্ব শিল্পশ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করেছিল ও তাদের সংঘবদ্ধ করেছিল। মার্ক্স পুঁজিবাদের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেছেন। মার্ক্সই প্রথম সমাজতান্ত্রিক ভাবনাচিন্তাকে বৈজ্ঞানিক করে তোলেন। স্বাধীনতা সম্বন্ধে মার্ক্স নতুন ধারণার সৃষ্টি করেন। পুঁজিবাদের অমানবিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য তাঁর ব্যাকুলতা তাঁকে শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর বন্ধুতে পরিণত করেছে। শোষিত মেহনতী জনগণের প্রতি তাঁর গভীর মমতা ছিল। মার্ক্সের দ্বারাই সাম্যবাদ এক লক্ষ্যে পরিণত হয়। পৃথিবীর সমস্ত দেশের মেহনতি শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়ে মার্ক্স আন্তর্জাতিকতার স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন। দরিদ্র শোষিত মেহনতি মানুষের কাছে মার্ক্স অমর হয়ে থাকবেন।

৬২.৭ সারাংশ

মার্ক্স বন, বার্লিন ও জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। মার্ক্স জার্মাণী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম হয়ে শেষ জীবনের ৩৪ বছর ইংলন্ডে কাটান। তাঁর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ তাঁকে ঊনবিংশ শতকের অন্যতম খ্যাতিমান চিন্তাবিদ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে।

মার্ক্স পুঁজিবাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংকট থেকে পুঁজিবাদের পতন ও বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা দ্বারা শোষণ ও সংকট থেকে পরিত্রাণের কথা বলেন। তাঁর আগে যাঁরা সমাজতন্ত্রের কথা বলেছিলেন তাঁদের চিন্তাভাবনা বাস্তবসম্মত ছিল না। মার্ক্সই প্রথম দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ভিত্তিতে আলোচনা করেন এবং বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করেন।

মার্ক্স অতীত ইতিহাস আলোচনা করে মানুষের সমাজে পাঁচটি আর্থসামাজিক স্তরের কথা বলেন — আদিম সাম্যবাদী সমাজ, দাস সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ, পুঁজিবাদী সমাজ ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ।

মার্ক্সের তত্ত্বের ভিত্তি হল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। মার্ক্সের মতে প্রকৃতির সমস্ত বস্তুর মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা যায়। বস্তুজগৎ পরিবর্তনশীল। দ্বান্দ্বিক নিয়মে বস্তুর এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তর ঘটে। এই রূপান্তর সমাজের বিকাশ ও প্রগতি ঘটায়। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ইতিহাসে প্রয়োগকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলা হয়।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ একদিকে সমাজপরিবর্তনের ব্যাখ্যা করে, অন্যদিকে সকলের পক্ষে কল্যাণকর সমাজ কিভাবে নির্মিত হবে তার পথ দেখায়। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সাহায্যে মার্ক্স আদিম সাম্যবাদ থেকে দাস সমাজ, সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদে পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করেন এবং সমাজতন্ত্র নির্মাণের জন্য শ্রেণী সংগ্রামের কথা বলেন।

মার্ক্স তাঁর শ্রেণীসংগ্রামতত্ত্বের সাহায্যে শ্রেণীসংগ্রামকে ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দুরূপে চিহ্নিত করেন।

রাষ্ট্রকে মার্ক্স শাশ্বত প্রতিষ্ঠান মনে করেন নি। মালিক শ্রেণী দ্বারা রাষ্ট্র সৃষ্ঠ হয়েছে তাদের স্বার্থরক্ষা ও শ্রমবিক্রয়কারী শ্রেণীকে শোষণের জন্য। সমাজতন্ত্রে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলে শ্রেণী বিলুপ্ত হয়। শ্রেণীশোষণের যন্ত্র রাষ্ট্রও তখন বিলুপ্ত হয়।

মার্ক্স বিপ্লব বলতে সর্বাত্মক সামাজিক পরিবর্তনকে বোঝান। সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনে শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকার উপর মার্ক্স গুরুত্ব দেন। পুঁজিবাদী স্তরে শ্রমিক শ্রেণী পরিচালিত বিপ্লবই শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি ঘটায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

মার্ক্স পুঁজিবাদের শোষণ, উদারনৈতিক গণতন্ত্রের অসারতা ও স্বাধীনতার ধারণা সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন।

জার্মান দর্শন, বৃটিশ রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি এবং ফরাসী সমাজবাদকে মার্ক্সীয় রাষ্ট্রচিন্তার উৎস বলা যায়।

মার্ক্সীয় তত্ত্ব নানাভাবে সমালোচিত হলেও এটিই প্রথম বৈজ্ঞানিকভাবে সমাজসংক্রান্ত তত্ত্বগঠনের প্রচেষ্টা।

৬২.৮ অনুশীলনী

১। মার্ক্সের জীবনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

২। মার্ক্সীয় মতে সমাজবিকাশের স্তরগুলি আলোচনা করুন।

৩। মার্ক্সের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদটি আলোচনা করুন।

৪। মার্ক্সীয় ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার ওপর একটি টীকা লিখুন।

৫। মার্ক্সীয় শ্রেণীসংগ্রাম তত্ত্বটি আলোচনা করুন।

৬। মার্ক্সের রাষ্ট্রতত্ত্বটির ওপর একটি টীকা লিখুন।

৭। মার্ক্সীয় মতে বিপ্লবের কারণ কী ? সমাজতান্ত্রিক ও অসমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পার্থক্য করুন।

৮। মার্ক্সবাদের উৎসগুলি কী কী ?

৯। মার্ক্সবাদের সমালোচনাগুলি কী কী ?

১০। রাষ্ট্রচিন্তায় মার্ক্সের অবদান আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

ক) বস্তুবাদের অর্থ কি ?

খ) শ্রেণী বলতে কি বোঝায় ?

গ) রাষ্ট্র কি শ্রেণীশোষণের যন্ত্র ?

ঘ) বিপ্লবের অর্থ কি ?

ঙ) ধনতন্ত্র সম্বন্ধে মার্ক্স কি বলেছেন ?

চ) উদারনৈতিক গণতন্ত্র সম্বন্ধে মার্ক্সের ধারণা আলোচনা করুন।

ছ) মার্ক্সীয় মতে স্বাধীনতার অর্থ কি ?

৬২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১। R. G. Gettel, History of Political Thought, George Allen & Unwin Ltd., London, Cheaper Ed, 1932

২। G. H. Sabine, History of Political Theory, Oxford & IBH Publishing Co., Indian Ed, 1961.

৩। Amal Kumar Mukhopadhyay, Western Political Thought, K. P. Bagchi & Co., Calcutta, 1980

৪। J. P. Suda, A History of Political Thought (Modern) Vol III, Bentham to Marx, K. Nath & Co., Meerut Ciry-2, 1972-3.

৫। R. Miliband, Marxism and Politics, Oxford, 1977.

৬। সুভাষ সোম, রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৪।

৭। প্রাণগোবিন্দ দাস, রাষ্ট্রচিন্তার ইতিবৃত্ত, সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৮৬।

৮। অমৃতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৯৬।

একক ৬৩ □ জন স্টুয়ার্ট মিল

গঠন

৬৩.০ উদ্দেশ্য

৬৩.১ প্রস্তাবনা

৬৩.২ মিলের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সময়

৬৩.৩ মিলের রাষ্ট্রচিন্তার পরিচয়

৬৩.৩.১ হিতবাদসংক্রান্ত ধারণা

৬৩.৩.১.১ হিতবাদী দর্শনের সংশোধন সমূহ

৬৩.৩.২ স্বাধীনতাসংক্রান্ত ধারণা

৬৩.৩.৩ গণতন্ত্রসংক্রান্ত ধারণা

৬৩.৩.৪ জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকারসংক্রান্ত ধারণা

৬৩.৩.৫ মিল ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ

৬৩.৩.৬ মিল ও সমাজতন্ত্রবাদ

৬৩.৪ মিলের রাষ্ট্রচিন্তার সমালোচনা

৬৩.৫ মিলের রাষ্ট্রচিন্তার মূল্যায়ন

৬৩.৬ সারাংশ

৬৩.৭ অনুশীলনী

৬৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৬৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল জন স্টুয়ার্ট মিলের রাষ্ট্রচিন্তার সঙ্গে আপনার পরিচয়স্থাপন। এই প্রসঙ্গে আপনাকে জানানো হচ্ছে —

- মিলের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সময় সম্বন্ধে ধারণা
- মিলের রাষ্ট্রচিন্তার বিভিন্ন দিক — হিতবাদ, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার সংক্রান্ত ধারণা

- ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদী মিলের পরিচয়
- মিলের রাষ্ট্রচিন্তার সমালোচনা
- মিলের রাষ্ট্রচিন্তার মূল্যায়ন

৬৩.১ প্রস্তাবনা

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ইংলন্ডে যে শিল্পবিপ্লব ঘটে তার ফলে ইউরোপীয় সমাজে সামন্তবাদবিরোধী ও কর্তৃত্ববাদ বিরোধী স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ধারণার সৃষ্টি হয়। সামন্তসমাজের স্বৈরাচারী রাজকীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী সীমিত রাষ্ট্রের তত্ত্ব গড়ে ওঠে। শিল্পবিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে ইউরোপে যে পুঁজিপতি শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছিল তারা ব্যবসাবাণিজ্য প্রসারের স্বার্থে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করে। অ্যাডাম স্মিথ অবাধ বাণিজ্যনীতির সমর্থন করেন। স্মিথের অর্থনৈতিক তত্ত্বের সহযোগী রাষ্ট্রতত্ত্ব হিসাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সূচনা হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন জে. এস. মিল।

মিলের তত্ত্বে বিভিন্ন ধরণের চিন্তাভাবনা দেখা যায়। প্রথম জীবনে তিনি গুরু বেন্থামের মত হিতবাদী ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি হিতবাদের সমালোচকে পরিণত হন। মূর্খ হয়ে সুখে সময় কাটানোর থেকে শিক্ষিত হয়ে দুঃখে জীবন কাটানোকে ভাল মনে করতেন। মিল একদিকে ব্যক্তিস্বাধীনতার পূজারী, অন্যদিকে কল্যাণকর রাষ্ট্রের সমর্থক। তিনি গণতন্ত্র ও নারী জাতির ভোটের পক্ষে হলেও অনুন্নত দেশে গণতন্ত্র ঠিক নয় মনে করতেন।

৬৩.২ মিলের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সময়

জন স্টুয়ার্ট মিল ছিলেন জেমস মিলের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি ১৮০৬ সালের ২০শে মে লন্ডন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা জেমস মিল পুত্রকে নিজের মতাদর্শে গড়ে তোলার জন্য ছেলেবেলা থেকেই পুত্রকে নানা বিষয়ে শিক্ষাদান করতে থাকেন। পড়াশোনার মধ্যেই জে. এস. মিলের ছেলেবেলা অতিবাহিত হয়। তিন বছর বয়সে গ্রীক ও সাত বছর বয়সে ল্যাটিন ভাষা আয়ত্ত করেন। আট বছর বয়সে গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যে তিনি পান্ডিত্য অর্জন করেন। এই সময় তিনি প্লেটো, হেরোডোটাস, সক্রেটিস ইত্যাদি দার্শনিকদের চিন্তাভাবনার সঙ্গে পরিচিত হন। এগারো বছর বয়সে তিনি রোমান সরকারের ইতিহাস অধ্যয়ন শুরু করেন এবং বার বছর বয়সে তিনি দর্শনের ওপর পড়াশোনা করেন। হোমার থেকে শুরু করে অ্যারিস্টটল পর্যন্ত সকলের চিন্তাভাবনা তিনি মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করেন। তেরো বছর বয়সে অ্যাডাম স্মিথ ও রিকার্ডোর রাজনৈতিক অর্থবিদ্যার সঙ্গে পরিচিতি লাভ করেন। অঙ্কশাস্ত্র, রসায়নবিদ্যা, অর্থনীতি ও দর্শনশাস্ত্রে গভীর জ্ঞান লাভ করেন। বাল্যকাল তাঁর কঠোর অধ্যয়নে অতিবাহিত হয়। খেলাধূলা বা আমোদ-প্রমোদের সুযোগ পান নি। ষোল বছর বয়সে

আনুষ্ঠানিক পড়াশোনা সমাপ্ত করে তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীতে যোগ দেন। ১৮৫৬ সালে তিনি কোম্পানীর মুখ্য প্রশাসনিক আধিকারিক পদে উন্নীত হন। ১৮৫৮ সালে তিনি চাকুরী থেকে অবসর নিয়ে সাহিত্যসাধনায় ব্রতী হন।

১৮৬৫ সালে তিনি র‍্যাডিকাল সদস্য হিসাবে নির্বাচনে দাঁড়ান এবং জয়ী হয়ে পার্লামেন্টের সদস্য হন। পার্লামেন্টে তিনি তিনবছর ছিলেন। ১৮৬৮ সালে পুনরায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচনে পরাজিত হন। পার্লামেন্টের সদস্য থাকাকালীন তিনি বিভিন্ন জাতীয় সমস্যাবলী, যেমন নারীদের ভোটাধিকার, কৃষকদের অবস্থা, ইত্যাদি পার্লামেন্টে তোলেন এবং আমূল সংস্কারের ওপর জোর দেন। তিনি স্থানীয় সমস্যার থেকে জাতীয় সমস্যাকে বেশি গুরুত্ব দিতেন। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর দলীয় নেতাদের বিরক্তির সৃষ্টি করে। পার্লামেন্টের সদস্য হিসাবে মিল খুব সফল হন নি।

বাল্যকাল থেকে গভীর অধ্যয়নের ফলে মিল বৌদ্ধিক দিক থেকে খুবই উন্নতি লাভ করেন। প্রথম জীবনে মিল পিতার মতই বেন্থামের শিষ্য ও ভক্ত ছিলেন। আমূল সংস্কারবাদ প্রচারের জন্য তেরো বছর বয়সে 'হিতবাদীসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। মিলের পিতা এইটাই চেয়েছিলেন। পরে তিনি কোলরিজ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, গ্যেটে দ্বারা প্রভাবিত হন এবং নতুন মানুষে পরিণত হন। বেন্থামের দর্শনে যে সব প্রশ্নের উত্তর পান নি, সেই সব উত্তর এঁদের চিন্তার মধ্যে খুঁজে পান।

কুড়ি বছর বয়সে মিল স্নায়ুতন্ত্রের দুর্বলতা দ্বারা আক্রান্ত হন ও মানসিক অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন। বন্ধু মিসেস হ্যারিয়েট টেলরের প্রেরণা ও উৎসাহে তিনি পাঁচ বছরের মধ্যেই সুস্থ হয়ে ওঠেন। অনেক পরে ১৮৫১ সালে তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর হ্যারিয়েট টেলরকে বিয়ে করেন। তাঁদের বিবাহিত জীবন খুব শান্তিপূর্ণ ছিল। ১৮৫৮ সালে হ্যারিয়েট মারা যান। ১৮৭৩ সালে মিলের মৃত্যু হয়।

জন স্টুয়ার্ট মিল লেখক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। নীতিশাস্ত্র, অর্থনীতি, তর্কশাস্ত্র, রাজনীতি, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল System of Logic, Principles of Political Economy, On Liberty, Representative Government, Utilitarianism, The Subjection of Women, Autobiography, Women Suffrage, Parliamentary Reforms ইত্যাদি।

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে ইংলন্ডে যে শিল্পবিপ্লব ঘটে তার ফলে ইংলন্ডের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১০০ বছরের মধ্যে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতকে ইংলন্ডে শিল্প পুঁজিবাদ প্রভূত উন্নতি লাভ করে। বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের সম্পদ বৃদ্ধির পর এই সময় সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উচ্চশ্রেণী হিসেবে তাদের স্বার্থসংরক্ষণে তৎপর হয়। তারা নতুন ধরণের মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির উদ্ভাবন দ্বারা তাদের স্বার্থকে সমাজের স্বার্থ হিসাবে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করে। সামাজিক শ্রেণী হিসাবে তাদের উৎকৃষ্টতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণব্যবস্থায় প্রাধান্য বিস্তারে তারা উৎসাহী হয়। ইংলন্ডে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র সাধারণ জনগণকে রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করেছিল। সেই সঙ্গে বুর্জোয়ারা

এই ধারণা প্রচারেও উৎসাহী হয় যে তারাই প্রতিভাবান সংখ্যাগরিষ্ঠ অভিজাতশ্রেণী এবং তারাই দক্ষতার সঙ্গে সমাজকে শাসন করার ক্ষমতাযুক্ত। শিল্পবিপ্লবের সাফল্যের পর ইংলন্ডের বুর্জোয়াদের এই প্রয়োজনগুলি মিলের তাত্ত্বিক আলোচনার প্রেক্ষাপট নির্মাণ করে।

৬৩.৩ মিলের রাষ্ট্রচিন্তার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মিলের রাষ্ট্রচিন্তায় রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ববাদের বিরোধিতা, ব্যক্তির স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ববিকাশের অনুকূল পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা, অসাধারণ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ সুযোগসুবিধা, সংখ্যাগরিষ্ঠ গণতন্ত্রের শাসনে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও শ্রেষ্ঠত্ববাদের কথা আছে। মিল ছিলেন স্বাধীনতার সমর্থক, গণতন্ত্রের পূজারী, কর্তৃত্ববাদের সমালোচক, শ্রেষ্ঠত্ববাদ প্রবক্তা এবং জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের প্রবক্তা।

তবে মিল নৈরাজ্যবাদী ছিলেন না। রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রকে স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বাধা দ্রর করা বা নেতিবাচক যেমন বলেছেন তেমনি আবার ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও নৈতিক উন্নতির জন্য সদর্থক বা ইতিবাচক দায়িত্বও রাষ্ট্রের ওপর অর্পণ করেছেন।

৬৩.৩.১ হিতবাদসংক্রান্ত ধারণা

মিল অল্প বয়সে পিতা জেমসের মত বেন্থামের হিতবাদী তত্ত্বের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। বেন্থামের মত তিনিও সুখকে মানুষের আচরণের মূল লক্ষ্য মনে করতেন। তিনি আরও বলেছেন যে সুখের অপর নাম আনন্দ বা যন্ত্রণার অনুপস্থিতি এবং সুখের অভাব হল যন্ত্রণা বা দুঃখ। হিতবাদ বা উপযোগবাদ অনুসারে যে কাজ সুখ বৃদ্ধি করে সেই কাজই সঠিক এবং সেই কাজই ব্যক্তির পক্ষে কল্যাণকর। তাই প্রত্যেক ব্যক্তির লক্ষ্য হল সুখবৃদ্ধি দ্বারা নিজের কল্যাণবৃদ্ধি। সমাজের সকলে যদি এইভাবে নিজের কল্যাণবৃদ্ধি করে তাহলে সমাজের সর্বাধিক মঙ্গল সাধিত হবে।

কিন্তু অল্পদিন পরেই মিল হিতবাদের ধারণায় পরিবর্তন ঘটান। মিল তাঁর "Utilitarianism" পুস্তকে হিতবাদী দর্শকের পুনর্নির্মাণ করেন এবং তাতে এমন কিছু সংযোজন করেন যা বেন্থামের হিতবাদের বিরোধিতা করে।

৬৩.৩.১.১ হিতবাদী দর্শনের সংশোধন সমূহ

বেন্থাম আনন্দের শুধুমাত্র পরিমাণগত দিকের কথা বলেন। মিলের মতে, আনন্দের পরিমাণগত দিক শুধু দেখলে চলবে না, আনন্দের গুণগত দিকও দেখা প্রয়োজন। গুণগত দিক থেকে কোন আনন্দ উচ্চস্তরের, কোন আনন্দ নয়। তিনি বলেছেন যে সন্তুষ্ট শূকর অপেক্ষা অসন্তুষ্ট মানুষ অনেক ভাল, সন্তুষ্ট মূর্খ অপেক্ষা অসন্তুষ্ট সক্রেটিস হওয়া অনেক ভাল। অর্থাৎ মিল নিম্নমানের আনন্দের থেকে উচ্চমানের আনন্দকে বেশি পছন্দ করেন। বেন্থামের মত সব আনন্দকে সমান বলেন নি। আনন্দের

গুণগত দিককে প্রাধান্য দেওয়ায় ফলে আনন্দের উৎস বা তার মান গুরুত্বলাভ করে, আনন্দের পরিমাণ নয়। ফলে বেন্থামের ধারণা পুরোপুরি উল্টে যায়। বেন্থামের সর্বাধিক সুখের বদলে মিল সর্বোত্তম মানের সুখের কথা বলেন। মিলের মতে তাই ব্যক্তি আনন্দের দাস নয়, সংস্কৃতিবান ও মহৎ উদ্দেশ্যযুক্ত ও উচ্চতর সুখের সন্ধানী।

দ্বিতীয়ত, বেন্থামের মতে, ব্যক্তিগত আনন্দই ব্যক্তিকে সর্বাধিক সুখ দেয়। মিল বলেছেন যে যৌথ বা সমষ্টিবাচক আনন্দ ব্যক্তিকে সর্বাধিক সুখ প্রদান করে।

তৃতীয়ত, মিল ব্যক্তিগত সুখের ওপর নৈতিক উদ্দেশ্যকে স্থাপন করেন। তিনি বলেছেন যে নেকড়েদের সমাজে নেকড়েত্ব আর সাধুদের সমাজে সাধুত্বই হল হিতবাদী নীতি। তিনি সমস্ত সমাজেই সাধুত্ব প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন। বেন্থাম কোন নৈতিক উদ্দেশ্য মানেন নি।

চতুর্থত, বেন্থাম ব্যক্তিকে একটি বিচ্ছিন্ন একক মনে করতেন। মিল ব্যক্তিকে প্রবল সামাজিক প্রবৃত্তিসম্পন্ন হিসাবে দেখেছেন। বেন্থাম ব্যক্তিকে আত্মকেন্দ্রিক ও অহংবাদী মনে করতেন। মিল ব্যক্তির আত্মকেন্দ্রিকতার সঙ্গে তার পরার্থপরতারও স্বীকৃতি দেন।

পঞ্চমত, মিল নারীজাতির আইনসঙ্গত অধিকারের কথা বলেন এবং নারীজাতির ভোটাধিকারের সমর্থন করেন। বেন্থামের হিতবাদী দর্শনে নারীজাতির জন্য বিশেষ অধিকারের ব্যবস্থা ছিল না।

ষষ্ঠত, মিল সর্বোৎকৃষ্ঠ বুদ্ধিজীবিদের জন্য একাধিক ভোটাধিকারের কথা বলেন। এখানেও বেন্থামের বক্তব্য থেকে তাঁর বক্তব্য আলাদা।

সপ্তমত, বেন্থামের মতে সেই রাষ্ট্রকে সুখী রাষ্ট্র বলা হয় যেখানে সর্বাধিক সংখ্যক জনগণের সর্বাধিক সুখ সম্ভব হয়। সুখের মানদন্ড হল উপকার পাওয়া। অর্থাৎ সুখী রাষ্ট্র সবথেকে বেশিসংখ্যক ব্যক্তির উপকার করে। মিল সুখী রাষ্ট্রের বদলে নৈতিক রাষ্ট্রের কথা বলেছেন। যে রাষ্ট্রে ব্যক্তির মানসিক ও নৈতিক উন্নতি হয়, ব্যক্তির স্বাধীনতা থাকে সেই রাষ্ট্রই তাঁর কাছে কাম্য।

ম্যাক্সে বলেছেন যে মিল ব্যক্তিগতভাবে বেন্থাম ও জেমস মিল প্রবর্তিত হিতবাদ বা উপযোগিতাবাদকে শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু উন্মুক্ত মন নিয়ে চারপাশের অবস্থা দেখে বুঝেছিলেন যে বেন্থামীয় উপযোগিতাবাদ তৎকালীন সমাজের সমস্যা সমাধানে সক্ষম নয়। তাই তিনি উপযোগবাদের সংশোধন করেন।

৬৩.৩.২ স্বাধীনতা সংক্রান্ত ধারণা

মিল ব্যক্তির ব্যক্তিত্ববিকাশের জন্য স্বাধীনতাকে অপরিহার্য মনে করতেন। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ না ঘটলে সে নিজের বা সমাজের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধিতে সফল হবে না। তাই তিনি স্বাধীনতাকে

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে যেমন দেখেছেন, সমাজের সার্বিক কল্যাণের কথাও তেমনি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছেন।

মিল বলেছেন যে ধর্মবোধ, নীতিশাস্ত্র, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে যে কোন প্রকার মত পোষণ ও জনসমক্ষে প্রচার করার স্বাধীনতা ব্যক্তির থাকবে। ব্যক্তিকে যতটা সম্ভব নিয়ন্ত্রণবিহীনভাবে চলার সুযোগ দিতে হবে। যেহেতু ব্যক্তির স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করার চরম ক্ষমতা রাষ্ট্রের, তাই তিনি ব্যক্তির আত্মবিকাশের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপকে সীমাবদ্ধ করার কথা বলেন। তাঁর এই মত তাঁকে উদারনীতিবাদী ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তাবিদ হিসাবে চিহ্নিত করে। মিল পরিষ্কার ভাবে বলেছেন ব্যক্তির দুধরণের আচরণ আছে — নিজসম্বন্ধীয় ও পরসম্বন্ধীয়। প্রথমটি শুধুমাত্র ব্যক্তির নিজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং দ্বিতীয়টি পর বা অন্য লোকের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ। ব্যক্তির নিজসম্বন্ধীয় কাজের ক্ষেত্রে মিল কোন নিয়ন্ত্রণই বরদাস্ত করেন না।

পরসম্বন্ধীয় কাজের ক্ষেত্রে অবশ্য নিয়ন্ত্রণের কথা বলেন। কারণ অন্যদের স্বাধীনতাকেও মর্যাদা দিতে হয়। কিন্তু ব্যক্তি যতক্ষণ তার নিজের ভালোর জন্য কার্যরত এবং অন্যের কোন ক্ষতিসাধনের প্রচেষ্টা করে না, ততক্ষণ সে নিজে যেভাবে বোঝে সেভাবে তার চলার স্বাধীনতা থাকবে। ব্যক্তির বিবেকের, চিন্তার মতপ্রকাশের বা সংঘগঠনের স্বাধীনতাকে মিল গুরুত্ব দেন।

ব্যক্তির স্বাধীনতার ওপর নিয়ন্ত্রণ শুধুমাত্র রাষ্ট্রের কাছ থেকে আসে না, সমাজের কাছ থেকেও আসে। সমাজের আচার আচরণ, প্রথা, রীতিনীতি, ঐতিহ্য, ইত্যাদিও ব্যক্তির স্বচ্ছন্দ বিকাশকে ব্যাহত করতে পারে এবং স্বাধীনতা হরণ করতে পারে। রাজনৈতিক স্বৈরতন্ত্রের মত সামাজিক স্বৈরতন্ত্রের হাত থেকেও ব্যক্তিকে রক্ষা করা প্রয়োজন। তিনি পীড়নমূলক সামাজিক আচারআচরণ, প্রথা, ইত্যাদির অপসারণের কথা বলেন।

মিল কিন্তু নিয়ন্ত্রণবিহীন স্বাধীনতার কথা বলেন নি। সকলের প্রয়োজনে সমাজ ও রাষ্ট্র স্বাধীনতা খর্ব করতে পারে। কোন ব্যক্তির কাজ অন্যের ক্ষতি সাধন করলে রাষ্ট্র সেই ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। মিল ছিলেন বাস্তববাদী চিন্তাবিদ। চরম স্বাধীনতা যে সমাজের পক্ষে কাম্য নয়, তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য ব্যক্তির স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করার পক্ষে তিনি মত দেন। তবে তিনি একথাও বলেন যে রাষ্ট্র তার নিয়ন্ত্রণমূলক ক্ষমতা যথেচ্ছভাবে প্রয়োগ করবে না।

৬৩.৩.৩ গণতন্ত্রসংক্রান্ত ধারণা

মিল গণতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন। তবে গণতন্ত্রকে সফল করার জন্য এবং গণতন্ত্র যাতে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ববিকাশের পক্ষে সহায়ক হয় তার জন্য মিল কিছু সংস্কারের কথা বলেছেন। তিনি নারী জাতির ভোটাধিকার, সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ও বহুভোট (plural voting) প্রবর্তনের সুপারিশ করেন।

মিল সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনকে মাঝারি মাপের মানুষের শাসন মনে করতেন। দেশের উচ্চ ধরণের

প্রগতি নিশ্চিত করার জন্য তিনি প্রতিভাবান সংখ্যালঘুদের স্বার্থসংরক্ষণের ওপর জোর দেন। এদের কাছ থেকেই সমাজ উপকৃত হয়। এই উচ্চ ধরণের ব্যক্তিদের সমাজে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য মিল কিছু ব্যবস্থার কথা বলেছেন। সেগুলি হল সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ও বহু ভোট ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় উচ্চ গুণ যুক্ত ব্যক্তিরা গণতান্ত্রিক সরকারে বেশি করে অংশগ্রহণ করতে পারে। সরকার গঠনের প্রশ্নকে শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ, অজ্ঞ ও অশিক্ষিত জনগণের ওপর ছেড়ে দিতে মিল রাজী ছিলেন না। মিল তাই সাম্যের বদলে বৈচিত্রের কথা বলেছেন। মিলের গণতন্ত্র তাই এলিটিস্ট ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তবে নারীর ভোটাধিকারের কথাও তিনি বলেছেন।

মিল বলেছেন যে আইনসভার সদস্যরা যাতে যথাযোগ্য হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। এজন্য ভোটদাতাদের অবশ্যই যোগ্য হতে হবে। তিনি মনে করতেন যে দেশের অধিকাংশ মানুষ অজ্ঞ হলেও তাদের শাসন পরিচালনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখলে অবিচার হবে। তারা গণতন্ত্র সম্বন্ধে উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে। গণতন্ত্রের স্বার্থে তাদের উপযোগী করে গড়ে তোলা হবে সরকারের কাজ। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন যাতে স্বৈরাচার হয়ে না দাঁড়ায় তার সম্বন্ধেও তিনি সচেতন ছিলেন।

মিলের মতে গণতান্ত্রিক সরকারের কাজ হল জনগণের মধ্যে সদাচার ও আদর্শবোধ সঞ্চারিত করা। অসৎ জনগণ কোন ভাল সরকার তৈরী করতে পারে না। আবার ভাল সরকার আদর্শ ও সদাচার থেকে জনগণকে বঞ্চিত করতে পারে না। এক্ষেত্রে মিলের ওপর প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের প্রভাব দেখা যায়।

মিল গণতন্ত্রকে দুভাগে ভাগ করেছেন — সত্য ও মিথ্যা গণতন্ত্র। সত্য গণতন্ত্রে প্রতিভাবান জ্ঞানীগুণীরা জনগণের মঙ্গলের জন্য সরকার পরিচালনা করেন। সামানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ও বহুভোট ব্যবস্থা এবং নীতিবোধ এই গণতন্ত্রে থাকে। এই গণতন্ত্রে রাষ্ট্রকর্তৃত্বের সীমারেখা নির্ধারিত থাকে এবং ব্যক্তিকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়। মিথ্যা গণতন্ত্রে সরকার আদর্শ ও নীতিবোধ থেকে দূরে থাকে ও অধোগতিসম্পন্ন হয়। জনগণ প্রত্যেকে নিজের জন্য ভাবে ও স্বার্থপরতা দ্বারা চালিত হয়।

গণতন্ত্রের দুর্বলতা ও ত্রুটি সম্বন্ধে মিল সজাগ ছিলেন। সেই দুর্বলতা ও ত্রুটিগুলি দূর করার জন্য ব্যবস্থাও করেছিলেন। গণতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর এই সতর্কতা থেকে বোঝা যায় যে মিল গণতন্ত্রকে অস্বীকার করেন নি, বরং গণতন্ত্রকে আরও কার্যকরী করতে চেয়েছিলেন। গণতন্ত্রে মানুষ সুখ ও আনন্দ লাভ করে। তাই তিনি গণতন্ত্রকে সমর্থন করেন। তবে মিল পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে গণতন্ত্র সব সমাজের উপযোগী নয় — পশ্চাৎপদ সমাজে গণতন্ত্র বিপজ্জনক হতে পারে — মিথ্যা গণতন্ত্রে পরিণত হতে পারে।

৬৩.৩.৪ জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার সংক্রান্ত ধারণা

মিল জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকারকে গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ রূপ মনে করতেন। এই সরকারই জনগণের

মধ্যে জ্ঞানের সঞ্চার করে ও জনকল্যাণ নিশ্চিত করে। তবে উন্নত দেশেই তিনি জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের কথা বলেন, অনুন্নত দেশে নয়।

জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকারে মিল নারীজাতির ভোটাধিকারের কথা বলেন। তবে তিনি ভোটাধিকারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সম্পত্তির ওপর জোর দেন। কারণ শিক্ষিত ও সম্পত্তিশালী ব্যক্তির দায়িত্বসচেতনতা বেশি। মিল গোপন ভোটদানের বদলে প্রকাশ্যে ভোটদানের কথা বলেন। অন্যান্য সরকারী কর্তব্যপালনের মত ভোটদানও একটি কর্তব্য এবং তা সকলের চোখের সামনেই সম্পাদিত হওয়া উচিৎ। মিল আরও বলেছেন যে প্রশাসন ব্যবস্থা জটিল ধরণের। আইনসভা এই কাজ করতে সমর্থ নয়। আইনসভার কাজ হল সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করা, পর্যবেক্ষণ করা, সরকারকে কৃত কাজের যৌক্তিকতা প্রমাণে বাধ্য করা, প্রয়োজনে সরকারকে বাতিল করে নতুন সরকার নিয়োগ করা। মিল আইনসভার হাতে আইন বিষয়ক ক্ষমতাও অর্পণ করেন নি। তিনি আইন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এক কমিশন গঠনের কথা বলেছেন। এই কমিশন ভাল আইনের খসড়া রচনা করবে। আইন প্রণয়ন করবে আইনসভা। মিল প্রশাসনের কাজ স্থায়ী রাষ্ট্রকৃত্যকের হাতে ন্যস্ত করার কথা বলেন, যার সদস্যরা মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিযুক্ত হবেন। এই স্থায়ী আমলাদের ওপর আবার মন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণ থাকবে। মন্ত্রীরা আবার আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকবেন। মিল আইনসভার সদস্যদের পদকে অবৈতনিক ও সাম্মানিক বলে ঘোষণা করেন। আইনসভার সদস্যরা জনগণের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি করবেন না, নিজের বুদ্ধি অনুসারে বিচার করে কাজ করবেন। তিনি চান নি যে নিম্নমানের জনগণ দ্বারা উচ্চমানের জ্ঞানী ব্যক্তিরা পরিচালিত হোক। মিল বলেছেন যে আইনসভায় সুপ্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয়। সংখালঘুদের স্বার্থরক্ষার কোন ব্যবস্থা থাকে না। আইনসভায় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বের জন্য তিনি সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ও বহুভোটের কথা বলেন। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচারিতা হ্রাস পাবে।

মিলের লেখনীতে সংখ্যাগরিষ্ঠ গণতান্ত্রিক সরকার ও জ্ঞাণীগুণী সংখ্যালঘুদের স্বাধীন বিকাশ উভয়ের সংমিশ্রণ ঘটানো হয়েছে। জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকারে নিয়ন্ত্রণের চূড়ান্ত ক্ষমতা সমাজের সমষ্টির হাতে থাকে। আবার এখানে জ্ঞাণীগুণীদের দ্বারা ভালভাবে যে কোন কাজ সম্পাদিত হয়। নৈতিকতা জ্ঞান ইত্যাদিরও এখানে উন্মেষ ঘটে। তাই জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার হল গণতান্ত্রিক ও সর্বশ্রেষ্ঠ।

৬৩.৩.৫ মিল ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ

মিলকে পুরোপুরি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তাবিদ বলা যায়। তিনি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এজন্য ব্যক্তির চিন্তা, মতপ্রকাশ ইত্যাদির স্বাধীনতার ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে ব্যক্তির উন্নতি ছাড়া কোন সামাজিক উন্নতি সম্ভব নয়। রাষ্ট্রে ব্যক্তির নৈতিক ও বুদ্ধিগত গুণাবলী বিকাশের পূর্ণ সুযোগ থাকবে। সমাজের বিধান, আচার ব্যবহার বা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব

যাতে ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশকে ব্যাহত না করে সেজন্য তিনি সামাজিক স্বৈরাচার ও রাষ্ট্রীয় স্বৈরাচার থেকে ব্যক্তিকে রক্ষা করার কথা বলেন। তিনি রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপকে ব্যক্তিস্বাধীনতার বিরোধী মনে করতেন। তবে রাষ্ট্রকেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। কারণ রাষ্ট্র ব্যক্তির স্বাধীনতার পথে বাধাগুলি অপসারিত করে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ববিকাশের সুযোগ করে দেয় এবং সামাজিক উন্নতির ব্যবস্থা করে। সমাজের সদস্য হিসাবে ব্যক্তি রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে, একথাও তিনি মানেন। কিন্তু পুরো রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের তিনি বিরোধী ছিলেন। চরম ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়া ঠিক নয়।

অর্থনীতিতেও মিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থক ছিলেন। তিনি প্রতিযোগিতায় বিশ্বাস করতেন। জমি বা সম্পত্তির জাতীয়করণকে সমর্থন করেন নি। ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকারকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

৬৩.৩.৬ মিল ও সমাজতন্ত্রবাদ

মিল তাঁর চিন্তনপর্বের প্রথম পর্যায়ে সমাজতন্ত্রবিরোধী ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ছিলেন এবং সমাজতন্ত্রের সমালোচনাও করেন। চরম সমাজতন্ত্রকে তিনি কোনদিন সমর্থন করেন নি। পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিও তাঁর কোনও আস্থা ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি সমাজতন্ত্রের কিছু গুণ লক্ষ্য করেন। মিল ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে সমর্থন ও জাতীয়করণের বিরোধিতা করলেও সমাজকল্যাণের সম্প্রসারণকে গুরুত্ব দেন। সমাজের সামগ্রিক স্বার্থে ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা তিনি সমর্থন করেন। তাঁর সমাজতান্ত্রিক ভাবনাচিন্তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — বৃদ্ধ বয়সে, আকস্মিক দুর্ঘটনাগ্রস্ত ও পীড়িত শ্রমিকদের জন্য বীমার প্রস্তাব, শিশু শ্রমিক ব্যবস্থার অবলুপ্তি, কারখানা আইন সমর্থন, শ্রমিকদের জন্য অংশিদারী ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন, ইত্যাদি। সম্পত্তি, জমি বা শিল্প ইত্যাদির পুঞ্জীভবনকে মিল সমর্থন করেন নি। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার ওপরও তিনি জোর দিয়েছেন। তবে মিল সামাজিক কল্যাণ সাধনের ওপর যেমন গুরুত্ব দিয়েছেন, তেমনি সমাজের সদস্য হিসাবে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সংরক্ষণও সমান গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। মিলের সমাজতন্ত্রকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলা যায়। সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে শ্রদ্ধা করলেও তিনি তা পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি প্রচ্ছন্নভাবে সমাজতন্ত্রের কথা বললেও প্রকৃত পক্ষে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ছিলেন।

৬৩.৪ মিলের রাষ্ট্রচিন্তার সমালোচনা

তাঁর রাজনৈতিক আলোচনায় বেশ কিছু অসঙ্গতি ও সীমাবদ্ধতার জন্য মিল সমালোচিত হন।

মিল চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ববিকাশ এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অনুপস্থিতিকে গুরুত্ব দেন। তাঁর এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ভাবনাচিন্তা সমাজে মানুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে, যা আদৌ কাম্য নয়।

বেন্থাম বা পিতা জেমস মিলের মত প্রগতির পরিমাণগত দিক নিয়ে মিল সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি

প্রগতির ক্ষেত্রে গুণগত উৎকর্ষতা নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ মিল পরিবর্তনের কথা বলেছেন। কিন্তু তিনি পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ককে অন্যায় মনে করেন নি। বরং পুঁজিবাদের ওপর ভিত্তি করে উত্তম সমাজনির্মাণের কথা বলেছেন যেখানে সংস্কৃতিগত ও নৈতিক উৎকর্ষতা থাকবে। সেই সমাজ, মিলের মতে, পুঁজিবাদী মালিকদের দ্বারা পরিচালিত হবে, কারণ তারা সমাজের জ্ঞানীগুণী অংশ। মিল জ্ঞানীগুণীদের জন্য বহু ভোট ও সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের কথাও বলেন। এগুলির ফলে সমাজে উচ্চগুণসম্পন্ন পুঁজিবাদী মালিকরা সরকার পরিচালনায় বেশি বেশি অংশগ্রহণ করতে পারবে। অর্থাৎ মিল গণতন্ত্রের সমর্থক হলেও এলিটিজমের ওপর গণতন্ত্র নির্মাণের কথা বলেন। আবার মিল পরিবর্তনের কথা বললেও তিনি পুঁজিবাদের পরিবর্তন চিন্তা করেন নি। বরং পুঁজিবাদকে সংরক্ষণের কথাই বলেন।

মিলের রাষ্ট্রচিন্তায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রাধান্য থাকলেও তাঁর কিছু কিছু বক্তব্য সমাজতন্ত্রের ধারণা বহন করে। দুই ধরণের চিন্তাধারা তাঁর মধ্যে বৈপরীত্য সৃষ্টি করে।

অনেকে আবার মিলকে গণতন্ত্রবিরোধী মনে করেন, কারণ তিনি গণতন্ত্রকে সমর্থক করলেও সব সমাজকে গণতন্ত্রের উপযুক্ত মনে করতেন না। উন্নত দেশে সম্ভব হলেও অনুন্নত দেশে গণতন্ত্র সম্ভব নয় বলায় তাঁর বক্তব্য অনেকে সমালোচনার চোখে দেখেন।

৬৩.৫ মিলের রাষ্ট্রচিন্তার মূল্যায়ণ

সমালোচনা সত্ত্বেও রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে মিলের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তাঁকে হিতবাদী দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও শেষ হিতবাদী দার্শনিক বলা হয়। মিলকে সর্বশ্রেষ্ঠ উদারনীতিবাদী ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী বলা হয়। তিনি মানবজাতির প্রগতিকে খুব গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচারিতা ও সামাজিক স্বৈরাচারিতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন।

মিল স্বাধীনতাকে বাহ্যিক আচরণের জগৎ থেকে আধ্যাত্মিক জগতে নিয়ে গেছেন। তাঁর মতে স্বাধীনতার অর্থ হল ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশ, যার মধ্যে নৈতিকতার বিকাশ উল্লেখযোগ্য। তিনি মানুষকে সুখসন্ধানী যন্ত্র হিসেবে মনে করেন নি। মানুষের যে নীতি বা আদর্শ আছে তার ওপর জোর দিয়েছেন। গণতান্ত্রিক সরকারের দায়িত্ব সুখ নিশ্চিত করণের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় না। মিলের মতে ব্যক্তিত্ব ও নৈতিকতা বিকাশই গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য।

প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার সংক্রান্ত তাঁর বক্তব্যগুলিকে তাঁর দেশের সরকার কার্যকর করতে আগ্রহী ছিল।

অনেকে মনে করেন যে আধুনিক কল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণা মিলের রাষ্ট্রচিন্তায় দেখতে পাওয়া যায়। সমন্বয় সমিতিগঠন ও জনকল্যাণের জন্য সরকারী কাজে হস্তক্ষেপকে তিনি সমর্থন করতেন। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র উভয়ের দোষ সম্বন্ধে মিল সচেতন ছিলেন এবং কোনটাকেই তিনি চূড়ান্ত বলে

মেনে নিতে পারেন নি। উভয়ের সুবিধাগুলি নিয়ে তিনি সামাজিক পুঁজিবাদ রচনা করতে চেয়েছিলেন, যার অর্থ কল্যাণকর রাষ্ট্র। তাঁকে বলা হয় "The prophet of his own age". বেন্থামের নীরস উপযোগিতাবাদকে মিল আবেগ ও অনুভূতি দিয়ে বিচার করেছেন। তাই তাঁর উপযোগিতাবাদ মানবতাবোধ সমৃদ্ধ।

পরবর্তী প্রজন্মের ওপর মিলের সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষণীয়। উনবিংশ ও বিংশ শতকের দর্শনচিন্তা, রাষ্ট্রদর্শন ইত্যাদি মিল দ্বারা অনেকটা প্রভাবিত হয়েছে। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই পাঠ্য বিষয়। ফেবীয় সমাজবাদের মূল বক্তব্য মিলের রাষ্ট্রচিন্তায় ছিল। আজও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা মিলের রচিত গ্রন্থগুলি যত্নসহকারে পাঠ করেন। তার্কিক, অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদ হিসাবে তাঁর সময়ে মিল খ্যাতিলাভ করেন।

৬৩.৬ সারাংশ

মিল পিতার তত্ত্বাবধানে শিস্য বয়স থেকে গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য, প্লেটো, অ্যারিস্টটল, হেরোডোটাসের দর্শন, রোমের ইতিহাস, অর্থবিদ্যা, অঙ্কশস্ত্র, রসায়নবিদ্যা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় মনোযোগ সহকারে আয়ত্ত করেন। ১৬ বছর বয়সে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর চাকরীতে ঢোকেন। অবসর নেওয়ার কিছুদিন পর নির্বাচনে জয়লাভ করে পার্লামেন্টের সদস্য হন। ৬৭ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। লেখক হিসাবে তিনি খ্যাতিলাভ করেন।

মিল পিতার মত বেন্থামের হিতবাদী দর্শন দ্বারা প্রথম জীবনে প্রভাবিত হন। সুখবৃদ্ধি ও যন্ত্রণাহ্রাসকে ব্যক্তির লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত করেন। কিন্তু পরে তিনি বেন্থামের সুখের পরিমাণগত দিকের বদলে গুণগত দিকের ওপর জোর দেন। ফলে নিম্নমানের সুখের থেকে উচ্চমানের সুখকে কাম্য মনে করেন। সন্তুষ্ট মূর্খের থেকে অসন্তুষ্ট জ্ঞানী হওয়া ভাল মনে করতেন।

মিল স্বাধীনতার ওপর জোর দেন। চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা তাঁর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও সামাজিক স্বৈরাচার থেকে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে রক্ষা করার কথা বলেন। ব্যক্তির নিজসম্বন্ধীয় কাজের ক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। তবে সকলের স্বার্থ যাতে সংরক্ষিত হতে পারে তার জন্য পরসম্বন্ধীয় কাজের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের কিছু যৌক্তিকতা মিল স্বীকার করেন।

মিল গণতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন। গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের যেমন শাসনের অধিকার আছে, তেমনি সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থাও থাকা প্রয়োজন। মিল অজ্ঞ, অশিক্ষিত ব্যক্তিদের ওপর সরকার পরিচালনার ভার দিতে রাজী ছিলেন না। জ্ঞানীগুণী সংখ্যালঘুরা যাতে সরকারে অংশ গ্রহণ করতে পারে সেজন্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ও বহুভোটের কথা বলেছেন। তবে তিনি নারীজাতিকে ভোটাধিকার দানের পক্ষপাতী ছিলেন। মিলের মতে, গণতান্ত্রিক সরকারের কাজ হল জনগণের মনে সদাচার ও নীতিবোধ সঞ্চারিত করা।

মিল জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকারকে গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ রূপ মনে করতেন। তিনি ভোটাধিকারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সম্পত্তির ওপর জোর দেন। প্রকাশ্য ভোটদানের কথা বলেন। প্রতিভাবান ও জ্ঞানীগুণীদের জন্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ও বহুভোটের কথা বলেন। তিনি নারীদের ভোটাধিকার দেন।

মিল আইন রচনার জন্য আইন কমিশন এবং প্রশাসনিক কাজ চালানোর জন্য দক্ষ আমলাতন্ত্রের কথা বলেন। আমলাদের ওপর মন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণ এবং মন্ত্রীদের ওপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণের কথা বলেন।

মিলের তত্ত্বে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ, চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, কর্তৃত্বের ওপর নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক ধারণা দেখা যায়। আবার তিনি সম্পদ পুঞ্জীভবনের বিরোধী ছিলেন, রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার ওপর জোর দেন ও জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণাকে সমর্থন করেন। তাঁর মধ্যে তাই সমাজতান্ত্রিক বক্তব্যও পাওয়া যায়। তবে মিলের চিন্তাভাবনায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী বক্তব্যই বেশি।

মিলের চিন্তাধারায় নানা অসঙ্গতি দেখা যায়। একদিকে হিতবাদী দর্শন এবং অন্যদিকে হিতবাদের সংশোধন, একদিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং অন্যদিকে সমাজ কল্যাণকর রাষ্ট্র, একদিকে গণতান্ত্রিক এবং অন্যদিকে এলিটবাদী বক্তব্য একই সঙ্গে দেখা যায়। তবে এ সত্ত্বেও মিলের রাষ্ট্রচিন্তার গুরুত্ব আজও অনস্বীকার্য। তাই তাঁর গ্রন্থগুলি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের কাছে অবশ্য পাঠ্য।

৬৩.৭ অনুশীলনী

১। মিলের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সময় আলোচনা করুন।

২। মিলের হিতবাদ সংক্রান্ত ধারণা কি বেন্থামের হিতবাদের সংশোধন ?

৩। মিলের স্বাধীনতা সংক্রান্ত ধারণা পরিস্ফুট করুন।

৪। মিল কি গণতান্ত্রিক ছিলেন ?

৫। মিলের জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার সম্বন্ধে বক্তব্য পরিস্ফুট করুন।

৬। মিলের রাষ্ট্রচিন্তার সমালোচনা করুন।

৭। মিলের রাষ্ট্রচিন্তার মূল্যায়ণ করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

ক) মিল কী 'এলিটিস্ট' ছিলেন ?

খ) বেন্থামের হিতবাদে মিলের সংযোজন কী কী ?

গ) মিল কেন সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ও বহুভোটের কথা বলেন ?

৬৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। David Thomson (ed.), Political Ideas, Penguin Books, Great Britain, 1978.

২। C. D. Broad, Fire Types of Ethical Theory, London, 1951.

৩। G. H. Sabine, History of Political Theory, Oxford & IBH Publishing Co, Indian Ed. 1961.

৪। Amal Kumar Mukhopadhyay, Western Political Thought, K. B. Bagchi & Co., Calcutta, 1980.

৫। J. P. Suda, A History of Political Thought (Modern) Vol III, Bentham to Marx, K. Nath & Co., Meerut City – 2, 1972-3.

৬। সুভাষ সোম, রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস, ১ম খন্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৫।

৭। প্রাণগোবিন্দ দাস, রাষ্ট্রচিন্তার ইতিবৃত্ত, সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৮৬।

৮। অমৃতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় রাষ্ট্র চিন্তার ইতিহাস, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৯৬।

একক ৬৪ □ টমাস পেন

গঠন

৬৪.০ উদ্দেশ্য
৬৪.১ প্রস্তাবনা
৬৪.২ টমাস পেনের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সময়
৬৪.৩ টমাস পেনের রাজনৈতিক চিন্তাধারা
৬৪.৩.১ গণতন্ত্র সংক্রান্ত ধারণা
৬৪.৩.২ স্বাধীনতা সংক্রান্ত ধারণা
৬৪.৩.৩ অর্থনীতি সংক্রান্ত ধারণা
৬৪.৩.৪ ধর্ম সংক্রান্ত বক্তব্য
৬৪.৪ পেনের সমালোচনা
৬৪.৫ পেনের মূল্যায়ন
৬৪.৬ সারাংশ
৬৪.৭ অনুশীলনী
৬৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৬৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য টমাস পেনের রাজনৈতিক চিন্তার সঙ্গে আপনার পরিচিতিস্থাপন। এই উদ্দেশ্যে আপনাকে জানান হচ্ছে —

- টমাস পেনের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সময়
- টমাস পেনের রাজনৈতিক চিন্তাধারা—গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, অর্থনীতি ও ধর্মসংক্রান্ত পেনের বক্তব্য —
- পেনের সমালোচনা ও মূল্যায়ন

৬৪.১ প্রস্তাবনা

টমাস পেন অষ্টাদশ শতকে ফরাসী বিপ্লব ও আমেরিকার বিপ্লবে সাম্য, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন। তিনি জাতিকে সার্বভৌম মনে করতেন, সরকারকে নয় এবং জনগণের দ্বারা সরকার

নির্বাচিত হওয়ার ওপর জোর দেন। ব্যক্তির স্বাধীনতা, অধিকার এবং গণতন্ত্র ছাড়াও পেন জাতির অর্থনৈতিক প্রগতিকে খুব গুরুত্ব দিতেন। তিনি জনগণের বিপ্লব ও জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন। বিচক্ষণতা, বাস্তববোধ এবং সাবলীলতার সঙ্গে তিনি তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তাঁর সময়ের সাধারণ মানুষ তাঁর লেখা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল এবং এখনও হয়।

৬৪.২ টমাস পেনের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সময়

টমাস পেন ১৭৩৭ সালের ২৯শে জানুয়ারী নরফোকের থেটফোর্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা দরিদ্র না হলেও খুব স্বচ্ছল ছিলেন না। পেনের পিতা ছিলেন কোয়েকার (Quaker) এবং কোয়েকার মূল্যবোধ ও ধ্যানধারণা দ্বারা পেন প্রভাবিত হন। তিনি সব মানুষের সমতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে সব মানুষই সমান। তিনি স্তরবিন্যাস ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের বিবেক ও যুক্তিবোধ তাকে সত্য ও ন্যায়ের দিকে চালিত করে।

টমাস কিছুদিন পাড়ার গ্রামে স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। তৎকালীন যুগে ল্যাটিনকে উচ্চশিক্ষাজগতে গুরুত্ব দেওয়া হত। কিন্তু পেনের কোয়েকার পিতা তাঁকে ল্যাটিন শিক্ষার অনুমতি দেননি, কারণ তিনি মনে করতেন যে ল্যাটিন লেখকরা নৈতিক দিক থেকে উন্নত ছিলেন না। পেন তাঁর ১৩ বছর বয়সে স্কুল ত্যাগ করেন। তাঁর পরবর্তী লেখাপড়া ব্যাপক হলেও সামঞ্জস্যহীন ছিল এবং তিনি অ্যাকাডেমিক (academic)-মনস্ক ছিলেন না। তাই প্রবণতা থাকলেও তিনি পণ্ডিত পদবাচ্য ছিলেন না। তবে পেন পদার্থবিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, কারিগরি বিদ্যা ইত্যাদি বিজ্ঞানবিষয়গুলি আয়ত্ত করেন।

জীবনের প্রথম ৩৭ বছর পেন অজ্ঞাত ছিলেন। প্রথমে তিনি পিতার ব্যবসায়ে স্টেমেকার (Staymaker), পরবর্তীকালে কেনসিংটনে স্কুলশিক্ষক হিসাবে, অধস্তন কর্মচারী হিসাবে আবগারী শুল্ক বিভাগে এবং ছোটখাটো তামাক প্রস্তুতকারক (tobacconist) হিসাবে কাজ করেন। স্টেমেকার হিসাবে তিনি অসফল হন, স্কুলশিক্ষক হিসাবে বেশিদিন ছিলেন না, আবগারী শুল্কবিভাগ থেকে পদচ্যুত হন এবং তামাক প্রস্তুতকারক হিসাবে দেউলিয়া হয়ে পড়েন। এই সময় তাঁর জীবনে অসাফল্য দেখা গেলেও তিনি শেষ পর্যন্ত অসফল হন নি। তিনি চরমপন্থী (radical) ধ্যানধারণা গড়ে তোলেন, লেখনী ধারণ করেন এবং লন্ডনের বেশ কিছু বুদ্ধিজীবির সঙ্গে যোগাযোগ করেন ও কথাবার্তা বলেন। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ও ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল।

১৭৭৫ সালে তিনি ফিলাডেলফিয়া যাত্রা করেন। তিনি যখন সেখানে পৌঁছন তখন উপনিবেশবাসীরা ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। ১৭৭৬ এ প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ 'Common Sense এ তিনি আমেরিকার বিপ্লব সমর্থন করেন। তিনি পরে নিজেকে এমন একজন মানুষ হিসাবে বর্ণনা করেন, সমগ্র পৃথিবী যার বাসস্থান এবং সর্বত্র তার উপকার করাই যার মূল উদ্দেশ্য। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ১৭৮৯ এ তিনি ফরাসী বিপ্লবের গৌরবময় পর্বে প্যারিসে উপস্থিত হন এবং তাঁর 'Rights of Man' গ্রন্থে ছিল ফরাসী বিপ্লবের সমর্থন। বার্কের গ্রন্থ 'Reflexions on

the Revolution of France' তাঁকে 'Rights of Man' রচনায় উৎসাহিত করে। গ্রন্থটির ১ম অংশ ১৭৯১ এ প্রকাশিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থটি জনপ্রিয়তালাভ করে। এক বছর পরে দ্বিতীয় অংশটিও সমানভাবে জনপ্রিয় হয়েছিল। পেন হয়ত মৌলিক ও উদ্ভাবনক্ষম লেখক ছিলেন না। সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ধারণার কথা তিনি প্রথম বলেন নি। কিন্তু তিনিই প্রাপ্তবয়স্কের ভৌটাধিকারের কথা আমেরিকা, ফ্রান্স ও ইংলন্ডে প্রথমে প্রচার করেন। তাঁর প্রচেষ্টাতেই আমেরিকা, ইংলন্ড, ফ্রান্স ও ল্যাটিন আমেরিকায় গণতন্ত্রের ধারণা জনপ্রিয় হয়। আজ গণতন্ত্র একটি প্রচলিত ধারণা, কিন্তু তাঁর সময়ে গণতন্ত্র অনেকের কাছেই অপ্রচলিত, অখ্যাতিকর ও বর্জনীয় ধারণা হিসেবে গৃহীত হত, অনেকের কাছে আবার তা মুক্তির উপায় ছিল। পেনের বক্তব্য সাধারণ মানুষের কাছে তখন খুবই আকর্ষক ছিল। পেন বিভিন্ন সময়ে তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে পত্রপত্রিকা, প্রবন্ধ ও প্যামফ্লেট প্রকাশ করেন।

১৭৭৫ সালে তিনি Pennsylvania Magazine সম্পাদনা করেন। ১৮ মাস এখানে ছিলেন । ১৭৭৬ থেকে ১৭৮৩ সালের মধ্যে তিনি Crisis পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাতেও তিনি আমেরিকার বিপ্লবের জয়গান করেন। পেন তাঁর 'Crisis Extraordinary' প্যামফ্লেটে অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। ১৭৮২-৩ তে 'Letter to Abbe Raynal' প্রকাশ করেন। ১৭৮৬ সালে 'Dissertations on Government, the Bank and Paper Money' প্রকাশ করেন। 'Prospects on the Rubicon' প্রকাশ করেন ১৭৮৭ সালে।

১৭৯৩ সালে তাঁর 'The Age of Reasons' এর প্রথম অংশ এবং ১৭৯৫-এ ঐ গন্থের দ্বিতীয় অংশ প্রকাশিত হয়। এখানে তিনি ধর্মীয় কুংস্কার দূর করে বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে ধর্মের মেলবন্ধন ঘটান। ১৭৯৬ সালে পেন 'The Decline and Fall of the English System of Finance' প্রকাশ করেন। তাঁর অর্থনীতিসংক্রান্ত এই গ্রন্থ খুবই সমাদৃত হয়। ১৭৯৭ এ প্রকাশিত 'Agrarian Justice' পেনের শেষ গ্রন্থ। এই গ্রন্থেও তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তার প্রকাশ দেখা যায়।

আগেই বলা হয়েছে পেন ১৭৭৪ সালে আমেরিকা যাত্রা করেছিলেন। ১৭৮৭তে তিনি ইউরোপে ফিরে আসেন। ফরাসী বিপ্লবের প্রতি তাঁর সহানুভূতির জন্য ইংলন্ডে তাঁকে রাজদ্রোহী বলে অভিযুক্ত করা হয়। তিনি ফ্রান্সে সমাদৃত হন। তিনি ফ্রান্সের রাজনীতিতে যোগ দেন। পরে ফ্রান্সে ও তাঁকে কারাবদ্ধ করা হয় (১৭৯৩-৯৪)। আমেরিকায় তাঁর শেষ জীবন কাটে বিতর্ক ও অবহেলার মধ্যে। তাঁর ধর্মের ধর্মনিরপেক্ষ আলোচনা তাঁকে বিতর্কিত করে তোলে। ১৮০৯ সালের ৯ই জুন পেন মারা যান।

৬৪.৩ টমাস পেনের রাজনৈতিক চিন্তাধারা

টমাস পেন ছিলেন একজন মানবদরদী গণতান্ত্রিক লেখক, যিনি জনগণের সাম্য, স্বাধীনতা ও অধিকারকে গুরুত্ব প্রদান করেছেন এবং জনগণের বিপ্লবের সমর্থক ছিলেন। তাঁর লেখায় অর্থনীতি সংক্রান্ত কিছু বক্তব্যও দেখা যায়। ধর্ম নিয়ে তিনি ধর্মনিরপেক্ষভাবে আলোচনা করেন। তাঁর সময়ে এবং পরবর্তীকালে পেনের প্রভাব বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন ও বিপ্লবমূলক কাজে প্রত্যক্ষ করা যায়।

৬৪.৩.১ গণতন্ত্রসংক্রান্ত ধারণা

পেনের মতে, সরকারের দায়িত্ব হল জাতির কাজকর্ম পরিচালনা করা। এই দায়িত্ব কোন একজন বা একটি পরিবারের নয়, সমগ্র সমাজের। সমগ্র সমাজই সরকারকে সমর্থন করে। বলপূর্বক বা অন্যভাবে সরকারী ক্ষমতা বংশানুক্রমিক করা হলেও তা ঠিক নয়।

সার্বভৌমিকতা জাতির অধিকার, একজন ব্যক্তির অধিকার নয়। জাতি তার সুবিধা অনুযায়ী যে কোন সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে পছন্দমত নতুন সরকারকে ক্ষমতাসীন করতে পারে। প্রতিটি নাগরিকই সার্বভৌমিকতার অংশ এবং কেউই সরকারের কাছে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য নয়। নাগরিকের আনুগত্য আইনের প্রতি।

রাজতন্ত্র বা অভিজাততন্ত্র, যাই হোক না কেন, পেন বংশানুক্রমিক শাসনের বিরোধী। বংশানুক্রমিক লেখক যেমন অসম্ভব, তেমনই অসম্ভব বংশানুক্রমিক শাসক। তিনি বলেছেন যে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র হল প্রকৃতির ইচ্ছাবিরোধী, নীতিগতভাবে অন্যায় এবং ব্যবহারিক দিক থেকে ক্ষতিকর। পেনের মতে, জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার সর্বোত্তম আইন প্রণয়ন করতে পারে, বিভিন্ন স্থান থেকে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র, যেখানে সব নাগরিক আইনপ্রণয়ন-ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করে, শুধুমাত্র ক্ষুদ্র সমাজেই সম্ভব। বৃহৎ সমাজে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন একান্ত প্রয়োজন। পেন নির্বাচিত সরকারের পক্ষে ওকালতি করেন। তিনি জনগনের যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতায় আস্থাশীল ছিলেন। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ভুল করতে পারে, কিন্তু তা অন্যায় নয়। তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠকে সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশের প্রতি সংবেদনশীল হতে বলেছেন।

তাঁর সময়ের অন্যান্য লেখকের মত পেন সরকার সংক্রান্ত সামাজিক চুক্তির কথা বলেছেন। কিন্তু এই চুক্তি, তাঁর মতে, শাসক ও শাসিতের মধ্যে নয়, জনগনের মধ্যে সম্পাদিত হয়েছে। পেনের মতে, একসময় সমাজে সরকার ছিল না। সুতরাং চুক্তি সম্পাদন করার জন্য শাসকের অস্তিত্ব ছিল না। তাই জনগণ নিজেরাই ব্যক্তিগত ও সার্বভৌম অধিকারবলে প্রত্যেকের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করে সরকার প্রতিষ্ঠা করে। এইভাবে চুক্তির দ্বারাই সরকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব। জাতির প্রতিনিধিত্বকারী জনগণ সংবিধান রচনা করে তাতে সরকার যে নীতিগুলির ওপর প্রতিষ্ঠিত বা গঠিত হবে বা কি কি ক্ষমতাযুক্ত হবে সেই সব কিছু নির্দেশ করবে। এই সংবিধানের ভিত্তিতেই বৈধ সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। পেন আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং ফ্রান্সের বিপ্লবে এই প্রক্রিয়া কার্যকরী হতে দেখেছেন।

পেন তাঁর সময়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মত প্রাকৃতিক অধিকারের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, মানুষ তার অস্তিত্বের অধিকার বলে কিছু প্রাকৃতিক ক্ষমতা লাভ করে যেমন বুদ্ধিগত অধিকার, মনসংক্রান্ত অধিকার, কাজের অধিকার ইত্যাদি যেগুলি তার আনন্দবৃদ্ধি করে এবং অন্যের প্রাকৃতিক অধিকারে বাধা দেয় না। মানুষ সমাজের সদস্য হিসাবে পৌর অধিকার লাভ করে। প্রত্যেক পৌর অধিকারের পিছনে ভিত্তি হিসাবে আছে ব্যক্তির পূর্বতন প্রাকৃতিক অধিকার। সমাজের সমর্থন পৌর অধিকারগুলিকে নিরাপত্তা প্রদান করে ও সংরক্ষণ করে।

অনেকে মনে করেন যে বিখ্যাত Declaration of the Rights of Man and Citizens' এর লেখক পেন। ১৭৮৯ এ ফ্রান্সের পার্লামেন্ট এই অধিকার ঘোষণা করে। পেন তার সমর্থক ও অনুবাদক ছিলেন। তবে যে সকল ফরাসী মনীষী এর খসড়া রচনা করেন তাঁদের ওপর পেনের প্রভাব ছিল। আমেরিকার 'Declaration of Independence' ঘোষণায় তাঁর প্রভাব আরও বেশি ছিল।

পেনের মতে রাজনৈতিক গণতন্ত্র বলতে বোঝায় — অধিকার ঘোষণা, জনগণের সার্বভৌমিকতা, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা আইন প্রণয়ন, জনগণের সমান অধিকার, অন্যের ক্ষতি না করে নিজের ইচ্ছামত চলার স্বাধীনতা ইত্যাদি। ২০০ বছর আগে পেন গণতন্ত্রের এই নীতিগুলি ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর সময়ের মত আজও এই নীতিগুলি সমানভাবে মূল্যবান।

পেন রাজতন্ত্রকে ঘৃণ্য মনে করতেন। অলিখিত বৃটিশ সংবিধানকে সংবিধান পদবাচ্য মনে করেন নি। সেনাবাহিনীর ক্ষমতাদখলকেও তিনি বৈধ বলেন নি। জনগণ নির্বাচিত সরকারই শুধু বৈধ বলে তিনি মনে করতেন।

৬৪.৩.২ স্বাধীনতাসংক্রান্ত ধারণা

টমাস পেন স্বাধীনতা ও অধিকারকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। ফরাসী অধিকার ঘোষণা ও আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণায় তাঁর প্রভাব ছিল। ফরাসী অধিকার ঘোষণার চারটি ভাগ হল —

১। মানুষ জন্মগতভাবে এবং অধিকারের ক্ষেত্রে স্বাধীন ও সমান।

২। সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠনের উদ্দেশ্য হল প্রাকৃতিক অধিকারের সংরক্ষণ, যেগুলি হল স্বাধীনতা, সম্পত্তি, নিরাপত্তা ও শোষণ বিরোধিতা।

৩। সমস্ত সার্বভৌমিকতার উৎস হল জাতি। কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদ এমন কোন কর্তৃত্ব দাবী করতে পারে না, যার উৎস জাতি নয়।

৪। রাজনৈতিক অধিকার হল সেই ক্ষমতা, যা অন্যের ক্ষতিসাধন করে না। অন্যের অধিকার ভোগকে নিশ্চিত করার জন্য যেটুকু প্রয়োজন তার বেশি নিয়ন্ত্রণ অধিকারের ওপর থাকবে না। আইন সেই নিয়ন্ত্রণের সীমা স্থির করবে।

এই প্রসঙ্গে পেইন আইনের অর্থও পরিষ্কারভাবে আলোচনা করেছেন। আইন হল জনসমাজের ইচ্ছার প্রকাশ। সমস্ত নাগরিক ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে আইনপ্রণয়নে তার সম্মতি জানানোর অধিকার ভোগ করে। পেইন শুধুমাত্র অধিকারের কথা বলেন নি, কর্তব্যের কথাও বলেছেন। তাঁর মতে, মানুষ হিসাবে যেমন আমার অধিকার আছে, তেমনি অন্যদেরও আছে। তাই আমার কর্তব্য হবে অন্যের অধিকারকে নিশ্চিত করা। তাই অধিকারের সঙ্গে কর্তব্যও যুক্ত। পেইন উপনিবেশবাদীদের নিজ দেশের ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার সমর্থন করেন। জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আজ বহু আলোচিত বিষয়। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে পেইন সেই অধিকারের স্বীকৃতি জানান।

পেন রাজতন্ত্রের বিরোধিতা করে বলেছেন যে রাজতন্ত্র ধনীদের স্বার্থে পরিচালিত হয় এবং

গরীবদের শোষণ করে থাকে। পেন মানবতাবাদী দৃষ্টি দিয়ে দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। তাঁর চিন্তায় পরবর্তীকালে যাকে শ্রেণীসচেতনতা বলা হয় তার কিছু বীজ দেখা যায়।

৬৪.৩.৩ অর্থনীতি সংক্রান্ত ধারণা

পেনের অর্থনীতি সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা তাঁর 'Crisis Extraordinary' প্যামফ্লেটে সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক প্রয়োজন বছরে দুকোটি মুদ্রা হিসেব করে তিনি বলেছেন যে অর্ধেক অংশ কর এবং অর্ধেক অংশ ৬% সুদে ঋণ থেকে সংগ্রহ করতে। করের মধ্যে তিনি প্রধানত আমদানীকর এবং মদের ওপর আবগারী শুল্কের ওপর গুরুত্ব দেন।

পেন মুদ্রাব্যস্থার সংস্কারের কথা বলেন। যুদ্ধের প্রথম দিকে আমেরিকায় নোট ছাপান বৃদ্ধি পাওয়ায় মুদ্রাব্যবস্থার মূল্য হ্রাস হয়েছিল। কংগ্রেস এই সময় পুরোনো ৪০ এককের বদলে নতুন এক একক মুদ্রা বিনিময়ের কথা বলে। পেন সেই প্রস্তাবকে সমর্থন জানান, যদিও সেই ব্যবস্থাকে স্বল্পমেয়াদী বলেন। তিনি বাজারে নোটের বহুল প্রচারের বিরোধী ছিলেন। 'Letter to Abbe' Raynal'-এ তিনি বলেন যে যুদ্ধের মূল্য পরিশোধের জন্য কর বসানো প্রয়োজন। কিন্তু বিপ্লবী সরকারের প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা থাকে না। সেক্ষেত্রে তিনি মুদ্রাস্ফীতি সমর্থন করেন। তাঁর এই বক্তব্য পরবর্তীকালে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। ১৯২০ সালে USSR এ বিপ্লবোত্তর অবস্থায় কর ব্যবস্থার জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থার উদ্ভব অসম্ভব বিবেচিত হওয়ায় মুদ্রাস্ফীতি দ্বারা ভোগকে সীমাবদ্ধ করে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল। তবে পেনের মতে, যতশীঘ্র সম্ভব সোনা ও রূপোর মুদ্রায় ফিরে গিয়ে জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। পেন জাতীয় গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে বলিষ্ঠ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক প্রগতিরও সমর্থক ছিলেন। পেন কৃষি ব্যবস্থার বদলে শিল্পব্যবস্থার দ্বারা জনসমৃদ্ধি বৃদ্ধির কথা বলেন। 'Agrarian Justice' এ পেনের বক্তব্যগুলি আধুনিক সমাজতন্ত্রের ধারণার দ্যোতক। পেনের মতে সভ্যতার অগ্রগতির ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায়। পেইন Progressive income tax এর কথা বলেন। পেইন রাষ্ট্রকর্তৃক বৃদ্ধদের পোষণ ও যুবকদের শিক্ষাদানের কথা বলেছেন। তিনি রাষ্ট্র কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রদানের সমর্থক ছিলেন। তাঁর কিছু চিন্তাধারা পরবর্তীকালে সমাজবাদের ভাবনাকে প্রভাবিত করে। তবে পেন জাতীয়করণের কথা বলেন নি।

৬৪.৩.৪ ধর্মসংক্রান্ত বক্তব্য

'Age of Reason'-এ পেনের ধর্মসংক্রান্ত বক্তব্য লিখিত আছে। বাইবেল যে ঈশ্বর দ্বারা লিখিত পেন এই ধারণা খন্ডন করেন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য ধর্মকে ধ্বংস করা বা দুর্বল করা নয়, ধর্মকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করা এবং বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে ধর্মের সামঞ্জস্য স্থাপন করা। তিনি পরবর্তীকালে আমেরিকায় এক বন্ধুকে পত্রে লেখেন যে ফ্রান্সের জনগণ নাস্তিকতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। পেন তাদের নাস্তিকতা থেকে সরিয়ে আনার জন্য তাঁর গ্রন্থ তাদের ভাষায় প্রকাশ করেন। তিনি পরিষ্কারভাবে লেখেন যে তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাসী। তাঁর মতে কুসংস্কার, বিকৃত সরকার ও মিথ্যা ধর্মের দিকে নয়, নৈতিকতা, মানবিকতা ও প্রকৃত ধর্মের দিকে দৃষ্টি ফেরান প্রয়োজন।

৬৪.৪ পেনের সমালোচনা

পেনকে অনেক সমালোচক মৌলিক চিন্তাবিদ মনে করেন না। অনেকে মনে করেন যে পেনের চিন্তাধারা সুসঙ্গত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। পেনের লেখার মধ্যে অ্যাকাডেমিক পান্ডিত্য দেখা যায় না। কিছু স্ববিরোধিতা দেখা যায়। একদিকে তিনি ব্যক্তির স্বাধীনতার স্বার্থে রাষ্ট্রের কাজ সীমাবদ্ধ করার কথা বলেন। অন্যদিকে আবার তিনি রাষ্ট্রকর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান, বৃদ্ধদের পোষণ ও শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলেন।

৬৪.৫ পেনের মূল্যায়ন

পেনের লেখায় রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বক্তব্য দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর অনেক চিন্তাধারা অষ্টাদশ শতকের মত এখনও সমান গুরুত্বপূর্ণ। পেনের গ্রন্থগুলি ২০০ বছর আগে লেখা হলেও এখনও পঠিত হয় এবং জনগণকে অনুপ্রাণিত করে। সাধারণ মানুষের সাধারণ বোধ তাঁর লেখায় প্রতিফলিত হয়েছে। পেন গণতন্ত্রবাদী, সাম্য, স্বাধীনতা ও অধিকারের সমর্থক, দরিদ্র, শোষিত জনগণের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন, মানবতাবাদী এবং কুসংস্কার মুক্ত চিন্তাবিদ ছিলেন। শুধুমাত্র ইংলন্ড, ফ্রান্স বা আমেরিকা নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেখানে গণতান্ত্রিক আন্দোলন হচ্ছে সেখানেই তিনি প্রসঙ্গিক'

সমগ্র ঊনবিংশ শতকে পেনের লেখা প্রভাব বিস্তার করেছিল। ইংল্যান্ডে চার্টিস্ট আন্দোলনের সময় পেনের লেখাগুলি পুনর্মুদ্রিত হয়। চার্টিস্ট আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন ১৮৪২ সালে ন্যাশনাল চার্টার অ্যাসোয়িশন তাঁর গ্রন্থসংগ্রহ প্রকাশ করে। শ্রমিক শ্রেণীর বিভিন্ন আন্দোলনে এবং প্রথম দিকের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনেও তাঁর লেখা সমাদৃত হয়।

গণতন্ত্র, জাতীয়তাবোধ, বিপ্লবী সংগ্রাম এবং অর্থনৈতিক প্রগতি — এই চারটি বিষয় পেন চিত্রিত করেছিলেন। একবিংশ শতকের প্রথমে এখনও এগুলির মূল্য কমে নি। পেনের চিন্তাধারার আধুনিকতা তাই অনস্বীকার্য। টমাস পেন হলেন রাজনীতিসংক্রান্ত বিষয়ের প্রথম আধুনিক লেখক, যিনি সাধারণ মানুষের ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করেছেন। টমাস পেনের রাজনৈতিক বাস্তবতা বোধ ছিল প্রবল। তাঁর আলোচিত বক্তব্যসমূহ পরবর্তীকালের প্রজন্মকেও তাই প্রভাবিত করে।

৬৪.৬ সারাংশ

টমাস পেন ১৭৩৭ সালে নরফোকের থেটফোর্ডে জন্মগ্রহণ করেন। পাড়ার গ্রামার স্কুলে ১৩ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর লেখাপড়া ছিল। তিনি ল্যাটিন শেখার সুযোগ পান নি। কিন্তু জ্যোতিষ শাস্ত্র, নিউটনের বলবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি আয়ত্ত করেন। তিনি অ্যাকাডেমিক ছিলেন না, কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেছিলেন। তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা সাধারণ মানুষের সাধারণ বোধকে উদ্দীপ্ত করে। তিনি গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, অর্থনীতি ও ধর্ম বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

তিনি রাজতন্ত্র বা বংশানুক্রমিক শাসন ও সেনাবাহিনী দ্বারা ক্ষমতা অধিকার বৈধ মনে করেন নি। তাঁর মতে সরকার জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হবে এবং জনগণের এক সরকার সরিয়ে অন্য সরকার প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতা আছে, কারণ সমগ্র জাতি সার্বভৌম, সরকার নয়। সরকার, তাঁর মতে, জনগণের মধ্যে চুক্তির ফল।

পেন স্বাধীনতা সাম্য ও গণতান্ত্রিক অধিকারের সমর্থক ছিলেন। তিনি সব মানুষের সমান অধিকারের ওপর জোর দেন। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকে ন্যূনতম করার কথা বলেন। তাঁর মতে আইন দ্বারা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের সীমা নির্ধারিত হবে।

পেন আবগারী শুল্ক, আমদানী কর ও Progressive Income tax এর কথা বলেছেন। কৃষির বদলে শিল্পের ওপর জোর দেন। কর স্থাপন বা মুদ্রাস্ফীতি উভয় উপায়ে বিপ্লবী বা বিপ্লব পরবর্তী সরকারকে অর্থসংগ্রহ করতে বলেন। তিনি ঋণ থেকে অর্থসংগ্রহের কথাও বলেন। তবে সোনা বা রূপার মুদ্রার ওপর জোর দেন। রাষ্ট্র কর্তৃক বৃদ্ধদের পোষণ, সামাজিক নিরাপত্তা ও শিক্ষার ওপর জোর দেন।

পেনের ধর্মসমক্রান্ত আলোচনা ছিল ধর্মনিরপেক্ষ। তিনি কুসংস্কার মুক্ত মানবিক ধর্মের ওপর জোর দেন। কিন্তু তিনি নাস্তিক ছিলেন না।

পেনের চিন্তাদারা মৌলিক ছিল না। তাঁর বক্তব্যে কোথাও কোথাও সঙ্গতির অভাব ছিল। তবুও তাঁর গ্রন্থগুলি এখনও মূল্যবান। এখনও তাঁর গণতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা জনগণকে উদ্‌বুদ্ধ করে।

৬৪.৭ অনুশীলনী

১। পেনের জীবনী ও সময় সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

২। টমাস পেনের গণতন্ত্র সংক্রান্ত ধারণা পরিস্ফুট করুন।

৩। পেনের স্বাধীনতা সংক্রান্ত বক্তব্যগুলি কী কী ?

৪। পেন ধর্মসংক্রান্ত কি বক্তব্য রেখেছেন ?

৫। পেনের রাষ্ট্রচিন্তার মূল্যায়ন করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

ক) পেন বংশানুক্রমিক শাসন সমর্থন করতেন কি ?

খ) পেনের লিখিত কয়েকটি পুস্তকের নাম করুন।

৬৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। Henry Collins (ed), Rights of Man, ed by Penguin books, Great Britain, 1969.

২। David Thomson (ed) Political Ideals, Penguin books, Great Britain, 1966.

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

— *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে; সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি।

— *সুভাষচন্দ্র বসু*

Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support.

— *Subhas Chandra Bose*

Price : Rs. 150.00

Published by : Netaji Subhas Open University, 1 Woodburn Park, Kolkata-700 020
and Printed at : Sailee, 4A, Maniktala Main Road, Kolkata-700 054